সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
কালের শৃঙ্গবাদন	২২৩
চা-খড়ি ...	১০৮
চোরবাগান বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষসভা কর্ত্তৃক অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার পরীক্ষা ...	২৮৪
চোরবাগান বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক	২৮৬
জানকী ...	৮১
দময়ন্তী ...	১০৪
দুই একটী কথা মাত্র ...	৬
দুর্গাপূজা ...	১৩০
দুর্দ্দৈবে সুযোগ নষ্ট ...	১৮৩
ধর্ম্মের পুরস্কার ...	২৭২
নাগপুরিয়া কমলা ...	২৫১
পারিবারিক সংস্কার ...	২৩৪
প্রজাপতি ...	৮৫
প্রতিধ্বনি ...	২৪৭
প্রাকৃত ভূগোলবিজ্ঞান	৩৯, ৮৮, ১৬০
বঙ্গমহিলা (গদ্য)	২১৭, ২৪১, ২৬৫
বঙ্গমহিলা (পদ্য) ...	১৭
বঙ্গমহিলার স্বপ্ন ...	৬৪
বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ সংস্কার	১১, ২৮, ৭৩, ১৭৮, ১৯৩, ২৭৭
বসন্ত প্রভাত ...	২৩৩

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
বামাগণের রচনা ;—	
১। অনিত্য সংসার ...	১৬৬
২। আশা ...	২১
৩। ঈশ্বর ...	১২০
৪। ঈশ্বরের প্রতি ...	২৩
৫। কবি অভাবে কবিতা...	১৯০
৬। নারীজন্ম কি অধর্ম্ম ...	৯৩
৭। চিন্তা	২৬০
৮। পতি সতীর একমাত্র গতি	৪৬
৯। প্রাবৃটকমল ...	৯৫
১০। বঙ্গনারী ...	৪৫
১১। ভারতমাতা ...	১৬৩
১২। ভীষণা ...	১১৯
১৩। মনুষ্য জীবন ...	১১৭
১৪। মনের প্রতি উপদেশ	১৪৪
১৫। রজনী ...	৬৯
১৬। লর্ড ক্লাইবের আত্মহত্যা ...	২[illegible]
১৭। শরৎশশী দর্শনে সখীর-প্রতি ...	২১২
ভানুমতী ...	২০৩, ২২৬, ২৫৪
ভারত-কমলা ...	৩৫
ভারতে কুমার ...	১৭৪
ভূমিকা ...	১
মহারাষ্ট্রীয় জাতি ...	১৫৪

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
মাননীয়া মিসৃষ্ট্রেস ফিয়ারের অভিনন্দন	২৮৭
মুক্তা	৬১
যুবরাজ (সচিত্র)	১৬৯
শারদীয় মহোৎসব	১৪০
শাসনপ্রণালী	২৫, ৭৮
সমস্যা	৯৩
সরোজিনী	২০১
সাবিত্রী	৫৮
স্বাস্থ্যরক্ষা (সচিত্র)	১৯, ৬৬, ১১০, ১৮৩, ২০৮

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
স্ত্রীলোকের প্রকৃত স্বাধীনতা	৫৫
স্ত্রীশিক্ষা	৯৭, ১২১
স্বর্গীয় বাবু প্যারীচরণ সরকার	১৪৫
(ঐ) বিলাপ লহরী	১৫১
সংবাদসার	২৪, ৪৮, ৭২, ৯৬, ১২০, ১৬৬, ১৯২, ২১৩, ২৬৪
হিন্দুজাতির পুরাবৃত্ত	৪৯

বঙ্গমহিলা।

নারী হি জননী পুংসাং নারী শ্রীরুচ্যতে বুধৈঃ।
তস্মাৎ গেহে গৃহস্থানাং নারীশিক্ষা গরীয়সী।

১ম খণ্ড। বৈশাখ ১২৮২। ১ম সংখ্যা।

ভূমিকা।

আমরা এককখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। "বঙ্গমহিলা" নামে ইহার নামকরণ করিলাম। বঙ্গবাসিনীগণের হস্তে সময়ে সময়ে নীতিগর্ব্ভ ও জ্ঞানগর্ব্ভ প্রবন্ধ সকল উপহার দেওয়াই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহারা গৃহকর্ম্মের বিরামে মধ্যে মধ্যে যে অবকাশ প্রাপ্ত হন, তাহা বৃথাগল্পে অতিবাহিত না হইয়া, যাহাতে সৎচর্চ্চায় অতিবাহিত হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের প্রধান যত্ন থাকিবেক। যদিও অধুনা স্ত্রীশিক্ষার কেবল উপক্রম মাত্র হইয়াছে বলিতে হইবেক, তথাপি আমাদের বিশ্বাস এই যে, এই পত্রিকা সুপ্রণালীমত সম্পাদিত হইলে, আমাদের পাঠিকাশ্রেণীর অসদ্ভাব হইবেক না। শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের বিজ্ঞাপনী যদি স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত প্রস্তাবে পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে আমাদের নিরুৎসাহ হইবার কারণ আছে, এবং বালিকাবিদ্যালয় ও অন্তঃপুরিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা দেখিলেও বিশেষ ভরসা জন্মে না; তথাপি [illegible]
বর্ত্তন করিতে পা[illegible]

আছেন, যিনি স্ব স্ব ভগিনী, ভার্য্যা ও কন্যাদিগের শিক্ষা... প্রতি যত্ন না করেন, এবং এরূপ ভদ্র পরিবারেরও সংখ্যা বিরল, যাহাতে একজন না একজন কৃতবিদ্য না আছেন। অতএব বাহ্যদর্শী ও বৈদেশিকদিগের নিকট শিক্ষিত মহিলার সংখ্যা যত অল্প বোধ হয়, বস্তুতঃ সেরূপ নহে। উপরি উক্ত বিশ্বাসের বশম্বদ হইয়া এবং সাধুগণের সাহায্য লাভের প্রত্যাশায় প্রোৎসাহিত হইয়া আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছি।

আমরা বর্ত্তমানে একটী প্রকৃত অভাবও প্রত্যক্ষ করিতেছি। এইরূপ কর্ত্তব্য সত্তাহার পরিহারার্থ সাধ্যমত প্রয়াস পাওয়া উচিত, স্বাত্তানে আমাদের মন উত্তেজিত হইতেছে। অধুনা যে সকল জ্ঞান-গর্ব্ভ সামযিক পত্র প্রচারিত হইতেছে, তৎসমস্তই উচ্চ অঙ্গের। তাহাদের রচনাগাম্ভীর্য্য ও অর্থগৌরব বঙ্গীয় যুবতীগণের পক্ষে সুগম নহে। অতএব সরল ভাষায় ঋজু ও অনতিগুরু বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করিয়া তাঁহাদের চিত্তানুবর্ত্তন করাই আমাদের সংকল্প। এখন ভরসা করি যে, সহৃদয়গণ আমাদের এই উদ্যোগ-কে অসাময়িক ও পুনরুক্ত বলিয়া মনে করিবেন না। আর যখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণ আনুকূল্যপ্রদানে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তখন এরূপ ভরসাও জন্মে যে, আমাদের এই কল্পনা দুরাশা বলিয়া তিরস্কৃত হইবেক না, এবং আমাদের এই উদ্যম অনধিকার চর্চ্চায় পর্য্যবসিত না হইয়া কোন না কোন রূপে সফল হইবেক।

জ্ঞানগর্ব্ভ প্রবন্ধের নিতান্ত ছড়াছড়ি হইলে, রচনা নীরস হয়, এবং কাহারও চিত্ত বিনোদন করিতে পারে না। পুরাণে বলে, নিত্য সুধাপায়ী পিতৃলোকগণও মধ্যে মধ্যে অষ্টকা শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে মধু মাংসাদি কামনা করিয়া থাকেন। অধিক কি, মরুৎ-যজ্ঞে বহুকাল ক্রমাগত হবির্ভোজন করাতে স্বয়ং বৈশ্বানরেরও ...গ্নি হইয়াছিল, পরিশেষে বিবিধ পশুপক্ষিসমাকীর্ণ খাণ্ডবারণ্য

মান্দ্য জন্মে; কিন্তু মধ্যে মধ্যে ভিন্ন রকমের আহার সামগ্রী প্রাপ্ত হইলে তাহার সজীবতা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ নারীগণ স্বভাবতঃ বৈচিত্র্যপ্রিয়; তাঁহাদের মন বালকের ন্যায় তরল ও নিরন্তর নব নব বস্তু দর্শনে উৎসুক। সুতরাং কৌতুককর বিবিধ বিষয়ের প্রচুর পরিমাণে সমাবেশ করিয়া, যাহাতে তাঁহাদের পাঠপ্রবৃত্তি ক্রমশঃ সজীব ও সতেজ হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অতএব আমাদের এই পত্রিকাতে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রঘটিত প্রবন্ধের ন্যায়, ইতিহাস, জীবনচরিত, এবং উপন্যাসও যথোচিত পরিমাণে সন্নিবেশিত হইবেক। অস্মদ্দেশীয় কতিপয় কৃতী লেখকের কৃতকার্য্যতা দর্শনে আমরা এইরূপে রচনার বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতে প্রোৎসাহিত হইতেছি। কিন্তু ইহাও স্বীকার করা উচিত যে, যোষিদ্‌গণের নিজের দৃষ্টান্তই আমাদের প্রধান উত্তেজক। সকলেই জানেন যে, তাঁহাদের গৃহিণীরা সেই আলু পটল বার্ত্তাকু প্রভৃতি লইয়া নিত্য নূতন নূতন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া তঁহাদের রসনাকে কিরূপে তৃপ্ত করেন। আমরা উদ্ভিজ্জভোজী, ও ভোজনবিষয়ে নিতান্ত আড়-ম্বরহীন; তথাপি আমাদের রসনা রসের বৈচিত্র্য ও স্বাদের তারতম্য অনুভব করিতে নিতান্ত তীক্ষ্ণ। কিন্তু গৃহিণীগণ সামান্য উদ্ভিজ্জ লইয়া রসবৈচিত্র্য সম্পাদন করিতে তাদৃশ গুণপনা প্রকাশ করিতে না পারিলে, আমাদের রসনার ঈদৃশ তীক্ষ্ণতা বিড়ম্বনামাত্র হইত সন্দেহ নাই। ইহা আমাদের শ্লাঘার বিষয় এবং ইহার অপলাপে অকৃতজ্ঞতাও আছে ভাবিয়া, আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, কেবল বঙ্গবাসী যে পঞ্চাশৎ ব্যঞ্জন অস্বাদনে অধিকারী হইয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই তাঁহার গৃহিণীর গুণে। অতএব চক্ষের উপর ঈদৃশ প্রবল দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমাদের শিক্ষালাভ করা উচিত, এবং যাহাতে আমাদের রচনা নানা রসে রুচির হইয়া বামাগণের চিত্তানু-বর্ত্তন করিতে পারে, তদ্বিষয়ে

অধিক সুবিধা আছে; কারণ তাঁহাদের উপকরণে ছয়টিমাত্র রস আছে, কিন্তু আমাদের উপকরণ নবরসে পূর্ণ। অতএব এরূপ সুবিধাসত্ত্বেও যদি আমরা নিতান্ত বিকলপ্রযত্ন হই, তাহা কেবল আমাদের নিজেরই দোষ বলিতে হইবেক।

অধুনা আর একটী কথার উল্লেখ করিবার অবসর হইতেছে। কি কবি, কি তত্ত্বদর্শী, সকলেই স্বীকার করেন, এবং ইতিহাসও সাক্ষ্য দিতেছেন যে, যোষিদ্‌গণ বর্ত্তমান ঘটনাতে যাদৃশ আগ্রহ প্রকাশ করেন, অতীত ও ভবিষ্যতে সেরূপ করেন না। অবশ্য, শিক্ষার প্রভাবে এই পক্ষপাতের অনেক হ্রাস হয়; তথাপি ইহা তাঁহাদের প্রকৃতিগত, এককালে উন্মূলিত হইতে পারে না। অতএব যে রচনা প্রধানতঃ বামাগণের জন্য অভিপ্রেত, তাহাতে বর্ত্তমানের সহিত যথোচিত সংস্রব রাখা বিধেয়। এখন মনে করা উচিত যে, ইতিহাস, জীবনচরিত ও উপন্যাস সম্পূর্ণরূপে এবং সাহিত্য ও কাব্যকলা কতক পরিমাণে অতীতের অন্তর্গত। আর বিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রে বর্ত্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেরও অংশ আছে; কিন্তু উহা সম্পূর্ণভাবে অতীতের সার সংগ্রহ মাত্র। অতএব আমাদের এই পত্রিকাতে বর্ত্তমান ঘটনার যথোচিত সমাবেশ করিবার জন্য সবিশেষ যত্ন করা যাইবেক। আমরা রাজনীতি ঘটিত মতামতের আন্দোলন করিব না, কারণ রাজনীতি অস্মদ্দেশীয় রমণীগণের বর্ত্তমানে হৃদয়গ্রাহী বা সুগম হইবেক না। কিন্তু উহা যে পরিমাণে আমাদের সামাজিক আচারব্যবহারকে স্পর্শ করিবেক, তাহার বর্ণন করিতে পরাঙ্মুখ হইব না।

আমাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই যে, সুশিক্ষিতা রমণীগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ, তাঁহাদের রচনা এই পত্রিকাতে সাদরে গ্রহণ করিব। আমাদের বিজ্ঞাপনে উক্ত বিষয়টী পাঠ করিয়া একজন সম্পাদক ইতিমধ্যেই কটাক্ষ করিয়াছেন। তিনি বলেন, পুরুষের সাহায্য ব্যতীত ... এবং এদেশীয় রমণীগণ

পারে। সুতরাং যাহাতে সুলেখকদিগের রচিত সন্দর্ভ পাঠ করিয়া তাহাদের জ্ঞানোন্নতি সাধিত হয় তাহাই কর্ত্তব্য। অবশ্য, সাধারণের পক্ষে এই কথাই হইতেছে; কিন্তু ইহা বিস্মরণ হওয়া উচিত নহে যে—

কে জানে কত যে মণি নিরমল ভাতি,
অগাধ জলধিতলে জ্বলে দিবা রাতি।
কত যে ফুলের কলি ফুটি মরুপরে,
অলক্ষ্যে সৌরভডালি সমীরে বিতরে॥

আমরা সেই সকল রত্ন ও কুসুম উদ্ধার করিতে সঙ্কল্প করিতেছি। ঈশ্বর গুপ্তের সরস কবিতা পাঠে সকলেই পুলকিত হন; কিন্তু কে জানে যে তাঁহার কবিতাস্তবকের মধ্যে অনেকগুলি মনোরম কুসুম একজন বঙ্গরমণীর কল্পনালতাতে বিকশিত হইয়াছিল। কবি পার্ণেল কৃত "তপস্বীর" বাঙ্গালা পয়ার অনেকে পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা স্বপ্নেও জানেন না যে, একজন এদেশীয় কুলবালা তদপেক্ষা মনোরম উহার পয়ার অনুবাদ করিয়া রাখিয়াছেন; তাহা অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই এবং কখন হইবারও সম্ভাবনা নাই।

আমরা আর বাক্যব্যয় করিব না; কেবল এই বলিয়া উপসংহার করিব যে, আমরা এই পত্রিকাখানিকে স্ত্রীশিক্ষার একটী অঙ্গ স্বরূপ মনে করি, এবং যখন ইহার উদ্দেশ্য বিশ্বজনীন, অর্থাৎ দল বিশেষের মতানুযায়ী নহে, তখন আমরা আশ্বস্তচিত্তে প্রার্থনা ও প্রত্যাশা করিতে পারি যে, ইহা সাধারণের অনুগ্রহভাজন হইয়া স্বকার্য্যসাধনে অধিকারী হইবেক।

দুই একটী কথামাত্র।

পরমেশ্বর এই পৃথিবীতে যত প্রকার জীব সৃষ্টি করিয়াছেন তন্মধ্যে মনুষ্যই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শারীরিক বলবীর্য্যে মানব

করিলে মনুষ্যকে অনেকেরই নিকট পরাস্ত হইতে হয়, কিন্তু মানসিক বৃত্তি বিষয়ে কোন জন্তুরই ইহার সহিত তুলনা হইতে পারে না। দ্বাদশবর্ষীয় বালকের সচরাচর যাদৃশ বুদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়, ইতর প্রাণীর পূর্ণবয়স্কেরও তাদৃশ কখন লক্ষ্য হয় না। পশু পক্ষী প্রভৃতিরা সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে অবস্থায় ছিল, অদ্যাবধিও তাহারা সেই অবস্থাতে কালযাপন করিতেছে; সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহারা যে প্রকার আবাস ও নীড় নির্ম্মাণ করিত, এক্ষণেও তাহারা সেই প্রকারই করিয়া থাকে; উন্নতি কি অধোগতি কিছুই হয় নাই, আহার ব্যবহার প্রভৃতিতে অণুমাত্র পরিবর্ত্তন দৃষ্টি হয় না। কেবল মনুষ্যই কাল সহকারে পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হয়। সহস্র বৎসর যে জাতি ঘোর অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন পশুবৎ জীবন অতিবাহিত করিতেছিল, এক্ষণে তাহারা বিদ্যালোক প্রাপ্ত হইয়া উন্নতিসোপানের সর্ব্বোপরিস্থ পদোপরি বিরাজ করিতেছে। যে জাতি এককালে গাঢ় অরণ্য মধ্যে পশুগণ সমভিব্যাহারে আশ্রয়বিহীন ও বস্ত্রবিবর্জ্জিত হইয়া দিনপাত করিত, তাহারা এক্ষণে মনোহর প্রাসাদশ্রেণী-পরিশোভিত নগর মধ্যে গৃহনির্ম্মাণ পূর্ব্বক রৌদ্রাদি-উৎপীড়ন হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করতঃ পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, কালসহকারে মানবগণ সচেষ্ট হইলে যেমন উন্নতি লাভ করিতে পারে, আপনাদের কর্ত্তব্যানুশীলনে বিমুখ হইলে কালসহকারে সেই প্রকার অধোগতিও প্রাপ্ত হইতে পরে। পণ্ডিতেরা ইতিহাসে যেমন অসভ্যাবস্থা হইতে অনেক জাতিকে সভ্যাবস্থা লাভ করিতে দেখিয়াছেন, সভ্যাবস্থা হইতেও তদ্রূপ নিজ দোষবশতঃ অনেক জাতিকে অসভ্যাবস্থায় আসিতে দেখিয়াছেন। বিদ্যালোচনা, বাণিজ্য প্রভৃতি দ্বারা যাহারা এককালে মানবগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইত, আলস্যাদি দোষে কলুষিত হইয়া ক্রমে তাহারা

তেছে। হিন্দু, মিসর প্রভৃতি জাতিরা ইহার উদাহরণস্থল। যে ইংরাজজাতি অধুনা গভীর জলধি উল্লঙ্ঘন করিয়া, পৃথিবীর এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত নানাদেশ দেশান্তর ব্যাপন করিয়া রহিয়াছে, যাহারা এক্ষণে বিদ্যাবলে জ্ঞানপ্রভাবে ভূলোক পরিত্যাগ করিয়া গগনমণ্ডলে যথেচ্ছা সঞ্চরণ করিতেছে, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহারা মোহতিমিরাবৃত হইয়া পশুগণের সহিত পশুদিগের ন্যায় অরণ্যমধ্যে পরিভ্রমণ করতঃ জীবন যাপন করিত! যে আর্য্যজাতি পুরাকালে মানবগণের নিকট সভ্যতার আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল, অন্যান্য দেশবাসীগণ যাহাদিগের নিকট সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছিল, সেই আর্য্যজাতি পুনরায় কালসহকারে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে অপর জাতির নিকট সভ্যতা শিক্ষা করিতেছে। কালের কি বিচিত্র গতি! গ্রীস ও রোম্ এককালে সমস্ত জগতের অধীশ্বর হইয়া দিগ্‌দিগন্তরের রাজগণকে অধীনস্থ করিয়াছিল;—বোধ হইল যে, এই জগৎসংসারই কেবল তাহাদিগের আধিপত্য জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, এবং অন্যান্য মানবগণ তাঁহাদিগের দাসত্বভার বহন করিবার নিমিত্তই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; এক্ষণে সেই গ্রীস ও রোম্ অপরজাতির সাহায্যে পরাধিপত্য হইতে মুক্ত হইয়া বহু কষ্টে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। শিল্পাদি সকল বিদ্যা প্রসূতি গ্রীসদেশে বিদ্যার পরিবর্ত্তে আলস্য ও মূর্খতার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে দিন দিন দস্যুবৃত্তির বৃদ্ধি হইতেছে। যে ভারতভূমিতে জ্যোতিষ্ শাস্ত্র জন্মগ্রহণ করে, যে ভারতভূমি কাব্যশাস্ত্রাদি নানা বিদ্যার প্রসূতি, সেই ভারতভূমি এক্ষণে অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া মলিন বেশ ধারণ করিয়াছে। যে ভারতবর্ষের বিক্রমে এককালে ত্রিভুবন কম্পিত হইত, সেই ভারতবর্ষ এক্ষণে পরাধীন হইয়া অপর জাতির দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যের

এক্ষণে অবসন্নপ্রায় বোধ হয়, এবং ভারতবর্ষীয়েরা এক্ষণে পুনরা জ্ঞানালোক ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। জ্ঞানসূর্য্য প্রথমে ভারতবর্ষে উদয় হইয়া ক্রমে ক্রমে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়া, পারস্য ও মিসর রাজ্যে উদয় হইয়াছিল; পরে তাহাও অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ গ্রীস ও রোম্ রাজ্য দীপ্তিমান করতঃ ভারতরাজ্যে অস্তপ্রায় হইল, ও অজ্ঞান-তামসীর ছায়া আসিয়া দেশ আবরণ করিল। ক্রমে জ্ঞান-সূর্য্য যত পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া ইংলণ্ড আমেরিকাদিতে উদয় হইতে লাগিল, ততই অজ্ঞান রজনীর গাঢ় অন্ধকার ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া ভারতবাসিদিগকে মোহ-নিদ্রায় নিদ্রিত করিয়া ফেলিল। ঈশ্বরপ্রসাদে সেই অলৌকিক জ্ঞানালোক পুনর্ব্বার পূর্ব্বদিকে ভারতবর্ষে উদয় হইয়া গগনমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় করিয়াছে এবং সহস্র বৎসরব্যাপী অজ্ঞান-নিশাকে আপনার উজ্জ্বল রশ্মিদ্বারা দূরীভূত করিতেছে।

জ্ঞানলাভ ব্যতীত দেশের উন্নতি হইতে পরে না; কিন্তু বিদ্যাশিক্ষা ব্যতীত জ্ঞানলাভ হইতে পারে না। যে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে আবালবৃদ্ধ সকলেরই মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যানুশীলন না হইবে, তত দিন ভারতবাসিদিগের প্রকৃত উন্নতি সাধন হইবে না। অনেক সংখ্যক ব্যক্তি একত্র হইয়াই এক একটী সমাজ সংস্থাপন হয়; এবং যে সমাজস্থ ব্যক্তিগণ মূর্খ ও অজ্ঞ, সেই সমাজ কখন সম্পূর্ণরূপে উন্নত হইতে পারে না। এই জন্য সকলেরই বিদ্যাভ্যাস করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু বাল্যাবস্থায় বিদ্যাশিক্ষা যে প্রকার ফলবতী হয়, এমন আর জীবনের কোন অবস্থায় হয় না। শিশুগণের কোমল মানসে উপদেশাদি বদ্ধমূল হইয়া যেরূপ ফলবান হয়, সেরূপ যৌবনে কি বৃদ্ধাবস্থায় কখনই হইতে পারে না। লোকে বাল্যাবস্থায় যে প্রকায় শিক্ষা পায়, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সেই প্রকার আচরণ করে। জন্মগ্রহণ কালে মানবগণের মধ্যে ইতর বিশেষ সাধু অসাধু পণ্ডিত মূর্খ প্রভৃতি

শিক্ষা পায়, বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহাদের চরিত্র সেইরূপ হইতে থাকে।

এই কোমলাবস্থায় জননী হইতে যত উপকার সম্ভব এমন অন্য কাহারও নিকট হইতে সম্ভব হইতে পারে না। তিনি সন্তানকে যাহা শিক্ষা দিবেন, সন্তানের তাহা বজ্রের ন্যায় হৃদয়ে অঙ্কিত হইবে। কিন্তু জননী স্বয়ং উত্তমরূপে শিক্ষিতা না হইলে কখনই সন্তানকে সুশিক্ষা প্রদান করিতে সক্ষম হইতে পারেন না। অজ্ঞের নিকট জ্ঞান শিক্ষা সম্ভব হয় না; মূর্খের নিকট বিদ্যা-ভ্যাস অনলমধ্যে তুষারানুসন্ধানের ন্যায়। অতএব নারীগণেরও উত্তমরূপ বিদ্যাশিক্ষা অত্যন্ত আবশ্যক। সুতরাং কোন সমাজের যথার্থ উন্নতি লাভের আকাংক্ষা পূর্ণ করিতে হইলে সেই সমাজান্তর্ভূত কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলেরই বিদ্যানুশীলন করা কর্ত্তব্য। পুরুষ ও স্ত্রীজাতি উভয়ে একত্র হইয়াই সমাজ সংস্থাপিত হয়, স্ত্রীজাতি কখনই সমাজের বহির্ভূত নহে। পুরুষ সম্প্রদায় ইহার অর্দ্ধাংশমাত্র, অপর অর্দ্ধাংশ স্ত্রীবর্গ। তবে কি প্রকারে এক অংশকে পরিত্যাগ করিয়া অপর অংশের উন্নতি দ্বারা সমস্ত সমাজের উন্নতি সাধন হইতে পারে? যেমন গৃহের অর্দ্ধাংশ মার্জ্জন করিলে সমুদয় গৃহ মার্জ্জিত হয় না, বরং অপরিষ্কৃত অংশের ধূলিরাশি আসিয়া মার্জ্জিত অংশকেও ধূসরিত করে, সেই প্রকার কেবল পুরুষদিগের বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানলাভ দ্বারা সমস্ত সমাজের উন্নতি হইতে পারে না, বরং নারীদিগের কুসংস্কারাদি অজ্ঞতা প্রযুক্ত দোষসমূহ পুত্রাদিদ্বারা পুরুষদিগকেও কলুষিত করিয়া ফেলে। যে প্রকারে চিন্তা করা যায়, সকল প্রকারেই নারীদিগেরও বিদ্যাশিক্ষা অতীব আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ পরমাত্মিক সম্বন্ধে যে সকল বিষয় একান্ত প্রয়োজনীয় সে সমুদয় উত্তমরূপে বিদ্যা ও জ্ঞানলাভ ব্যতীত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। নারীগণের কি পরমাত্মিক বিষয়ে কোন সংস্রব

জন করে না? পরস্পর কলহ বিবাদ দ্বেষ ইত্যাদিতে অহোরাত্র যাপন করিলে কি তাহাদের কিছুমাত্র দোষ নাই?

বিদ্যাই যদি উন্নতি লাভের এক মাত্র উপায় হইল, তাহা হইলে কি প্রকারে উত্তমরূপে বিদ্যালাভ করা যাইতে পারে তাহা দেখা আবশ্যক। ইহা দুই প্রাকারে উপার্জ্জন করা যাইতে পারে,—প্রথম, পুস্তকাদি পাঠ দ্বারা, দ্বিতীয়, দেশ ভ্রমণ বা অপরের নিকট হইতে বাচনিক শিক্ষাদ্বারা। কেবল মাত্র দ্বিতীয়টীর সাহায্য দ্বারা অতি অল্পমাত্র বিদ্যা ও জ্ঞান সঞ্চয় হইতে পারে, ইহা বোধ হয় সকলেই জানেন। দেশ ভ্রমণ করা ঐশ্বর্য্যশালী দিগেরই পক্ষে সম্ভবে; এবং তাঁহারাও তাহাতে প্রচুর উপকার প্রাপ্ত হইতে পারেন না। সমস্ত পৃথিবীর সকল স্থানে কি কি পদার্থ আছে,কি কি স্বাভাবিক নিয়মানুসারে তাহাদিগের কার্য্যাদি চলিতেছে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে কি প্রকার আচার ব্যবহার ইত্যাদি চলিত, এক ব্যক্তি যাবজ্জীবন দেশভ্রমণ করিলেও জ্ঞাত হইতে পারেন না। তাহা হইলেও বর্ত্তমানই কিয়ৎ পরিমাণে অবগত হওয়া যায়; অতীত কালে এই পৃথিবীতে কি হইয়া গিয়াছে, তাহার কিছুমাত্রও জানা যায় না, এবং অপরের নিকট হইতে বাচনিক শিক্ষা দ্বারা যে ইহা অপেক্ষাও অল্প জ্ঞান সঞ্চয় হয়, ইহ প্রমাণ করিবার আবশ্যক করে না। সুতরাং প্রকৃতরূপে জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে হইলে, উপরি কথিত উভয় প্রকার উপায়েরই সাহায্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। প্রথমে পুস্তকাদি পাঠ দ্বারা মনোমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয়, ভিন্ন ভিন্ন সাময়িক মানবগণ উপার্জ্জিত বিদ্যা, অল্পায়াসে ও অল্প ব্যয়ে সংগ্রহ করিয়া, পরে দেশভ্রমণ করিয়া স্বয়ং পৃথিবীর নানা স্থান ও নানা জাতি লোক দর্শন করিলে সমধিক উপকার দর্শিতে পারে। ইতিহাস, জীবন চরিত, ও বিজ্ঞান এই তিন বিষয়ক পুস্তকগুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ; কিন্তু এই তিনটী উত্তমরূপে বুঝিবার জন্য ভূগোল সাহিত্য অঙ্কবিদ্যা ইত্যাদি

অলঙ্কারাদির সাহায্য আবশ্যক করে। সুতরাং উত্তমরূপে বিদ্যা-শিক্ষা করা অত্যন্ত যত্ন ও পরিশ্রমের কর্ম্ম; কিন্তু সেই যত্ন আর পরিশ্রম দ্বারা যে অশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় ইহা বলা বাহুল্য।

মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক উৎকর্ষেরও চেষ্টা করা আবশ্যক। একটীকে অবহেলা করিয়া অপরটীর প্রতি যত্নবান হইলে প্রকৃত উন্নতি প্রাপ্তি হইতে পারে না। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ না করে, তাহার মানসিক উৎকর্ষ উত্তমরূপে সাধন হইতে পারে না। তাহাদিগের শরীর প্রায় রোগাক্রান্ত থাকিয়া তাহাদিগকে নানা প্রকার ক্লেশ দিয়া অনুধাবিত পথ হইতে তাহাদিগকে বিরত করিতে চেষ্টা করে। যাহারা আপনাদিগের মনকে সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করিয়া শরীরের প্রতি যত্নবান হয়, তাহারা কখন মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যাঁহারা আপনাদিগের শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ উৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট হইয়া কার্য্য করেন, তাঁহারাই যথার্থ জ্ঞানী, এবং তাঁহারাই ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভের আশা করিতে পারেন। ইহা যে কেবল পুরুষদিগের কর্ত্তব্য এমত নহে; কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলেরই এই চেষ্টা থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ-সংস্কার।

আজি কালি সকলেই সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হইতেছেন। যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেইদিকেই বিষম আড়ম্বর দেখা যায়। কি যুবা কি বৃদ্ধ সকলেই আমাদিগের সমাজ লইয়া মহা কোলাহল আরম্ভ করিতেছেন, কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে কত সংখ্যা যথার্থ সংস্কারক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, তাহা আমরা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারিনা। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে,যে ইহাদের অনে-

বিদেশীয় ভাষা, বিদেশীয় পরিচ্ছদ, কি বিদেশীয় কুরীতি অবলম্বন করা যদি সংস্কার হয়, তাহা হইলে ইঁহারা সকলেই দেশের মঙ্গল-সাধনে কৃতকার্য্য হইবেন; সুদীর্ঘ এবং সুন্দর পদবিন্যস্ত বক্তৃতা, পরনিন্দা, অথবা স্বদেশ-মমতাশূন্যতা যদি যথার্থ সংস্কৃতি হয়, তাহা হইলে ইঁহারা সকলেই আমাদিগের দেশের প্রধান সংস্কারক পদে বৃত হইতে পারেন। কিন্তু হায়! চিন্তাশীল কোন ব্যক্তি ইঁহাদিগের অসারত্ব দেখিতে সক্ষম নহেন। কিছুমাত্র চিন্তা করিলে স্পষ্টরূপে দেখা যাইতে পারে যে, ইঁহারা যাহাকে সংস্কার কহেন তাহা প্রকৃত সংস্কার নহে। বাস্তব বলিয়া যাহার পশ্চাদ্ধাবনে ইঁহারা যত্নবান হইতেছেন, তাহা কেবলমাত্র ছায়া; বাহ্যসৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া আভ্যন্তরিক বিকৃতি দেখিতে পাইতেছেন না।

উপর্য্যুক্ত পাঠে কেহ কেহ ইহা মনে করিতে পারেন, যে আমরা সমাজের দোষ সংশোধনে ব্যাঘাত স্বরূপ হইতেছি, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সত্য, আমরা পুরাতন বিষয়গুলি সাতিশয় ভালবাসি সত্য বটে, প্রাচীনা রীতি আমাদিগের নিকট বিশেষ আদরণীয়া, কিন্তু তাহা বলিয়া ইহা আমরা কোন প্রকারে স্বীকার করিতে পারিনা যে, প্রাচীনা রীতিগুলির মধ্যে যেগুলি দোষস্পৃষ্ট তাহা বর্জ্জনীয় নহে। পুরাতন কি আধুনিক, দেশীয় কি বিদেশীয় বলিয়া কুরীতিগুলি যে সমাজবদ্ধ হয়, ইহা জ্ঞানবান কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিতে পারেন না। তবে ইহাও বক্তব্য যে, নূতন বলিয়া গ্রহণীয়, আর পুরাতন বলিয়া বর্জ্জনীয় হইবে, ইহা কোনপ্রকারে যুক্তিসিদ্ধ নহে। আমরা ভালকে প্রীতিচক্ষে দেখি। যে কোন বিষয় সমাজের হিতসাধনে অর্থিত হইতে পারে, তাহাই উত্তম এবং আদরণীয়।

অনেকের এরূপ কুসংস্কার আছে যে, তাঁহারা স্বদেশীয় ভিন্ন বিদেশীয় কোন বিষয় শ্লাঘ্য জ্ঞান করেন না। তাঁহারা ভাবিয়া থাকেন যে, স্বদেশের প্রশংসা এবং বিদেশের নিন্দা করাকে যথার্থ দেশ-

পরতা বোধ হয়। এক জাতিতে এবং তন্মধ্যস্থ একজনেতে যাদৃশ সম্বন্ধ, মানব জাতিতে ও তাহার অভ্যন্তরিক ভিন্ন-ভিন্ন জাতিতে তাদৃশ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। যদি স্বজাতির মধ্যে আপনার গুণ বর্ণনা করা ঘৃণাকর বোধ হয়, তাহা হইলে মানব জাতির মধ্যে কেবলমাত্র স্বজাতির গৌরব করা অধিকতর ঘৃণাকর বোধ হওয়া কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ মানব জাতিরা পরস্পর নিরপেক্ষ হইতে পারেনা। পরস্পর পরস্পরের সদ্গুণ অনুকরণ করা সকলেরই পক্ষে কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ফলতঃ, সমস্ত গুণগুলি যে একাধারীভূত হইবে ইহা আশা করা যাইতে পারেনা যে জগদীশ্বর আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন, সেই জগদীশ্বরই অন্যান্য জাতীয় লোকদিগকে সৃজন করিয়াছেন। আমাদিগেকে তিনি যাদৃশ মানসিক নৈতিক ও শারীক ক্ষমতাসম্পন্ন করিয়াছেন, অন্যান্য লোকদিগকেও তাদৃশ করিয়াছেন। অতএব আমাদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্টতা প্রমাণ করিতে হইলে ইহাও প্রমাণ করা আবশ্যক যে, আমরা সকলের অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার ক্ষমতাগুলির যথাবিধি চালনা করিয়া আসিতেছি, নচেৎ ইহা বাক্যমাত্র সার হইবে। এবং যদিও ইউরোপীয় পুরাতনতত্ত্ববিদেরা মীমাংসা করিয়াছেন যে, আমরা অন্যান্য জাতিদিগের অপেক্ষা অনেক পূর্ব্বে সভ্যসোপানে পদার্পণ করিয়াছি, তথাপি ইহা কোন ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন না যে, এক্ষণে আমরা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর উন্নতি লাভ করিতেছি। বস্তুতঃ আমরা অনেকাংশে পৃথিবীর অনেক জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট অবস্থায় আছি। মানসিক এবং শারীরিক বিষয়ে ইউরোপীয়েরা ও আমেরিকাবাসীরা আমাদিগের অপেক্ষা যে অনেক উৎকৃষ্ট, তাহা অপক্ষপাতী কোন ব্যক্তিই সন্দেহ করিতে পারেন না।

পুনর্ব্বার এ কথাও শুনা যায় যে, যাহা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং যাহা সুবিজ্ঞ পণ্ডিতদিগের দ্বারা কল্পিত ও অনুমোদিত হইতেছে তাহা অবশ্যই উত্তম হইবে। বাস্তবিক

উত্তম হওয়াই সম্ভব। কারণ যাহা বহুদিবস হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা যদি কোন অংশে দোষস্পৃষ্ট হইত, তাহা হইলে তৎসাময়িক কোন না কোন ব্যক্তি তাহার দোষ দেখিতে পারিতেন, এবং সুতরাং তাহা সংশোধন করিতে যত্নবান্ হইতেন; কিম্বা যাহা সদাশয় ব্যক্তিদিগের দ্বারা কল্পিত বা অনুমত হইয়া আসিতেছে, তাহা যে দোষস্পৃষ্ট হইবে ইহাও সহজে প্রতীতি হয় না। এবং ইতিহাস পাঠ করিবার পূর্ব্বে আমরাও এই মত সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিতে পারিতাম। কিন্তু ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যাইতেছে যে; বহুকাল প্রচলিত এবং বিদ্বজ্জনানুমত অনেক বিষয় পশ্চাৎকালাগত ব্যক্তিদিগের দ্বারা ভ্রমাত্মক বলিয়া অননুমোদিত হইতেছে। স্থান সময় ও অবস্থা বুঝিয়া ভিন্ন ভিন্ন নিয়মাবলী আবিষ্কৃতা হইতেছে। এক স্থানে এই প্রথা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া সর্ব্বত্রই ঐরূপ হইবে, ইহা কোন প্রকারে আশা করা যাইতে পারে না। এবং এক সময়ে ইহা কোন বিশেষ সমাজের পক্ষে হিতকারী হইয়াছিল, অতএব সর্ব্বসময়েই ঐরূপ হইবে তাহা বোধ হয় না। বাস্তবিক পৃথিবীর সকল সমাজই ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এক দেশে কি এক সময়ে যাহা ভাল বোধ হইত, অপর দেশে বা অপর সময়ে তাহা নিতান্ত মন্দ বোধ হইতে পারে। ইউরোপীয় প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশের লোকদিগের গরম কাপড় পরিধান করা কর্ত্তব্য ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু তাহা বলিয়া উষ্ণ দেশবাসীরা যে তাহাদিগের অনুকরণ করিবে ইহা কোনমতে কাঙ্ক্ষনীয় হইতে পারে না। লুথার নামক ধর্ম্মসংস্কারকের পূর্ব্বে জর্ম্মাণী এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে রোমান্ কাথলিক্ নামে এক প্রকার খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, এবং তখন সকলেই ইহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিত। কিন্তু যখন লুথার রোমান্ কাথলিক্ ধর্ম্মের পৌত্তলিকতা প্রমাণ করিতে যত্নবান হইয়া সফলপ্রযত্ন হইলেন, এবং স্বদেশীয়দিগের চক্ষু

ধর্ম্ম প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে কে জানিত যে, সূর্য্য মধ্যস্থলে অবস্থিত আছে, এবং তাহার চতুর্দ্দিকে অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রগণ ভ্রমণ করিতেছে। তখন সকলেই জানিত যে, পৃথিবী এক স্থানে রহিয়াছে, এবং সূর্য্যাদি ইহার চতুর্দ্দিকি ঘুরিতেছে। এবং ইহার বিরুদ্ধে যদি কেহ অন্য কোন মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত, তাহা হইলে তাহাকে যথোচিতরূপে শাস্তি দেওয়া হইত। কিন্তু যখন কপার্ণিকস্ নামে বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বেত্তা স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে পৃথিবী ঘুরিতেছে আর সূর্য্য স্থির রহিয়াছে* তখন কত লোকের পূর্ব্বকার মত সংশোধিত হইতে লাগিল। ফিজী নামক দ্বীপবাসীরা অদ্যাপিও বৃদ্ধ পিতা মাতাকে বধ করিয়া তাহাদের মাংস অনায়াসে ভক্ষণ করে। এবং যদিও ইহা আমাদিগের নিকট সাতিশয় ঘৃণাকর বোধ হইতেছে, তাহারা ইহাকে পুণ্যস্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের মধ্যে সহমরণ, স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এক প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। এবং যে কোন স্ত্রীলোক পতির মৃত্যুকালে সহমরণে উদ্যত না হইতেন তাহাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিত। এইরূপে কত সতী ভ্রমপরবশ ও ভয়পরবশ হইয়া আত্ম প্রাণদানে কুণ্ঠিত হয়েন নাই! ১৮৩০ খ্রীষ্টীয় অব্দে, যখন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক এবং তাঁহার দুই জন কর্ম্মচারী বটরওয়ার্থ বেলি, আর সার্ চার্লস্ মেট্কাফ্ একত্র হইয়া সতীদাহ উঠাইবার নিমিত্ত আইন প্রচার করিলেন, তখন হিন্দুসমাজে কি ভয়ঙ্কর গোল উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে কোন্

* সূর্য্য যে একেবারে স্থির রহিয়াছে তাহা নয়। তবে অন্য গ্রহদিগের গতির সহিত তুলনা করিলে সূর্য্যকে স্থির রহিয়াছে বলা যাইতে পারে। হার্শেল্ প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদেরা নিশ্চয় করিয়াছেন যে, সূর্য্য অন্যান্য গ্রহগুলি লইয়া কোন বিশেষ একটী নক্ষত্রের দিকে গমন করিতেছে, এবং সেই নক্ষত্রের নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রায় গোলাকার পথ (Elliptic orbit)

সহৃদয় ব্যক্তি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার না করিবেন যে, পূর্ব্বোক্ত মহোদয়ত্রয় সতীদিগের জীবন দান করিয়া সমস্ত ভারতবাসীদিগকে চিরকালের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত সকলগুলির দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে আচার ব্যবহারাদি দেশকালাপেক্ষ। পুনরায় পণ্ডিতদিগের অনুমত বলিয়া ঐ প্রথাগুলি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে ইহাও অসম্ভব। মনুষ্যমাত্রেরই ভ্রম হয়। অদূরদর্শী মানবেরা সর্ব্বসময়োপযুক্ত রীতি নীতি সংস্থাপিত করিতে কখনই সক্ষম হইবে না। মনুষ্যের অবস্থানুসারে সমাজ পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হইবে। সুতরাং অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাও পশ্চাৎকালে সমাজের কিরূপ অবস্থা হইবে, তাহা পূর্ব্বে কোন প্রকারে গণনা করিতে পারেন না। তাঁহারা তাঁহাদিগের সময়ের অবস্থা দেখিয়া তৎকালিক কুরীতিগুলি সংশোধন করিতে পারেন, কিন্তু কালগর্ভে কি আছে তাহা কোন ব্যক্তিই নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। অতএব ইহা দেখা যাইতেছে যে মনুষ্যকল্পিক কোন বস্তু, যতেক পুরাতন হউক না কেন, কখন একেবারে দোষশূন্য হইতে পারে না।

কোন সমাজের দোষ গুণ বর্ণনা করিতে হইলে, তাহার আভ্যন্তরিক জনসমূহের দোষ গুণ বর্ণনা করা আবশ্যক। যে দেশের লোকেরা সদ্‌গুণবিশিষ্ট সে দেশের সমাজপদ্ধতি অবশ্য উত্তম, এবং কুসংস্কারবিশিষ্ট লোকদিগের দ্বারা নির্দ্দোষ সমাজ কখনই সংস্থাপিত হইতে পারে না। সুতরাং কোন দেশের সমাজপদ্ধতি সংশোধন করিবার পূর্ব্বে সেই দেশের স্ত্রীপুরুষদিগের অবস্থা কিদৃশী তাহা ভালরূপে জানা কর্ত্তব্য; এবং তাহাদিগের অবস্থা আলোচনা করিতে গেলে তাহাদিগের মানসিক নৈতিক এবং শারীরিক অবস্থাগুলি উত্তমরূপে অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আমরা প্রথমে আমাদিগের পুরুষদিগের অবস্থা বর্ণনা করিয়া তৎপরে স্ত্রীলোকদিগের বর্ণনা করিব।

বঙ্গমহিলা।

এই না সে বঙ্গ বিখ্যাত ভুবন,
সুখতর যথা অরুণ-কিরণ;
গুঞ্জরে দ্বিরেফ কমলবনে?

প্রকৃতি স্বজনী ঊষা-বিদ্যাধরী
বিবিধ কুসুমে সাজায়ে কবরী
ফুলময়-তনু — মরাল – গামিনী
নিতি নিতি যবে বিগত যামিনী,
সাদরে জাগায় কামিনীগণে।

এই না জাহ্নবী সুপবিত্র-কায়া
বহে কল কলে বৃষধ্বজ-জায়া,
হৃদয়ে বিরাজে অনন্ত গগন,
গ্রহরাজি তারা হিমাংশু তপন,
কতই গৌরব তরঙ্গ ধরে?

অদূরে শোভিছে তুঙ্গ মহীধর,
গভীর - প্রকৃতি, দুর্গম-শেখর,
নাম বিন্ধ্যাচল—নগেন্দ্র বিশাল,
মহীরুহ তাহে পিয়াল তমাল,
নানা বর্ণধারী বিহঙ্গের গান,
মনের উল্লাসে মিলায়ে সুতান,
ভুবন মোহিছে মধুর স্বরে।

চির পূণ্যভূমি—এ বঙ্গ ভবন,
রূপে নিরুপম, ধরণি - ভূষণ,
গুণের আকর দয়ার সাগর,
স্নেহের অমিয়া মাখান অন্তর,
পরবশে যার গেল চিরকাল,
তখনি ত তার পুড়েছে কপাল,
হৃদয়ের আশা ভরসা সকল,
তখনি ত তার হ'য়েছে বিফল,
সুখের আস্বাদ হ'য়েছে কষা।

রূপের মাধুরী বঙ্গের অঙ্গনা,
কমল - বদনা, হরিণ - নয়না,
নবনী জড়িত তনু সুকুমার,
চপলা জিনিয়া হাস্যের আকার,
ধর্ম্ম-পরায়ণা পতিব্রতা সতী,
সংসার-উদ্যানে ললিত ব্রততী;
তবে সে বিধাতা কেন রে নিদয়,
সন্তাপে দহিছে কোমল হৃদয়;
পরাধীনভাবে যাপি চিরকাল,
ধরিল সমাজ কৃপাণ করাল,
অবলা তাহাকে কেমনে রোধে?
চির অবরোধ কেনই সহিবে,
ভানুর কিরণ নাহিক দেখিবে;
অনন্ত জগত নভঃ নিরমল,
মলয় - সমীর সরসী - কমল,
নদ, নদী, গিরি, নির্ঝরের জল,
কেন বা এ সব হইবে গরল,
জগতের ঋণ কে পরিশোধে?

ঘুচেছে সে কাল জনমের মত,
যখন স্বাধীন ছিল অবিরত,

এবে সেই কথা হ'য়েছে স্বপন,
সমাজের জালে জড়িত জীবন,
গতি নিরূপিত বিধত প্রমাণ,
তবুও তাহাতে নাহি পরিত্রাণ।
ধিক্ হিন্দুকুল – সমাজ - ভূপতি,
করিল যে হেন নারীর দুর্গতি!
যুগল শৃঙ্খল করপদে যার
আর কি ভরসা আছে কিছু আর;
হৃদয় - আগুন হৃদয়ে পশিল,
বারিকণা তাহে নাহিক মিলিল;
জীবন জনম হইল বিফল,
চির শোক তাপে মানস বিকল
ভাসিছে নয়নে নিয়ত বারি।

তথাপি হতাশ—মৃত সে জীবন,
আশাই এ ভবে পরম রতন,
উন্নতির পথ সুখের সোপান,
দুখকর - আয়ু - জীবিত - নিদান
ভুবন শাসিত যাহার বলে।

ভারত মহিলা! জ্ঞানের সাধন,
কর সদা তবে করিয়া যতন,
ঘুছিবে আঁধার মনের বিকার,
আনন্দের স্রোত বহিবে অপার,
হইবে সংসার সুখের আধার,
জীবন সফল পবিত্র ফলে।

কালের তরঙ্গ সদাই চঞ্চল,
কেন না হইবে সুখ সমায়ত,
দুখের রজনী হইবে প্রভাত?
স্বাধীনতা-শশী ভারত - গগনে,
কেন না ভাতিবে উজ্জ্বল কিরণে?
মধুর - মুরলী - কাকলী - লহরী
কবিকুলগান মাতাবে কেশরী;
গরবে চলিবে গরব-রালা।

এই আর্য্যভূমি রত্ন - প্রসবিনী,
নর নারীকুল বিখ্যাত মেদিনী,
বৈদেহী, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, ভবানী,
খনা, লীলাবতী, দময়ন্তী রাণী;
পুরাবৃত্তে ঘোষে কত না গৌরব
বিকীর্ণ চৌদিকে যশের সৌরভ;
কিম্বা সে রোমীয় কার্থেজ রমণী
যাদের গরবে টলিত অবনি,
সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বার বার,
স্বদেশ মহিলা করিল উদ্ধার;
নারীকুল - ধন্যা ললনা - নিকর,
যাহাদের গুণে সমাজ কিঙ্কর;
ধর সেই মত প্রতিজ্ঞা অটল,
অচিরে হইবে ভারত উজ্জ্বল;
বিকাশিবে কীর্ত্তি রাকা শশধর।
ঘুচিবে কলঙ্ক জুড়াবে-অন্তর।
মুদিত - নয়নী ভারত - জননী
মেলিবে যে দিন আঁখি যুগমণি
তখনি ঘুচিবে সকল জ্বালা!

তিক বিদ্যার অপেক্ষা করে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাহা আমাদিগের মধ্যে অতি অল্প লোকই জ্ঞাত আছেন।

অনেকে বলিয়া থাকেন "শরীর পালন করিয়া আর কি হইবে? যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে। অদৃষ্টের লিখন কেহ খণ্ডাইতে পারে না। উত্তম বায়ু সেবনই কর, উত্তম জল পানই কর, আর উত্তম খাদ্যই বা ভক্ষণ কর, রোগ যখন হইবে তখন কিছুতেই তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না। ও সকল কেবল বৃথা আকিঞ্চনমাত্র"। ইহারা রোগাক্রান্ত হইলে, অদৃষ্টই তাহার মূল কারণ বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন।

যাঁহারা জ্ঞানবান, এবং স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম সকল জ্ঞাত আছেন, তাঁহারাও যে অনেক সময়ে সাংসারিক নানা কারণবশতঃ স্বাস্থ্যের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকেন, ইহা অতীব আক্ষেপের বিষয়। কেহ বিষয় কর্ম্মের অনুরোধে অসময় স্নান, অসময়ে আহার, রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি নানাপ্রকার পীড়াকর অত্যাচার করিয়া থাকেন; কেহ বা দুরবস্থাপ্রযুক্ত শরীরের হিতকর নিয়মসকল প্রকৃতরূপে পালন করিতে অক্ষম হন, কেহ বা বিষ তুল্য মাদক দ্রব্যাদি সেবনপূর্ব্বক মত্ত হইয়া, স্বাস্থ্যের প্রতি জলাঞ্জলি দেন, এবং কেহ বা বিজ্ঞানব্রতসাধনে মস্তিষ্কের যৎপরোনাস্তি পীড়ন করিয়া শরীরকে রোগগ্রস্ত করেন।

অনেকে ব্রতাদির উপলক্ষে, শরীরকে যথেষ্ট ক্লেশ দিয়া থাকেন। এরূপ ব্যবহার আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। ইহারা বার, ব্রত, যাগ যজ্ঞাদি উপলক্ষে যে কত শারীরিক কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা বলা বাহুল্য।

কেহ বা ঔদাস্য প্রযুক্ত শরীর পালনে বিরত হন, এবং কেহ বা স্বভাবের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, স্বাস্থ্যরক্ষা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া থাকেন।

যে কোন কারণেই হউক, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে,

স্বাস্থ্য-রক্ষা।

মনুষ্যের শরীর অপেক্ষা বহুমূল্য সম্পত্তি আর কিছুই নাই। ধন, মান, যশঃ, ঐশ্বর্য্য এবং সাংসারিক যে কোন সুখ, সকলই স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এমন সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণেও আমরা সম্যকরূপে যত্নবান নহি। অধিক কাল জীবিত থাকিতে সকলেরই আন্তরিক বাসনা, কিন্তু কি কি নিয়ম পালন করিলে যে শরীর নীরোগ হয়, তাহা আমরা একবার ভ্রমেও ভাবি না।

কেহ অজ্ঞানবশতঃ উহার স্বাস্থ্যরক্ষায় অক্ষম, কেহ বা বিজ্ঞ হইয়াও সাংসারিক নানাবিধ কারণবশে তাহার অহিতাচরণে বাধ্য হন; কেহ বা তাহা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া অবহেলা করেন, এবং কেহ বা স্বভাবের প্রতি সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া আপনারা নিশ্চিন্ত থাকেন।

শরীরের স্বাস্থ্য কি, এবং তাহা কি পরিমাণে আবশ্যক, তাহা বোধ করি সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু তাহা কি নিয়মে রক্ষা হয়, তাহা সাধারণের জ্ঞাত হওয়া দূরে থাকুক, অনেক সুশিক্ষিত সভ্যজাতির মধ্যেও অদ্যাবধি এতাদৃশ বিদ্যালোচনা হয় নাই, যে তাহারা সকলেই নৈসর্গিক নিয়মানুসারে শরীর পালনে সমর্থ হইতে পারেন। অন্য জাতি অপেক্ষা আমাদিগের মধ্যে স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে যে এত শিথিলতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূল কারণ অজ্ঞতা। যদিও পূর্ব্বাপেক্ষা আমাদিগের দেশে বিদ্যার অধিক আলোচনা হইয়াছে বটে, কিন্তু আমাদিগের লোকসংখ্যার সহিত উহার তুলনা করিলে, যেমন অন্ধকারাবৃত রজনীতে একটী খদ্যোতের দীপ্তি অতি যৎসামান্য বলিয়া বোধ হয়, আমাদিগের মধ্যে বিদ্যার দীপ্তিও সেইরূপ হইয়া থাকে। বাহ্য বস্তুর সহিত

কুসংস্কারপূর্ণ সমাজের নিয়মাধীন হইয়া, ও ব্যবহার দোষে দূষিত হইয়া, উহার অহিতাচরণে প্রবৃত্ত হই।

সাবধানতা যে কি বস্তু, তাহা আমাদিগের দেশের লোকেরা তাদৃশ অনুভব করেন না। পূর্ব্বাহ্নে সাবধান হইলে যে অনেক রোগ ও বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় তাহাতে আর সংশয় কি? কোন রোগ বা বিপদ উপস্থিত হইলে, তাহা হইতে মুক্ত হওয়া অপেক্ষা, তাহাকে উপস্থিত না হইতে দেওয়াই বিচক্ষণতার কর্ম্ম, এবং পণ্ডিতেরাও স্বীকার করিয়া থাকেন যে, আরোগ্য অপেক্ষা পরিহার শ্রেয়স্কর।

কেহ কেহ তর্ক করিয়া থাকেন, যে ব্যাধির আশঙ্কায় শরীরের এত দাসত্ব স্বীকার করা নিতান্ত ভীরুতার কর্ম্ম। রোগ উপস্থিত হইলে চিকিৎসকেরা আরোগ্য করিবেন, তাহার নিমিত্ত এত সাবধানতার প্রয়োজন কি? বোধ হয় ইহাদের মতে, অর্থ বা অন্যান্য সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ না করিয়া, উহা হস্তান্তর হইলে, পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত পোলিসের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। অর্থাদি সম্পত্তি সম্বন্ধে শেষোক্ত যুক্তি যেরূপ অসঙ্গত, আমাদের শরীররূপ সম্পত্তির পক্ষেও পূর্ব্বোক্ত যুক্তি সেইরূপ বলিতে হইবে। অতএব স্বাস্থ্য রক্ষা, অর্থাৎ শরীরের সুস্থতা রক্ষা করা, আমাদের সকলেরই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

বামাগণের রচনা।

আশা।

আজিকার চেয়ে কালি আসিবে উত্তম।
এই মত ভাবি মুগ্ধ মানব অধম॥
জানে না যে কল্য কাল ধরি কোন্ বেশ।
করিবে যাহার সেই আশাতরু শেষ॥
কি ভাব ধরিয়া তায় দিবে জ্ঞানদান।
কিরূপে করিবে তার আশার বিধান॥
বিষম আশার আশে মন বেগবান।

বর্ত্তমানে সুখ নাই সদা ক্ষীণ মন।
করিতেছি সুধু বসি আশার গণন॥
গণিছে আঁধারে বসি আকাশের ঢেউ।
ভাবে না ভাবে না সার মনে বুঝে কেউ॥
যদি কালি হবে তব সন্তোষ অপার।
তবে কেন গত ভাবি কর হাহাকার।
আজি হতে কালি ভাল মিছা সেই ভান।
হয়েছে আশার মোহে বিষম অজ্ঞান॥
আশারূপ মরীচিকা দেখায়ে লোভন।
শীতল মূরতি ধরি করে আকর্ষণ॥
সমুখে সুখের বারি মনে অনুমানি।
আপনার দোষে হয় আকুল-পরাণি॥
না মেটে বিষম তৃষা কণ্ঠাগত প্রাণ।
হায়রে আশার বশে জগৎ অজ্ঞান!
পদে পদে পদচারে বিপদ সঞ্চার।
তথাপি আশায় মত্ত অখিল সংসার॥
ভাবিয়া কিসের ভাব হয়েছে মোহিত।
বর্ত্তমানে সুখ নাই জেনেছ নিশ্চিত॥
যখন যে দিন রয় সুখ নাই তায়।
কি কব অজ্ঞান কথা হায় হায় হায়!
ছিল কালি হবে কালি এই অনুমান॥
আজিকার দোষ কিরে মানব অজ্ঞান?
যখন এ আজি নয় ছিল কালি বেস।
যখন না জেনে ছিলে এর সবিশেষ॥
তখন ইহার গুণ করিয়া মনন।
দিয়াছ ত ধন্যবাদ কত অগণন॥
এখন সে দিন কেন মনোমত নয়।

সন্তাপে দহিয়া কেন ছাড়িছ নিশ্বাস।
কেন কেন ছাড়িতেছ মনের বিশ্বাস॥
এই না বলিযা ছিলে সুখী হবে কাল।
তবে কেন ইথে হয় বিষম জঞ্জাল॥
আজিকার কালি ভাল আজি সেই বোধ।
আসিলে সাধের দিন না হয় সে শোধ।
যতই এগুবে পদ তত হবে বোধ।
আশা মাত্র এ জগতে মনের প্রবোধ॥
(ক্রমশঃ।) শ্রীমতী—

ঈশ্বরের প্রতি।

কোথায় জগৎপিতা ডাকি হে কাতরে।
দেখা দাও দয়াময় এ দীন পামরে॥
তোমা বিনা এ জগতে সকলি আঁধার।
দয়ার সাগর প্রভু তুমি সারাৎসার॥
তোমা সম বন্ধু আর কে আছে জগতে।
তোমার মহিমা কত কে পারে কহিতে॥
তুমি বিনা এসংসারে কেবা আছে আর।
তরাতে মানবজাতি ভবসিন্ধু--পার॥
জগতে বিদিত নাম দীন দয়াময়।
দীন হীন জনে তুমি হও হে সদয়॥
ভাবিলে তোমার সৃষ্টি জ্ঞানহারা হই।
বিরলে বসিয়া বিভু তব গুণ গাই॥
শ্রীহরি স্মরণ মন, কর অনুক্ষণ।
মজ না ভবের খেলা করি দরশন॥
হারাইয়া সত্যধন হাবু ডুবু খাই।
মায়ার সাগরে পড়ে কিনারা না পাই॥
আলোক দেখিযা তমঃ সভয়ে পালায়।
হরি নামে মন, পাপে, তেমতি ডরায়॥
বিচিত্র কৌশল তব অনন্ত শকতি।
বারেক ভাবিলে হয় অবসন্না মতি॥
এক মনে ভাব সবে সেই নিরাকার।
ভাবিলে তাঁহাকে যাবে মনের বিকার॥

নূতন সংবাদ।

আমরা শুনিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম যে, আগামী শীতঋতুর প্রারম্ভে ভারতেশ্বরী কুইন ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহামান্যবর প্রিন্স অব ওয়েল্‌স, (আমাদিগের ভাবি রাজা) সস্ত্রীক ভারতবর্ষে শুভাগমন করিবেন।

মান্দ্রাজের এগ্‌মোর নগরে শ্রীমতী পি, সি, রাজভিয়া সেটার বাটীতে মান্যবর শ্রীমতী হবার্ট তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। শ্রীমতী রাজভিয়া জাতিভয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার স্বামীর সহিত গত বৎসর বিলাত গমন করিয়াছিলেন, এবং ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন।

মাইমনসিংহের অন্তঃপাতী কৃষ্টগঞ্জের থানার অধিকাংশ পল্লিগ্রামে ভয়ানক ঝড় হওয়াতে তথাকার গরিব প্রজাদিগের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে, একারণ বশতঃ শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরী দেবী তাঁহার প্রজাগণের তিন মাসের

অযোধ্যায় রসুলপুর নামক গ্রামে সম্প্রতি একটী ভয়ানক সহমরণ হইয়া গিয়াছে। বিলাসী নামা একজন ব্রাহ্মণ স্ত্রী এই দুঃসহ কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। বিলাসী স্নানান্তে উৎকৃষ্ট বেশ ভূষা করিয়া স্বামীর মৃত দেহ ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক চিতার মধ্যে উপবেশন করিলেন। তাঁহার দেবর পুত্র অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া তাহার হস্তে অর্পণ করিলে, তিনি স্বহস্তে চিতায় অগ্নি সংলগ্ন করলেন। চিতা প্রজ্জ্বলিত হইল এবং ক্রমে তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দগ্ধ হইতে লাগিল তথাপি পতিপ্রাণা বিলাসী মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও কোন কষ্টের চিহ্ন প্রকাশ করেন নাই। তিন ঘণ্টা দাহর পর চিতা নির্ব্বাণ হয় এবং নির্ব্বাণ হইলে দেখা গেল পতিপ্রাণা রমণীর শরীর তাঁহার স্বামীর মৃতদেহের সহিত ভস্মীভূত হইয়াছে। পোলিস এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বিলাসবতীর আত্মীয় স্বজন প্রায় ৩০ জনকে আবদ্ধ করে এবং তাহার এক্ষণে বিচারাধীন

শাসনপ্রণালী।

মনুষ্যজাতি অতি প্রাচীনকাল হইতেই সমাজবদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করে। বোধ হয় তাহাদিগের সৃষ্টি অবধিই তাহারা এই প্রকারে, অর্থাৎ, একত্রে ও স্বজাতিদলভুক্ত হইয়া দিনপাত করিতেছে। ব্যাঘ্রসিংহাদি অনেক ইতর প্রাণী যেমন স্বতন্ত্র ও পৃথক পৃথক থাকিয়া কালক্ষেপ করিতে পারে, মনুষ্যজাতি এরূপ কদাচ থাকিতে পারে না। পরমেশ্বর ইহাদিগকে এইরূপ সৃজন করিয়াছেন যে, ইহারা সর্ব্বদাই সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে বাসনা করে; পরস্পর পৃথক পৃথক থাকিতে হইলে ইহাদিগের কষ্টের সীমা থাকে না। কিন্তু প্রত্যেক সমাজে যাবতীয় লোক আছে, তাহারা যদি সকলেই স্ব স্ব প্রধান হয়, সকলেই যদি আপনাদিগের ইচ্ছামত কার্য্য করিতে থাকে, তাহা হইলে সকলেরই নানাপ্রকার ক্লেশ ও অসুবিধা সহ্য করিতে হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহা হইলে অপরের মঙ্গল উপেক্ষা করিয়া স্বকীয় লাভেরপ্রতি যত্নবান ও সচেষ্ট হইত, এবং পরিণামে ক্ষমতাশালী লোকেরাই উন্নত, ও দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ তৎকর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইত। এই নিমিত্ত প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বিহিত শাসনার্থ ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে। কোন কোন সমাজে একটীমাত্র লোক সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া, অথবা অপর দ্বারা প্রধান মনোনীত হইয়া, অন্য সকলকে শাসন করিতে থাকে; এই প্রকার সর্ব্বপ্রধান লোক, রাজা বলিয়া বিখ্যাত এবং অন্যান্য অপর সাধারণ ব্যক্তিগণ, প্রজা বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। অপর কতিপয় দেশের লোকেরা, আপনাদিগের মধ্য হইতে কয়েক সংখ্যক ব্যক্তি মনোনীত করিয়া তাহাদিগের উপর শাসন কার্য্যের সমস্ত ভার অর্পণ করে, এবং সকলেই তাহাদিগের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগের আজ্ঞা পালন করিতে থাকে। ইহা সাধারণতন্ত্র বলিয়া বিখ্যাত।

উভয়বিধ প্রণালীতে ইহা দৃষ্ট হয় যে, প্রত্যেক সমাজে একজন বা অল্পসংখ্যক কতিপয় ব্যক্তি সেই সমাজস্থ সমুদয় লোকদিগকে শাসন করে, এবং ইহারাও সেই একজন বা অল্পসংখ্যক কতিপয় ব্যক্তির আজ্ঞাপালন করিয়া থাকে। যদি সেই আজ্ঞা পালন না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে দণ্ডনীয় হইতে হয়। এস্থলে পাঠকগণ ইহা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, প্রজারা কি নিমিত্ত সেই একজন, অর্থাৎ রাজা, অথবা আপনাদিগের মনোনীত কতিপয় ব্যক্তির আজ্ঞার বশবর্ত্তী হয়? আমি যে সমাজে বাস করি, সেই সমাজের রাজা আমাকে এই আজ্ঞা করিয়াছেন যে, কদাপি পরদ্রব্য অপহরণ করিও না, যদি কর, তাহা হইলে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। আমি কেনই বা তাঁহার এই আজ্ঞা প্রতিপালন করিব এবং যদি না করি, তাহা হইলে তাঁহার কি অধিকার যে তিনি আমাকে দণ্ড-প্রদান করেন? ইহার উত্তর এই যে, আমি যে সমাজের অন্তর্গত, সেই সমাজের কার্য্য সমুদয় সুচারুরূপে ও নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিতে সকলেরই যত্নবান হওয়া উচিত; নচেৎ সকলেরই ক্লেশ ও দুঃখ সহ্য করিতে হইবে। আমি যদি আর একজনকে আমা অপেক্ষা দুর্ব্বল দেখিয়া রাজাজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করতঃ তাহার দ্রব্য বলপূর্ব্বক অপহরণ করি, এবং তন্নিমিত্ত দণ্ডনীয় না হই, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা বলবান ব্যক্তি আমার উপর কি জন্য অত্যাচার না করিবে, এবং করিলেও সে কি জন্য দণ্ডনীয় হইবে? সেও ইহা বলিতে পারে যে, সে রাজার আজ্ঞাবহ নহে, এবং তাহাকে দণ্ড দিবার রাজার কোন অধিকার নাই। এ প্রকার হইলে সকল সমাজই অতি অল্প দিনে ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইত। এই নিমিত্তই সকল সম্প্রদায়ের লোকেরাই রাজাজ্ঞা পালন করে এবং না করিলে দণ্ডনীয় হয়; এবং রাজাও স্বকীয় আজ্ঞা পালনের পুরস্কার স্বরূপ তাহাদিগকে সকল প্রকার অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন। একপক্ষে,—প্রজাগণ কর্ত্তৃক রাজাজ্ঞা পালন, ও তাহা উপেক্ষা করিলে রাজদ্বারে দণ্ড গ্রহণ; অপরপক্ষে,—রাজা কর্ত্তৃক প্রজাদিগের জীবন ও সম্পত্তি সুচারু-

রূপে রক্ষা করিয়া অত্যাচারিগণের প্রতি দণ্ডপ্রদান। আমি যদি রাজাজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া দণ্ডনীয় হইলেও দণ্ড গ্রহণ না করি, তাহা হইলে সেই সমাজে বাস করিলে যে সমস্ত উপকার লাভ করা যায়, তাহাতে আমার কোন অংশ থাকিতে পারে না।

ইহাই যদি সকলের নিশ্চিত জ্ঞান থাকে যে, মনুষ্যগণ কখনই পৃথক পৃথক থাকিয়া প্রকৃত সংসারসুখ ভোগ করিতে পারে না,—যে তাহাদিগকে অবশ্যই মনুষ্য-স্বভাববশতঃ সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে, তাহা হইলে সেই সমাজের কার্য্যসমুদয় সকলেরই সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। আমি কোন নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে যখন দণ্ডনীয় হই, তখন দণ্ড গ্রহণ না করিয়া এই বলিতে পারি যে,—"তোমার আমাকে দণ্ড দিবার কোন অধিকার নাই; তুমিও মনুষ্য, আমিও মনুষ্য; জন্মকালীন পরমেশ্বর আমাকে বলেন নাই যে, আমাকে এই সমাজের নিয়মসমুদয় পালন করিতে হইবে; আমি স্বাধীন জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমার যাহা ইচ্ছা আমি তাহাই করিব; অপরের সহিত আমার কোন সংস্রব নাই; আমার কোন কার্য্যদ্বারা অন্য কাহারও যদি ক্ষতি হয়, আমি তাহার জন্য দায়ী নহি, এবং দায়ী হইলেও তোমার এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা অন্যায়।" এমন স্থলে রাজকীয় দণ্ডপ্রদানকারী ব্যক্তি ইহা উত্তর করিতে পারেন যে,—"আমার তোমাকে দণ্ড দিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে; তুমি যে সমাজে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, সেই সমাজে বিশৃঙ্খল নিবারণ জন্য আমাকে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা মনোনীত করিয়া তোমাদিগকে শাসন করিতে রাখিয়াছে; উত্তমরূপে শাসন না করিলে, সমাজ অধঃপাতে যাইবে; সমাজ অধঃপাতে যাইলে সকলেরই কষ্টের সীমা থাকিবে না,—এমন কি, অনেকেরই প্রাণসংশয় হইবে; সুতরাং সমাজ যাহাতে রক্ষা হয় তাহাই আমাদিগের উদ্দেশ্য; দুষ্টের দমন না করিলে এ উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে অন্যান্য লোকদিগকে মন্দ কর্ম্ম করিতে উৎসাহদান করা হইবে;—কেবল ইহা নহে, তুমি যদি কুকর্ম্মের দণ্ডগ্রহণ না কর, তাহা হইলে

তোমার উপর যখন লোকে উৎপীড়ন করিবে, তখন তুমি আমাদিগের নিকট রক্ষা প্রার্থনা করিতে পারিবে না।”

এক্ষণে বোধ হয় দণ্ড প্রদানের বৈধতা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। অধিক কি, সকল দেশেই শাসনপ্রণালী উত্তমরূপে রক্ষা করিতে হইলে, প্রথমে একটী সুচারু দণ্ডপ্রণালী স্থাপন করা সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক এবং যাহাতে সকল লোকেই সেই দণ্ডপ্রণালীর অধীন হইয়া কার্য্য করে, রাজকীয়বর্গের এইরূপ চেষ্টা প্রাণপণে করা উচিত; নতুবা সমস্ত শাসনপ্রণালীটী যে নিষ্ফল হইবে, ইহা বলা বাহুল্য।

বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ-সংস্কার।

অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বাঙ্গালীদিগকে অধিক দুর্ব্বল দেখা যায়। ইহার প্রকৃত কারণ কি? অনেকেই কহিয়া থাকেন যে, জলবায়ু ও দেশের দোষে আমরা এরূপ হীনবীর্য্য হইতেছি। আমাদিগের দেশের জলবায়ুর দোষে আমরা হীনবীর্য্য হইতেছি, ইহা বলিলে বোধ হয় কোন ব্যক্তি আপত্তি করিবেন না। কিন্তু আমাদিগের দৌর্ব্বল্যের জলবায়ুই যে কেবল একমাত্র কারণ, তাহা কোন প্রকারে প্রতীতি হয় না। পৃথিবীর অনেক স্থলে আমাদিগের দেশের ন্যায় জলবায়ু দেখা যায়। তথাপি তত্রত্য লোকেরা আমাদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে বলিষ্ঠ। গ্রীষ্মাতিশয্য বা আর্দ্র ভূমি আমাদিগের পক্ষে যেরূপ হানিজনক তাহাদিগের পক্ষেও সেইরূপ। কিন্তু শেষোক্ত লোকেরা ইহার প্রতিবিধানে সর্ব্বদা যত্নবান থাকে। আমাদিগের ন্যায় তাহারা শারীরিক শ্রম হইতে বিমুখ নহে। আলস্যে অনিষ্ট হয় দেখিয়া তাহারা শরীরের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিয়া থাকে। কিন্তু আমরা তাহা করি না, সুতরাং আমাদিগের বলবীর্য্য ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে।

আমাদিগের গৃহস্থেরা মানসিক পরিশ্রমের উপর অধিক নির্ভর করিয়া শরীরকে হেয়জ্ঞান করিয়া থাকেন। মন অপেক্ষা শরীর অনেক

নিকৃষ্ট তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সুস্থ শরীর না হইলে মনের উন্নতি সাধন কদাচ হইতে পারে না। সুতরাং যাহাতে শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ করা যাইতে পারে তাহা নিতান্ত আবশ্যক। পুরাকালে ভারতবর্ষবাসীরা শরীর ও মন উভয়ের সমান চালনা করিতেন। তাঁহারা আমাদিগের ন্যায় কেবল মানসিক শ্রমে নিযুক্ত থাকিতেন না। তাঁহারা বরং অধিক পরিমাণে শারীরিক পরিশ্রম করিতেন। রাজকীয় কার্য্য পর্য্যালোচনান্তে রাজগণ অমাত্যবর্গের সহিত মৃগয়াদি ব্যাপারে নিযুক্ত হইতেন, এবং প্রজাবর্গেও স্ব স্ব কার্য্য সমাধা করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার্থ অঙ্গ চালনা করিত। অধিক কি, ঋষিগণও ঈশ্বরোপাসনা করিয়া বৃক্ষরোপণ, জলসিঞ্চন প্রভৃতি, নানাবিধ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতেন। এই নিমিত্ত পুরাকালীন লোকের আমাদিগের অপেক্ষা অধিক শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ লাভ করিতেন; কিন্তু আমরা কেবলমাত্র মনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উভয়েরই অনিষ্টসাধনে যত্নবান হইতেছি। অহোরাত্র মানসিক শ্রম জন্য অস্মদ্দেশীয় যুবকেরা স্বল্পায়ুঃ ও হীনবীর্য্য হইতেছে, এবং যে মনের নিমিত্ত তাহারা শরীরকে অবহেলা করিতেছে, তাহারও প্রকৃত উন্নতি সাধন হয় না।

আধুনিক ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতিরা বাঙ্গালীদিগের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে শারীরিক পরিশ্রম করিতে সক্ষম। ইংরাজ সৈন্যদিগের মধ্যে রাজপুত প্রভৃতি অন্য জাতির লোক দেখা যায়। কিন্তু বাঙ্গালীদিগকে সাহসের কোন কর্ম্মেতেই নিযুক্ত হইতে দেখা যায় না। মুখের আড়ম্বরে বাঙ্গালীদিগকে কেহ পারিবে না, কিন্তু কার্য্যের সময় ইহাদিগকে দেখা যায় না। অনেকে একত্র হইয়া এক জনকে উৎপীড়ন করিতে পারেন, কিন্তু একাকী কাহারও সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারেন না। শৈশবাবস্থা হইতে যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হন, তাহাই এই সকলের প্রকৃত কারণ। শিশু মাতৃক্রোড় ত্যাগ করিয়া যদি কোন ক্রীড়াতে আসক্ত হইল, তবে মাতা চঞ্চল হইয়া শিশুকে পুনর্ব্বার ক্রোড়ে লইলেন। শিশু স্বভাবতঃই শরীর চালনা করিতে উদ্যত হইতেছে, ইহা জননী বুঝিয়াও বুঝেন না। শৈশবা-

বস্থাতে শরীরের অনেকাংশ অসম্পূর্ণ অবস্থাতে থাকে। তখন অস্থিগুলি অতি কোমল থাকে। শিশুর বয়সের সহিত সমস্ত শরীর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। সুতরাং জীবনের প্রথমাবস্থাতে শরীরের যেরূপ চালনা করা যায়, বয়ঃপ্রাপ্তিকালে শরীর সেইরূপ উন্নতি লাভ করিবে। ঈশ্বরের কৃপায় জীবনের অন্য সকল অবস্থা অপেক্ষা শৈশবাবস্থাতে মনুষ্যদিগকে অধিক পরিমাণে চঞ্চল দেখা যায়, সুতরাং স্বভাবসিদ্ধ সেই চাঞ্চল্যের ব্যাঘাত করিলে, পশ্চাতে অনেক অনিষ্টোৎপত্তির সম্ভাবনা। কিন্তু আমাদিগের দেশের লোকেরা এ বিষয়ে সম্যক মনোনিবেশ করেন না। সকলেই জানেন যে, শিশু আদরের সামগ্রী, তাহার কোমল এবং অপরিণত অঙ্গ সকল কখনই কঠিন পরিশ্রম করিতে সমর্থ হইবে না; কিন্তু তাহা বলিয়া যাহাতে তাহার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইতে পারে, এরূপ কোন আদর দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। শিশু দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, কি লম্ফ প্রদান করিতেছে দেখিয়া তাহাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করা, কোন প্রকারে বিধেয় নহে। শিশু অকারণ কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাড়িতে চাহে না। ঈশ্বরেচ্ছায় মানবগণ শৈশবাবস্থাতে অধিক শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। সুতরাং যাহাতে সেই শিক্ষার সম্যক সাহায্য হইতে পারে, তাহা আমাদিগের সকলের করা কর্ত্তব্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা ইচ্ছানুরূপে সে সাহায্য প্রাপ্ত হই না। স্নেহময়ী জননীর স্নেহ আমাদিগের এক প্রকার অনিষ্টোৎপাদন করিয়া থাকে। তাঁহার ক্রোড়ে ক্রোড়েই আমাদিগের শৈশবাবস্থা অতিবাহিত হয়। এইরূপে জীবনের প্রত্যুষেই আমাদিগের পশ্চাদ্দৌর্ব্বল্যের বীজ বপন হইয়া থাকে।

ক্রমে শিশু বালকপদে উপস্থিত হইল। পঞ্চম কি ষষ্ঠ বর্ষ অতিক্রম না করিতে করিতে, পিতা মাতা বালককে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলেন। বালককে বিদ্যালয়ে এক স্থানে উপবেশন করিয়া চারি পাঁচ ঘন্টা অতিবাহন করিতে হইবে। ইহাতে বালককে যে কি দারুণ যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়, তাহা কেবল সেই বালকই

জানিতে পারে। বিদ্যালয়ের ছুটীর পরে বালক স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া নির্জীব পদার্থের ন্যায় হইল, কিন্তু স্বাভাবিক চাঞ্চল্যের বশবর্ত্তী হইয়া বালক পুনর্ব্বার ক্রীড়াতে মত্ত হইতেছে দেখিয়া, পিতা তাহাকে শিক্ষকের নিকট পাঠ অভ্যাস করিতে আজ্ঞা দিলেন। বালক পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পূর্ব্বক্লেশ অপনোদনের সময় পাইল না। প্রত্যহ এইরূপে নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া বালকের স্বভাবজ চাঞ্চল্যের হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল। ক্রমে বালক যুবত্বে পরিণত হইল। কিন্তু পূর্ব্বাভ্যাসজনিত আলস্যের নিমিত্ত যুবক শারীরিক শ্রমে প্রীতি লাভ করিতে পারিল না, বরং তাহাতে তাহার কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু তাহার মানসিক শ্রম ক্রমশঃ গুরুতর হইতেছে। শারীরিক শ্রম বিনা যুবক হীনবীর্য্য হইয়া মানসিক শ্রমে সম্যক যত্ন প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইল। এইরূপে জীবনের প্রথম উত্তমাংশ আলস্যে অতিবাহিত হইয়া পশ্চাদর্দ্ধাংশ নিতান্ত ক্লেশজনক হইয়া পড়ে। যুবক অচিরে বৃদ্ধ হইয়া সকল কার্য্যেতে বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। আবার শারীরিক শ্রমাভাবে শরীর রোগগ্রস্ত হইতে আরম্ভ হয়। এবং তৎকারণজনিত দুঃসহ যাতনাভোগ করিয়া অস্মদ্দেশীয় যুবকগণ অকালে-কালগ্রাসে পতিত হইতেছে!

পূর্ব্বোক্ত পাঠে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, যে আমরা আমাদিগের প্রবন্ধ অত্যুক্তিদোষে দূষিত করিতেছি। কিন্তু নিরপেক্ষ সকলেই স্বীকার করিবেন যে, উপরে আমরা যাহা বলিয়াছি তাহা সকলই সত্য। ইউরোপীয়দিগের সহিত আমাদিগের তুলনা করিলে উভয়ের প্রভেদ স্পষ্টরূপে জানা যাইতে পারে। ইউরোপবাসীরা যেরূপ বলিষ্ঠ তাহা তাহাদিগের আকৃতিতে বিলক্ষণ সাক্ষ্য-দান করিতেছে। দীর্ঘকায় যমদূতের ন্যায় একজন ইউরোপীয় আমাদিগের দশজনের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে। উভয়ের আকারে কত দূর বৈষম্য দৃষ্ট হয়। এবং শারীরিক বলানুসারে আমাদিগের সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। বিপদ আসিতে না আসিতে আমরা পলায়ন করি। আমরা যে এরূপ ভীরু হইব তাহাতে আর বিচিত্রতা

কি? জন্মাবধি বলপ্রদ ব্যায়াম হইতে বিরত থাকিয়া আমাদিগের শরীরে কিছুমাত্র বল থাকে না। সুতরাং আপনাদিগের হীনবীর্য্যতা দেখিয়া কি প্রকারে সাহস প্রকাশ করি? আমারা বুঝিতে পারি যে এরূপ অবস্থাতে সাহস প্রকাশ করিলে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ নানাপ্রকার ভাবিয়া আমরা বিপদ হইতে পলায়ন করাকে শ্রেয়স্কর জ্ঞান করি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদিগের স্নেহময়ী জননীর স্নেহ কর্ত্তৃক আমাদিগের শৈশবাবস্থাতে পশ্চাদ্দৌর্ব্বল্যের বীজ কিছু পরিমাণে রোপিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগের দেশের বিদ্যালয় সমূহের কুপ্রণালীগুলি আমাদিগের শরীর সম্বন্ধে যাদৃশ অনিষ্টসাধন করিতেছে, তাদৃশ অনিষ্ট আর কিছু হইতে সম্ভবে না। ইউরোপীয় এবং আমাদিগের বিদ্যালয়ের মহদন্তর দৃষ্ট হয়। ইউরোপের বিদ্যালয়ে শরীর ও মন উভয়েরই চালনা হইয়া থাকে। তথায় পাঠান্তে ছাত্রেরা নানাবিধ ব্যায়ামক্রিয়াতে আসক্ত থাকে। নৌকাবাহন, অশ্বারোহণ প্রভৃতি বলপ্রদ কার্য্যে নিযুক্ত থাকাতে তথাকার যুবকদিগকে সাতিশয় বলিষ্ঠ দেখা যায়। এবং এই প্রকারে শরীরের স্বাস্থ্য হওয়াতে তাহারা চমৎকার মানসিক উৎকর্ষ লাভ করিতেছে। কিন্তু আমাদিগের বিদ্যালয়ে ও সকল কিছুই নাই। অস্মদ্দেশীয় যুবকগণ কেবল পাঠাদি মানসিক শ্রমে নিযুক্ত থাকে। অতএব শরীরের সম্পূর্ণ অবহেলা হয়। ইহাতে আমাদিগের সম্পূর্ণ দোষ। কারণ আমাদিগের স্বকীয় যত্ন ব্যতিরেকে আমাদিগের দেশের বিদ্যালয়গুলি ইউরোপের তুল্য হইতে পারিবে না।

ইউরোপে কি ধনী কি দরিদ্র কি বিদ্বান্ কি মূর্খ কি ভদ্র কি ইতর সকলেই সমভাবে শরীর চালনা করিয়া থাকে। ধনীদিগের অর্থসত্ত্বে শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয় না, তথাপি তাঁহারা অশ্বারোহণ, বায়ুসেবন প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি যথানিয়মে সম্পাদন করিয়া থাকেন। কিন্তু অস্মদ্দেশীয় ধনী ব্যক্তিরা শয়ন করিয়া দিবস যাপন করেন বলিলে, বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তাহাদিগের পদসঞ্চালন করিবার ক্ষমতা নাই। কিঞ্চিদ্দূর গমন করিলেই তাঁহারা ক্লান্ত হইয়া পড়েন, এবং কোন শারীরিক শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিতে হইলে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের শরীর সর্ব্বদা রোগাক্রান্ত, এবং তাঁহাদের সমুদয় যত্নই রোগোপশমের নিমিত্ত কল্পিত হইয়া থাকে। ইউরোপের ধনী ব্যক্তিরা আমাদিগের দেশের কৃষক প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগের অপেক্ষা কঠিনতর শারীরিক পরিশ্রম করিতে সমর্থ। ক্রমান্বয় বিশ ক্রোশ অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিয়া ও তাঁহারা শ্রান্তি জ্ঞান করেন না। বাস্তবিক আমাদিগের দেশীয় ধনীলোকদিগের পক্ষে শরীর চালনা নিতান্ত আবশ্যক। তাঁহাদিগকে জীবিকার নিমিত্ত কিছুই ভাবিতে হয় না। সুতরাং কার্য্য উপলক্ষে তাঁহাদিগকে কোন শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয় না। তাঁহাদিগের সকল কার্য্যই অন্য লোক দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহারা যদি স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম ক্রিয়াতে আসক্তি প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের শরীর সুস্থ থাকিবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই। অধিক কি, তাঁহাদিগের পরিপাক ক্রিয়া যে কি প্রকারে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে, তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি না। আহার করিয়া সমস্ত দিবস অলসভাবে যাপন করিলে, তাহা কি প্রকারে পরিপাক হইতে পারে? এই হেতু আমাদিগের দেশের বিলাসীরা প্রায় সকল রোগই অধিকার করিয়া লইয়াছেন। এই হেতুই তাঁহারা স্বল্পায়ুঃ হইয়া পিতৃবংশ রক্ষায় সম্পূর্ণ অক্ষম হইতেছেন।

এ দেশীয় ইতর ও পল্লীগ্রামস্থ লোকেরা, নগরবাসী অথবা ধনীদিগের অপেক্ষা অধিক শারীরিক পরিশ্রম করিতে সমর্থ দেখা যায়। ইহার কারণ এই যে, তাহারা শৈশবকাল হইতেই নানা প্রকার শারীরিক বলপ্রদ ক্রিয়াতে আসক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু অন্য জাতির সহিত তুলনা করিলে তাহাদিগকেও লঘুশ্রমী বলা যাইতে পারে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, আমাদিগের দেশের কৃষকগণ গুরুতর পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে তাহা বাস্তবিক বলিয়া বোধ হয় না। আমাদিগের

দেশ স্বভাবতঃই সাতিশয় উর্ব্বরা। সুতরাং এখানে নানাবিধ অপর্য্যাপ্ত শস্যোৎপাদন নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার নহে—কৃষকগণ সামান্য পরিশ্রমেই যথেষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে কৃষিকার্য্য বড় সহজ ব্যাপার নহে, তথায় আমাদিগের ন্যায় অল্প কর্ষণে অধিক শস্য উৎপন্ন হয় না। অনেক কষ্টে অল্প শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদের দেশীয় কৃষকদিগের অপেক্ষা ইংলণ্ডীয় কৃষকদিগকে শারীরিক শ্রম অধিক পরিমাণে করিতে হয় এবং এই নিমিত্তই শেষোক্ত লোকেরা পূর্ব্বোক্তদিগের অপেক্ষা অধিকতর বলিষ্ঠ হইয়া থাকে।

ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, শরীরের প্রতি আর আমাদের ঔদাস্য প্রকাশ করা উচিত নহে। যখন দেখা যাইতেছে যে, শত শত যুবক বিংশতি বৎসর অতিক্রম না করিতে করিতে জীবন ক্লেশময় বলিয়া পরিতাপ করিতেছে, যখন দেখা যাইতেছে যে, সাতিশয় মানসিক শ্রমে ক্লান্ত হইয়া এই সকল যুবক শারীরিক কোন প্রকার স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতে পারিতেছে না, যখন দেখা যাইতেছে যে, ইহাদিগের পক্ষে জীবন বৃথা স্বপ্ন স্বরূপ হইতেছে, তখন যে কোন প্রকারে হউক, এই সকল অনিষ্টের প্রতিবিধানে আমাদের যত্নবান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যাঁহারা আমাদের সমাজের প্রধান অঙ্গ স্বরূপ, তাঁহারা যদি এরূপ হীনবীর্য্য ও সংসারে বীতস্পৃহ হইতে থাকেন, তাহা হইলে আর কাহার নিকট সমাজের উন্নতিসাধন আশা করা যাইবে? এরূপ অবস্থা থাকিলে পরিণামে সমাজের যে কি দুর্গতি হইবে তাহা কে বলিতে পারে। অতএব এই সময় হইতেই আমাদিগের শিক্ষাপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিয়া শরীরের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য হইতেছে।

ভারতকমলা।

গহন কানন অতি ভয়ঙ্কর,
আগত রজনী অস্ত দিনকর,
ডাকিছে সঘনে ঘন পয়োধর,
করিয়ে আঁধার চৌদিক্ বেড়িয়ে।
বরিষার ধারা সঘনে ঝরিছে,
ভৈরব নিনাদে কুলিশ নাদিছে,
বেড়ি নভস্তল বিজলি জ্বলিছে,
জ্বলিছে গগন ভুবন জুড়িয়ে॥
বহিছে পবন ভীষণ স্বননে;—
এই কি প্রলয় কথিত পুরাণে?
যায় রসাতল হয় যেন মনে
স্বর্গ মর্ত্ত আর স্থাবরগণ।
এ হেন সময়ে কেবা এ রমণী—
এ হেন কাননে পশি একাকিনী,
করে আর্ত্তনাদ বুক ফাটে শুনি,
ব্যথিত হৃদয়ে করে রোদন॥
বল সীমন্তিনি কিসেরি যাতনা,
কেন বা অধীরা,—কে দিল বেদনা
কেবা সে পামর, পাইয়ে ললনা,
হানিল হৃদয়ে দারুণ শর?
এই ঘোর নিশি, অন্ধকারময়,
ঘন আবরিত;—এ মানবী নয়;
তাই যদি হ'তো তা হ'লে নিশ্চয়
কাঁপিত,—লাগিত অন্তরে ডর॥

উঃ! কি গম্ভীর বজ্রনাদ শুনি,—
ঐ শুন পুন! ঘোর ভীমধ্বনি,
কাঁপিছে ভূতল, জ্বলে সৌদামিনী,
এ জগৎ বুঝি না রহে আর।
সুরেশ অসুরে মাতিয়াছে রণ,—
কিম্বা দেবদেব জলধিমন্থন
করেন ত্যজিয়ে কৈলাস ভবন,—
বুঝি এ বিশ্ব হয় ছার খার॥
আবার ঐ শুন,—ভৈরব গর্জ্জন,
সিংহ শার্দ্দূলাদি হিংস্র জন্তুগণ
হুহুঙ্কার নাদ ছাড়ি অনুক্ষণ,
মেতেছে আমোদে,—কাঁপে হৃদয়।
এ হেন সময়ে, এ হেন কাননে,
আচম্বিতে এক পুরুষ রতনে,
শরৎ-সুধাংশু-নিন্দিত বরণে
অরণ্য-মাঝারে হ'লো উদয়॥
প্রশস্ত ললাট, করে ধনুর্ব্বাণ,—
বীরবর ইনি হয় অনুমান,
রূপে রতিপতি পায় অপমান,
এমন কখন দেখা না যায়।
শুনি অবলার আর্ত্তনাদ ধ্বনি
সে পুরুষবর চমকে অমনি;
"বনমধ্যে কেবা নারী একাকিনী"—
ভাবিয়া সেদিকে ত্বরিতে ধায়॥

"এই ভীমনিশা, মুষলের ধার
বরিষার জল ঝরে অনিবার,
সিংহ ব্যাঘ্র যত ছাড়ে হুহুঙ্কার,—
কেমনে মানবী এ বনে এল।"
"কোন্ দুরাচার নাহি ধর্ম্ম ভয়—
কি ভীষণ রব ! পাপাত্মা নির্দ্দয়,
হেরি অনাথিনী হইয়ে নির্ভয়
তার সর্ব্বনাশে সচেষ্ট হ'লো ॥"
"কিন্তু যদি এই না হয় মানুষী,—
যদি এই কোন মায়াবী রাক্ষসী—
পাতিয়াছে জাল, ঘোরপাপীয়সী,
সহসা গমন উচিত নয়।"
থামিলেন যুবা ; মুহূর্ত্তেক পরে,
মুখ রক্তবর্ণ হ'লো লজ্জা ভরে
"হইয়া পুরুষ থামিয়াছি ডরে !
এ জীবন ত্যাগ উচিত হয়।"
"অবলা কাতরে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে
বনে অনাথিনী, কে সহিতে পারে ?
কোন্ জন হেন পাষাণ অন্তরে
দেখিয়ে শুনিয়ে দাঁড়িয়ে রয় ?"
"রক্ষা কর আসি হলো সর্ব্বনাশ"
উঠে আর্ত্তধ্বনি ভেদিয়ে আকাশ ;
শুনি বীরবর পাইয়ে তরাস,
হ'য়ে ক্ষিপ্তপ্রায় সে দিকে ধায়।
"তিষ্ঠ মুহূর্ত্তেক, নাহি কোন ভয়,"
বীর চূড়ামণি উচ্চৈঃস্বরে কয়,
ত্বরিত গমনে উপস্থিত হয়
যথায় রমণী কাতরা অতি।

হেরিলেন তিনি রমণীরতন,
জিনি রতি রম্ভা রূপ অতুলন,
সুতপ্ত কাঞ্চন জিনিয়ে বরণ,
মরি কি তাহারি লাবণ্য-জ্যোতি !
কিন্তু কি মলিন হায় ছিন্ন বেশ,
করেতে বন্ধন, আলুলিত কেশ,
বহে অশ্রুধারা,—বিধাতা কি দ্বেষ
করিছে লাবণ্য সহিতে নারি ?
দূরে পদধ্বনি, যেন কোন জন
পলায় ত্যজিয়ে অবলা সদন ;
সেই কুলাঙ্গার যেন এতক্ষণ
ব্যথা দিতেছিল মনে ইহারি।
হেরি সে কামিনী, সেই গুণমণি
অরণ্য মাঝারে যেন সৌদামিনী,
সম্বোধিয়া কন, কি মধুর বাণী—
"কে তুমি ললনে, কিসেরি ডর ?
"কে করে তাড়না, কে দিল বেদনা,
কেন বা তোমারি বন্ধন যাতনা ?"
"যাও শীঘ্র করি," বলিল ললনা
"কিম্বা এ বন্ধন মোচন কর ;
"যাও ঐ পথে,—দুরাত্মা দানবে
হরে লয়ে যায় প্রাণ পুত্র সবে ;—
এস পুত্রগণ," ডাকে আর্ত্তরবে
"শীতল কররে মায়ের প্রাণ।"
বীরবর শুনি আরক্ত লোচন,
ক্রোধানলে যেন জ্বলে হুতাশন,
সঘনে টংকারি ধনু বিচক্ষণ
ত্বরিতে তখনি সে দিকে ধান।

হেরিলেন বীর ক্ষণ কাল পরে,
ভীম বেশধারী, ভীষণ আকারে,
দৈত্য দুই জনে নরমুণ্ড করে,
চলিছে লইয়া তনয় তার।
"অরে রে পামর, নাহি শঙ্কা ডর,"
রোষভরে বীর কাঁপে থর থর
"ত্যজ বন্দিগণ, নহে যমঘর
পাঠাব এখনি, নাহি নিস্তার।"
নেউটিল তারা ;—করে পরিহাস,
"কে তুমি ? তুমিও জীবনের আশ
ছেড়েছ, নতুবা আমাদের পাশ
কেন বা আসিবে রণের তরে।"
"রাম ম্লেচ্ছভূমে" বলে একজন,
"পিতা নাম মোর দিলেন যবন,
সেই নাম শুনি কাঁপে ত্রিভুবন
ইন্দ্র চন্দ্র আদি পলায় ডরে।"
"এই মোর সখা মম অনুচর,
কলুষ নামেতে খ্যাত চরাচর,—
সদা সঙ্গে মোর"—"অরে দুরাচার
কেবা পরিচয় চাহিছে তোর ?"
"এই বন্দিগণ শীঘ্র মুক্ত কর,
নতুবা প্রমাদ ঘটিবে সত্বর ;"
আকর্ণ টানিল ধনু বীরবর
বাধিল অমনি সংগ্রাম ঘোর।
বাধিল সংগ্রাম অতি ভয়ঙ্কর,
নিবাত কবচে যথা পার্থবর,
বৃত্রের সহিত অথবা অমর,
ধরাতে এমন কভু না হেরি।

শেষে দৈত্যগণ করে পলায়ন,
বীরশরাঘাত হ'লো না সহন,
ত্যজি রণস্থলে সেই বন্দিগণ,
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় পাছু না ফিরি ॥
বন্দিগণে লয়ে মনেরি উল্লাসে
ত্যজি জয়ধ্বনি সে নারীর পাশে,
আসি বীরবর কহেন আশ্বাসে—
"এনেছি তনয় ধৈরয ধর।"
"সম্বর জননি, নয়নের বারি,
এই আনিয়াছি তনয় তোমারি,
দৈত্য মম শর সহিতে না পারি
সংগ্রামে বিমুখ পাইয়ে ডর।"
"হও দীর্ঘজীবী" কহে সে মানবী
"অরে বৎসগণ পুন যে আসিবি,
না জানি স্বপনে পুন দেখা দিবি,
কোলেতে আমারি মা বলে আয়।"
"হস্তেরি বন্ধন ঘুচাও এখনি."
এই বলি সেই অধীরা রমণী—
বীরের সদনে যেন উন্মাদিনী—
বন্ধন মোচন কারণ যায়।
সে পুরুষবর হইয়ে সত্বর
মুক্ত করিলেন সে কমল কর,
রমণী তনয়ে লয়ে অঙ্কোপর
স্নেহ আলিঙ্গন সঘনে করে ;
ঘন আলিঙ্গন, বদন চুম্বন ;
"নরবর, তুমি বাঁচালে জীবন,
আনি দিলে মোর অঞ্চলের ধন,
আর কিবা আমি কব তোমারে।"

পরিগণিত হইত,

সে পুরুষবর ক্ষণ কাল পরে
কহেন তাহারে, মধুর আদরে,
"জননি গো এবে জিজ্ঞাসি তোমারে
কে তুমি কাহারি রমণী হও ?"
"কেন বা আঁধার নিশীথে কাননে?
কিসে হারা হলে প্রাণের সন্তানে?
কেন বা বন্ধন করিল দুর্জ্জনে ?
বল মা গো শুনি, আমারে কও।"
শুনি সে কামিনী, সে পুরুষ-বাণী—
হয়ে অধোমুখ বিষণ্ণবদনী—
ফেলি অশ্রুধারা দীর্ঘশ্বাস হানি
মৃদুল বচনে কহেন তায়—
"সে দুঃখের কথা কেন বাছা আর—
চির দুখিনীর যাতনা অপার
শুনিতে বাসনা হয় কি কাহার ?
কাঙ্গালের দিকে কেহ না চায়।"
"ভারত কমলা জানিবে আমারে,
মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া জন্ম উচ্চঘরে ;
যৌবনে আমারে সকলে আদরে
বিবাহ দিলেন ভারত সনে।"
"পতি অতুলন গুণের সাগর,
ত্রিলোকে না হেরি তাঁহার সোসর,
কিবা বীর্য্যবান কিবা রূপধর
রমণীমোহন হয় যে মনে॥"
"মম পুত্রগণ সবে পুণ্যবান,
হরিশ্চন্দ্র আদি ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান,
ক্রমে তারা সব করিল প্রয়াণ,
ত্যজিয়ে জগৎ গোলোক ধাম।"
"বীরপ্রসবিনী জানে ত্রিভুবন ;
রামচন্দ্র আদি না হয় গণন
মম গর্ভে আসি যত বীরগণ
রাখিল ধরায় ভারত নাম॥"
"গেল তারা চলি, ফেলি একাকিনী ;
হায় পুত্রগণ, তোদেরি জননী—
বনমধ্যে কাঁদে যেন কাঙ্গালিনী ;
বিধির ছলনা বুঝা না যায়।"
"অদৃষ্টে লিখন কে খণ্ডাতে পারে!
গেল সবে তারা ফেলিয়ে আমারে,
কুলাঙ্গার এবে জন্মিয়ে জঠরে
ডুবালে ভারত নাম ধরায়॥"
"নাহি ধর্ম্মলেশ নাহি তেজোবল,
সদা মত্ত সবে খাইয়ে গরল,
পরস্পরে দ্বেষ, এমন পাগল
না জানি না শুনি,প্রাণে না সয়।"
"ইহাদেরি তরে" কহে বীরবর
"হয়েছিলে মাতঃ কতই কাতর।"
"জাননা কি বাছা, জননী-অন্তর
কুপুত্রে অধিক মমতা হয় ?"
"গেল শুভদিন, ক্রমে জ্যোতিহীন
ভারতের চাঁদ হইল মলিন,
গেল বীর্য্যবল হলো সবে ক্ষীণ,
মনেরি বেদনা কহিব কারে।"
"পেয়ে অসময় দারুণ যবন
পাইয়ে অবলা করিল পীড়ন,
মম করযুগ করিল বন্ধন
লইল তনয় সকলি হরে।"

"হও দীর্ঘজীবী করি আশীর্ব্বাদ ;—
অরে পুত্রগণ কর ধন্যবাদ,
না থাকিলে এই, ঘটিত প্রমাদ ;
ঘটিত অনর্থ কপালে মোর।"
"আজি হে জীবন দিলে অবলায়,
কিবা তব নাম নিবাস কোথায়,
কেন বা একাকী হেরি গো হেথায়,
সত্য কহ মোরে পুরুষবর।"
"ইংরাজ নামেতে জানে সর্ব্বজন,
জলধি পারেতে আমারি ভবন,
অতি রম্যস্থান না হয় বর্ণন,
জননী, এমন না হেরি আর।"
"পিতা স্বাধীনতা, সরস্বতী মাতা,
শৈশবেতে বর দিলেন বিধাতা,
হবে বলবান, সকলের জেতা,
আদরের সুত হবে মাতার।"
"সেই বরে মাগো, নাহি কোন ডর,
বেড়াই নির্ভয়ে দেশ দেশান্তর ;
দৈবযোগে আসি কানন ভিতর,
হেরিনু বিপদ দারুণ তব।"
"আর নাহি ভয়, হলো মাগো জয়
থাক সুখে তুমি লইয়া তনয়
সুদিন তোমারি আসিল নিশ্চয়,
ঘুচিবে ত্বরিতে যাতনা তব।"
"ঐ দেখ পুন, উদিছে তপন,
হলো নিশাশেষ, আলোময় বন ;
জয় জগন্নাথ পতিত-পাবন—
পোহাল দুখেরি তোমারি রাতি"
"ছাড় এই বেশ, পুন বাঁধ কেশ,
পেয়েছ যাতনা, জননী ! অশেষ,—
থাকিতে এ দাস, পারে দিতে ক্লেশ
হেনশক্তি কার,—নাহি অরাতি।"
"জয় জগন্নাথ পতিত-পাবন,
জয় দেবদেব, অনাথ শরণ ;
সেই কৃপাসিন্ধু তব সুতগণ
পালিবে,—ঘুচাবে যাতনাভার।"
থামিলেন যুবা ;—রমণীরতন,
ত্যজি বনস্থল, লয়ে পুত্রগণ
সঙ্গে বীরবর, করেন গমন
আপন আবাসে—সুখ আগার।

প্রাকৃত ভূগোল বিজ্ঞান।

আজি কালি বিদ্যানুশীলনরত বঙ্গমহিলা মাত্রেই ভূগোল বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। কোন্ নগর কোন্ নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত, কোন্ নগর সমুদ্রকূলবর্ত্তী, কোন্ দেশের কি রাজধানী, কোন্ রাজ্যের সীমা কতদূর, ইত্যাদি বিষয় জানা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ, আমাদের ভারতবর্ষের সম্বন্ধে ঐ সকল

পরিগণিত হইত, আলস্যাদি

বিষয় না জানিলে চলে না। নানা কর্ম্মোপলক্ষে পিতা, স্বামী, ভ্রাতা বা পুত্র দূরদেশে থাকিতে পারেন। সে স্থান কতদূর, তথাকার জল বায়ু কেমন, কি কি সামগ্রী তথায় পাওয়া যায়, এ সকল বিষয় জানিতে স্ত্রীলোক মাত্রেরই ইচ্ছা ও কৌতুহল সহজেই হইতে পারে। ইতিহাস পড়িতে হইলে ভূগোল জানা আবশ্যক। ভারতবর্ষের বা অন্যান্য দেশের রাজকীয় বিভাগ সকল ভূগোল পাঠেই জানিতে পারা যায়। কিন্তু এই সকল রাজকীয় বা কৃত্রিম বিভাগ ভিন্ন, পৃথিবীর নানা প্রকার প্রাকৃতিক বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। কোথায় জল, কোথায় বা স্থল; কোন প্রদেশ সমতল, কোন প্রদেশ বা বন্ধুর; কোন স্থান উন্নত, কোন স্থান নিম্ন; কোন ভূভাগ নদনদীসঙ্কুল তৃণশস্যবৃক্ষশোভিত, কোন ভূভাগ বা শুষ্ক মরুভূমিময়। আবার তাপের তারতম্যবশতঃ ভূগোলের আর এক প্রকার প্রাকৃতিক বিভাগ হইতে পারে। ঐ বিভাগ সকল কটিবন্ধের ন্যায় পৃথিবী বেষ্টন করিয়া আছে; যথা মধ্যভাগ গ্রীষ্মমণ্ডল ইত্যাদি। কিন্তু রাজনৈতিক ভূগোল বিবরণই বল, আর প্রাকৃতিক ভূগোল বিবরণই বল, দুটীই তালিকাবহুল ও পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া মনে রাখিতে হয়, এ কথা পাঠিকারা স্বীকার করেন। রাজকীয় বিভাগজ্ঞান ইতিহাস পাঠের সাহায্য করে বলিয়া তাহাতে রস থাকিতে পারে এবং প্রাকৃতিক ভূগোল বিবরণ পাঠেও লোকের কৌতুহল জন্মিতে পারে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোনটীতেই বুদ্ধিবৃত্তির চালনা হয় না। কিছুই বুঝিবার নাই, কেবল স্মরণের কার্য্য বলিয়া ভূগোল অপেক্ষাকৃত নীরস। ইতিহাসের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে রাজ্যাদি বিভাগ অতি শুষ্ক লাগে। আবার প্রাকৃতিক ভূগোল বিবরণে অমুক স্থানের মৃত্তিকা এইরূপ, অমুক স্থানে এই এই উদ্ভিজ্জ ও খনিজ পাওয়া যায়, অমুক স্থানে এই এই জন্তু বাস করে, ইত্যাদি বিষয় সকল অবগত হইয়াই মনের তৃপ্তি হয় না। এরূপ হইবার কারণ জানিবার ইচ্ছা হয়। এ দেশের মৃত্তিকা এরূপ কেন হইল, ইহা এত নিম্ন কেন, এখানে এত নদীই বা কেন, ইহার কি কোন কারণ নাই? সহজেই

এই সকল প্রশ্ন মনে উদয় হয়, এবং এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই প্রাকৃত ভূগোল বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এই কথাটী পাঠিকাদিগের হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত, আমরা একটী উদাহরণ দিব।

আষাঢ় কি শ্রাবণ মাসে বৃষ্টির পর, যদি কেহ গঙ্গার কিম্বা অন্য কোন বৃহৎ নদীর উপকূলে দাঁড়ান, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, কল কল শব্দে নদীর জল ক্রমাগত এক দিকে, প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে এবং যে সকল চরে ও ক্ষেত্রে পূর্ব্বে জল ছিল না, তাহা এক্ষণে বারিনিমগ্ন হইয়াছে। প্রতিবৎসর ঐ সকল চর পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, গত বর্ষে এক স্থানে যে চর ছিল, পরবর্ষে সে স্থানে সে চর নাই, অনেক সরিয়া গিয়াছে, ও উহা পূর্ব্ববর্ষের চর অপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে। প্রাচীন লোকদিগের মুখে প্রায়ই এরূপ শুনা যায় যে, যে স্থান দিয়া নদীর স্রোত এখন প্রবাহিত হইতেছে, চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তথায় একটী খাল মাত্র ছিল, আর পূর্ব্বে যে স্থান দিয়া ঐ নদীর প্রবল স্রোত বহিত, এখন তাহা প্রায় পূরিয়া আসিয়াছে, কেবল মধ্যে মধ্যে বড় বড় পুষ্করিণী মাত্র পূর্ব্বতন নদীমুখের পরিচয় দিতেছে। কৃষিব্যবসায়ী লোকের মুখেও কখন কখন শুনা যায় যে, অমুক স্থানে পূর্ব্বে ঝিল ছিল, বর্ষে বর্ষে জলোচ্ছ্বাসের পলি পড়িয়া উহা ভরাট হইয়া গিয়াছে, ও এখন উহাতে উত্তম ফসল হয়। অনেকেই ইহা দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন, কিন্তু কেহ কি একবার ভাবিয়াছেন যে, এই সকল ব্যাপার কি কারণে ও কি রূপে হইতেছে? অনেকে মনে করিতে পারেন যে, নদীর হ্রাস বৃদ্ধিতে, চরের উৎপত্তি বা নাশে, কিছুই শিখিবার নাই। কিন্তু একটু বুদ্ধিবৃত্তির চালনা করিয়া স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে, ঐ সকল ঘটনা হইতে বিলক্ষণ জ্ঞান জন্মিতে পারে। দেখা যাইতেছে, নদীর জল কর্দ্দমাক্ত। ঐ কর্দ্দম কোথা হইতে আসিল, কোথায় বা যাইতেছে? ঐ কর্দ্দম কি নদীর তলদেশে জমিতেছে, না স্রোতঃভরে সমুদ্রে নীত হইতেছে? সকলেই অবগত আছেন, যে জল অপেক্ষাকৃত স্থির না হইলে পলি পড়ে না, এবং জলের চাঞ্চল্য বশতঃ ঐ কর্দ্দম নদীতলে না জমিয়া, জলের সঙ্গে

সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, ও ইহার কিয়দংশ সমুদ্রগর্ভে নিপতিত হয়। সমুদ্রে পড়িয়া ঐ কর্দ্দম কীদৃশী অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহা পশ্চাৎ বলা যাইবে। এক্ষণে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ঐ কর্দ্দম কোথা হইতে আসিতেছে? ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, উহা বৃষ্টির জল হইতে আইসে নাই, কেন না বৃষ্টির জল নির্ম্মল ও স্বচ্ছ; তবে নিশ্চয়ই ঐ কর্দ্দম নানা দেশ বিদেশ হইতে ধৌত হইয়া নদীতে আসিতেছে। কিছু দিন বা সপ্তাহ পূর্ব্বে যাহা মেঘ ছিল, তাহা এক্ষণে পৃথিবীতে পড়িয়া নদীতে গড়াইয়া নদীর কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে ও মৃত্তিকারেণু সকল স্থল হইতে ধৌত করিয়া জলকে কর্দ্দমাক্ত করিয়া তুলিয়াছে।

নদী নিয়তই এইরূপ স্থল হইতে মৃত্তিকা বহিয়া সমুদ্রের দিকে লইয়া যাইতেছে। মৃত্তিকার সকল অংশ কিন্তু সমুদ্রে নীত হয় না। পর্ব্বত হইতে স্রোত নির্গম হইবার সময়, জলের তোড়ে পর্ব্বতীয় প্রস্তরখণ্ড মৃত্তিকাদি ঐ স্রোতে বাহিত হয়। কিন্তু ঐ স্রোতঃ সমভূমিতে আসিলে বেগের লাঘব হয়, সুতরাং প্রস্তরাদি গুরু পদার্থ আর স্রোতে তাড়িত না হইয়া নীচে পড়িয়া যায়, সূক্ষ্ম মৃত্তিকাদির রেণু সকল শীঘ্র পতিত হয় না এবং স্রোতঃ দ্বারা নীত হইয়া নদীর অগ্রভাগের দুই পার্শ্বে জমিতে থাকে; অতএব নদীর মুখে সর্ব্বদা চর জন্মিতেছে।

সমভূমিতে নদীগর্ভের বক্রতাবশতঃ সর্ব্বদা তট ভগ্ন হয়, ও তজ্জাত মৃত্তিকা দ্বারা নদীর মধ্যভাগেও চর উৎপন্ন হয়। কথিত আছে, যে স্থানে পলাশীর যুদ্ধ হয় তথায় এক বৃহৎ আম্রকানন ছিল; কিন্তু তাহার একটী মাত্র বৃক্ষ এক্ষণে দৃষ্ট হয় না; গঙ্গার জলে তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ও তাহা হইতে অনেক নূতন নূতন চরের উৎপন্ন হইয়াছে। সময়ে সময়ে সমূহ চর এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে, উহা মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়া থাকে। ভাগীরথীতে প্রায়ই ঐরূপ চর উৎপন্ন ও বিলীন হইতেছে। গঙ্গাতটস্থ অনেক গ্রামের নাম হইতে আমরা জানিতে পারি যে, উহারা এই প্রকারে উদ্ভূত হইয়াছে, যথা

নদিয়া (নবদ্বীপ), শুখসাগর (শুষ্ক সাগর), ইত্যাদি। এমন কি, ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, বাঙ্গলার দক্ষিণস্থ অধিকাংশ ভাগ স্রোততাড়িত পলি বা বালি হইতে উৎপন্ন।

মৃত্তিকাদির কিয়দংশভাগ সমুদ্রগর্ভে নীত হয়, কিন্তু সে অংশ বড় সামান্য নহে। অনেকে মিসরদেশের পিরামিডের কথা শুনিয়া থাকিবেন। পিরামিডের ন্যায় উচ্চ ও বৃহৎ বাটী পৃথিবীতে অল্প আছে। কিন্তু পিরামিডের দুই গুণ মাটী প্রতি সপ্তাহে গঙ্গা নদী দিয়া সমুদ্রে পতিত হয়। পৃথিবীতে নদী অগণ্য। এইরূপ সকল নদীই স্থল হইতে মাটী লইয়া সাগরে ফেলিতেছে। যদি এই ক্ষয় পূরণের কোন উপায় না থাকিত তাহা হইলে কি পৃথিবীতে বাস করিবার স্থান থাকিত? তবে নিশ্চয়ই ক্ষতি পূরণের উপায় আছে, কিন্তু সে উপায় কি, তাহা আমাদের শিখিতে বাকি রহিল।

এখন স্থলের হ্রাস বৃদ্ধির বিষয় ত্যাগ করিয়া, নদীর জলের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা যাউক। প্রথমতঃ, ইহা অল্পেই জানা যাইতে পারে যে, জল কখন ঊর্দ্ধগামী নহে, সর্ব্বদা নিম্নভূমির দিকেই গড়ায়। এই জন্য নদীর আর একটী নাম নিম্নগা। যে গুণের দ্বারা লোষ্ট্র ঊর্দ্ধে ক্ষিপ্ত হইলে ভূমিতে পড়িয়া যায়, সেই গুণের দ্বারাই জল নিম্নভূমিতে গমন করে। এই গুণের নাম মাধ্যাকর্ষণ। এ বিষয়ে আমাদের বলিবার অনেক আছে।

এক্ষণে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যে স্থানে নদীর প্রারম্ভ সে স্থানে জল কেমন করিয়া যাইল। ইহার উত্তর এই যে, জল মেঘ হইতে পড়ে। মেঘ কেমন করিয়া হয় তাহা সকলেই জানেন। মেঘ জলের এক রকম আকার মাত্র। জল বাষ্প হয়, বাষ্প হইতে মেঘ হয়, আবার মেঘ গলিয়া বৃষ্টি হয়। প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ পরিমাণে জল, কোন প্রশস্ত অগভীর পাত্রে ঢালিয়া অনাবৃত স্থানে রাখিলে, বৈকালে তাহার সমস্ত পাওয়া যায় না; জলের কিয়দংশ বাষ্প হইয়া বায়ুতে মিশাইয়া যায়। বায়ুতে আর্দ্র বস্ত্র শুষ্ক হইবার ইহাই মাত্র কারণ। আকাশে যে এত মেঘ তাহার কারণও এই। সূর্য্যের

তাপে সমুদ্রের জল উষ্ণ হইলে, বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া থাকে। ঐ বাষ্প আকাশে জমিয়া মেঘ হয় এবং ঐ মেঘ বায়ু দ্বারা দেশ বিদেশে নীত হয়। যখন দক্ষিণ দিক হইতে বায়ু বহিতে থাকে, তখন আমাদের দেশে বৃষ্টি হয়, কেননা বঙ্গের দক্ষিণে সমুদ্র আছে। বৃষ্টি হইতে সকল নদীর উৎপত্তি হয়। কিন্তু সত্য সত্যই যদি মেঘই সকল নদ নদীর উৎপত্তির কারণ, তবে কত বাষ্প প্রত্যহ সমুদ্র হইতে উত্থিত হয়? শুনিয়া বিস্মিত হইবে, যে প্রতি বর্ষে (২,০৫,২০,০০,০০,০০,০০০,) দুই শঙ্কু পঞ্চ নিখর্ব্ব দুই খর্ব্ব মোন জল কেবল বৃষ্টি হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয়, অনুমিত হইয়াছে। অতএব জানা যাইতেছে, যে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় (৪,১৭,০০,০০,০০০,) চার বৃন্দ সপ্তদশ কোটী মোন জল বাষ্প হইয়া আকাশে উঠিয়া থাকে!

আমরা এখন জানিতে পারিতেছি যে, আষাঢ় মাসে দক্ষিণ হইতে বায়ু বহে বলিয়া বৃষ্টি হয়, শীতকালে উত্তর দিক হইতে বায়ু আইসে বলিয়া বৃষ্টি হয় না; কেন না বঙ্গদেশের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, কোন সমুদ্র নাই। কিন্তু কেন গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে দক্ষিণ হইতে, ও শীতকালে উত্তর হইতে বায়ু বহে তাহাও জানিতে বাকি রহিল।

দেখ, আমরা সামান্য নদী হইতে কতগুলি তত্ত্ব জানিতে পারিলাম। এইরূপ সামান্য সামান্য বস্তুর কার্য্য কারণ নির্দ্দেশই প্রাকৃত ভূগোল বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য। যে সকল বস্তু আমরা সচরাচর দেখি তাহা হইতে যে কিছু শিখিবার নাই, এই ভ্রমটী অনেকেরই আছে। কোন ভূভাগের সামান্য মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া উহা কিরূপে উৎপন্ন হইল, কিরূপেই বা বর্ত্তমানাবস্থা প্রাপ্ত হইল তাহা জানিতে সক্ষম হওয়া যায়। বঙ্গদেশ যে হিমালয়ের গৈরিকাদি মৃত্তিকা ভাঙ্গিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার কোন ইতিহাস নাই, কিন্তু দেশের ভূমিতে সে ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। ভাবুক, চিন্তাশীল, বিজ্ঞলোকের চক্ষে পৃথিবীর সকল বস্তুই মধুময় ও বিচিত্র আকার ধারণ করে, ও তাঁহারা তাহা হইতে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেন।

এক্ষণে ভরসা করি, আমাদের পাঠিকাবৃন্দ, প্রাকৃত ভূগোল

বিজ্ঞান কাহাকে বলে, কিছু কিছু বুঝিয়াছেন। পৃথিবীতে কিছুই স্থির নহে। পৃথিবী এখন যেরূপ আছে, ভবিষ্যতে সেরূপ থাকিবে না। জগৎ চঞ্চল, জগৎ শব্দই গত্যর্থ, গম্ ধাতু নিষ্পন্ন। ইহার শব্দার্থই গতিশীল। প্রত্যেক নিমেষে জগতের রূপান্তর হইতেছে, কিন্তু তিল তিল করিয়া হইতেছে বলিয়া আমরা তাহা দেখি না। এক্ষণে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তাহার অবহিত পর্য্যবেক্ষণ ও তদ্বিষয়ে সম্যক বিচার দ্বারা পৃথিবীর ভূত পরিবর্ত্তনের মীমাংসা করা যায়। কেবল এইটী মাত্র ধরিয়া লইতে হইবে যে, এখন যে সকল নিয়মে পৃথিবীর পরিবর্ত্তন হইতেছে, পূর্ব্বেও সেই নিয়মেই হইত।

এইরূপ কোন্ ভূভাগ উন্নত, কোন্ ভূভাগ বা অবনত, কোন্ দেশ কিরূপে উৎপন্ন, ইত্যাদি ব্যাপার সকল কার্য্যকারণ সূত্রে গ্রথিত। ইহারা বিশেষ বিশেষ কারণের কার্য্য। ঐ সকল কারণ নির্দ্দেশই ভূগোল বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। ফলতঃ ভূগোলবিজ্ঞান একটী স্বতন্ত্র বিজ্ঞান নহে। ইহা জ্যোতিষ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব বিদ্যা, খনিজ বিদ্যা, পদার্থ বিজ্ঞান, প্রাণি-তত্ত্ব, উদ্ভিজ্জ-তত্ত্ব, প্রভৃতি অন্যান্য বিজ্ঞানের প্রয়োগ মাত্র। এত গুলিন বিদ্যার নাম শুনিয়া পাঠিকাগণ যেন শঙ্কিতা না হন, এ সকলের অতি স্থূল মীমাংসা আমাদের জানা আবশ্যক। বোধ হয় পাঠিকাদিগের মধ্যে কেহ কেহ পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও রসায়নের কিছু কিছু জানেন। যাঁহারা জানেন না, তাঁহারাও ভূবিজ্ঞানপ্রসঙ্গোত্থিত ঐ সকল বিজ্ঞানের অনেক কথা শিখিতে পারিবেন।

বামাগণের রচনা।

বঙ্গনারী।

জাগ ভগ্নীগণ কর অবধান,
ঐ ঘোর নিশা হলো অবসান,
কেন আছ আঁখি করে নিমীলিত,
ঐ শুখতারা হয়েছে উদিত,
নিশ্চিন্ত হইয়া আছ কেমনে।

অজ্ঞান তামসী করিছে প্রয়াণ,
আলস্য ত্যজিয়া কর বিদ্যাগান,
কবিকুল পিক—কি মধুর শুনি,—
করিতেছে দেখ কাকলীর ধ্বনি,
জাগাতে ভারত নিবাসিগণে।

তাপে সমুদ্রের জল উষ্ণ হইলে, বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া থাকে। ঐ বাষ্প আকাশে জমিয়া মেঘ হয় এবং ঐ মেঘ বায়ু দ্বারা দেশ বিদেশে নীত হয়। যখন দক্ষিণ দিক হইতে বায়ু বহিতে থাকে, তখন আমাদের দেশে বৃষ্টি হয়, কেননা বঙ্গের দক্ষিণে সমুদ্র আছে। বৃষ্টি হইতে সকল নদীর উৎপত্তি হয়। কিন্তু সত্য সত্যই যদি মেঘই সকল নদনদীর উৎপত্তির কারণ, তবে কত বাষ্প প্রত্যহ সমুদ্র হইতে উত্থিত হয়? শুনিয়া বিস্মিত হইবে, যে প্রতি বর্ষে (২,০৫,২০,০০,০০,০০,০০০,) দুই শঙ্কু পঞ্চ নিখর্ব্ব দুই খর্ব্ব মোন জল কেবল বৃষ্টি হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয়, অনুমিত হইয়াছে। অতএব জানা যাইতেছে, যে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় (৪,১৭,০০,০০,০০০,) চার বৃন্দ সপ্তদশ কোটী মোন জল বাষ্প হইয়া আকাশে উঠিয়া থাকে!

আমরা এখন জানিতে পারিতেছি যে, আষাঢ় মাসে দক্ষিণ হইতে বায়ু বহে বলিয়া বৃষ্টি হয়, শীতকালে উত্তর দিক হইতে বায়ু আইসে বলিয়া বৃষ্টি হয় না; কেন না বঙ্গদেশের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, কোন সমুদ্র নাই। কিন্তু কেন গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে দক্ষিণ হইতে, ও শীতকালে উত্তর হইতে বায়ু বহে তাহাও জানিতে বাকি রহিল।

দেখ, আমরা সামান্য নদী হইতে কতগুলি তত্ত্ব জানিতে পারিলাম। এইরূপ সামান্য সামান্য বস্তুর কার্য্য কারণ নির্দ্দেশই প্রাকৃত ভুগোল বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য। যে সকল বস্তু আমরা সচরাচর দেখি তাহা হইতে যে কিছু শিখিবার নাই, এই ভ্রমটী অনেকেরই আছে। কোন ভুভাগের সামান্য মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া উহা কিরূপে উৎপন্ন হইল, কিরূপেই বা বর্ত্তমানাবস্থা প্রাপ্ত হইল তাহা জানিতে সক্ষম হওয়া যায়। বঙ্গদেশ যে হিমালয়ের গৈরিকাদি মৃত্তিকা ভাঙ্গিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার কোন ইতিহাস নাই, কিন্তু দেশের ভুমিতে সে ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। ভাবুক, চিন্তাশীল, বিজ্ঞলোকের চক্ষে পৃথিবীর সকল বস্তুই মধুময় ও বিচিত্র আকার ধারণ করে, ও তাঁহারা তাহা হইতে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেন।

এক্ষণে ভরসা করি, আমাদের পাঠিকাবৃন্দ, প্রাকৃত ভুগোল বিজ্ঞান কাহাকে বলে, কিছু কিছু বুঝিয়াছেন। পৃথিবীতে কিছুই স্থির নহে। পৃথিবী এখন যেরূপ আছে, ভবিষ্যতে সেরূপ থাকিবে না। জগৎ চঞ্চল, জগৎ শব্দই গত্যর্থ, গম্ ধাতু নিষ্পন্ন। ইহার শব্দার্থই গতিশীল। প্রত্যেক নিমেষে জগতের রূপান্তর হইতেছে, কিন্তু তিল তিল করিয়া হইতেছে বলিয়া আমরা তাহা দেখি না। এক্ষণে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তাহার অবহিত পর্য্যবেক্ষণ ও তদ্বিষয়ে সম্যক বিচার দ্বারা পৃথিবীর ভুত পরিবর্ত্তনের মীমাংসা করা যায়। কেবল এইটী মাত্র ধরিয়া লইতে হইবে যে, এখন যে সকল নিয়মে পৃথিবীর পরিবর্ত্তন হইতেছে, পূর্ব্বেও সেই নিয়মেই হইত।

এইরূপ কোন্ ভূভাগ উন্নত, কোন্ ভূভাগ বা অবনত, কোন্ দেশ কিরূপে উৎপন্ন, ইত্যাদি ব্যাপার সকল কার্য্যকারণ সূত্রে গ্রথিত। ইহারা বিশেষ বিশেষ কারণের কার্য্য। ঐ সকল কারণ নির্দ্দেশই ভুগোল বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। ফলতঃ ভুগোলবিজ্ঞান একটী স্বতন্ত্র বিজ্ঞান নহে। ইহা জ্যোতিষ, রসায়ন, ভুতত্ত্ব বিদ্যা, খনিজ্জ বিদ্যা, পদার্থ বিজ্ঞান, প্রাণি-তত্ত্ব, উদ্ভিজ্জ-তত্ত্ব, প্রভৃতি অন্যান্য বিজ্ঞানের প্রয়োগ মাত্র। এত গুলিন বিদ্যার নাম শুনিয়া পাঠিকাগণ যেন শঙ্কিতা না হন, এ সকলের অতি স্থূল মীমাংসা আমাদের জানা আবশ্যক। বোধ হয় পাঠিকাদিগের মধ্যে কেহ কেহ পদার্থ-বিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও রসায়নের কিছু কিছু জানেন। যাঁহারা জানেন না, তাঁহারাও ভুবিজ্ঞানপ্রসঙ্গোত্থিত ঐ সকল বিজ্ঞানের অনেক কথা শিখিতে পারিবেন।

বামাগণের রচনা।

বঙ্গনারী।

জাগ ভগ্নীগণ কর অবধান,
ঐ ঘোর নিশা হলো অবসান,
কেন আছ আঁখি করে নিমীলিত,
ঐ শুখতারা হয়েছে উদিত,
নিশ্চিন্ত হইয়া আছ কেমনে।

অজ্ঞান তামসী করিছে প্রয়াণ,
আলস্য ত্যজিয়া কর বিদ্যাগান,
কবিকুল পিক—কি মধুর শুনি,—
করিতেছে দেখ কাকলীর ধ্বনি,
জাগাতে ভারত নিবাসিগণে।

সংবাদ সার।

—ইংলণ্ডের কোনস্থানে যন্ত্রীরা যন্ত্রদ্বারা অদ্ভুত বিষয় সমুদয় প্রদর্শন করান। সম্প্রতি কোন ব্যক্তি ইহার এইরূপ একটী আশ্চর্য্য বিবরণ লিখিয়াছেন যে, একটী বাক্সের মধ্যে একজন মনুষ্য বসিয়া আছে। মানুষটীকে দেখিতে আসিয়াষ্টি কোন জাতি বলিয়া বোধ হয়। সে উচ্চে বোধ হয় ২০ইঞ্চ হইবে। একখানি গ্লাসের উপর সে উপবিষ্ট রহিয়াছে এবং স্পষ্ট দেখা যায় যে, তাহার সঙ্গে কোন দ্রব্যের কোন সংস্রব নাই। এই কলের মানুষটী খেলা করিতে পারে, অঙ্ক কষিতে পারে, এবং যে সমুদয় কার্য্যে স্মরণ শক্তি, নিপুণতা ও কৌশলের আবশ্যক করে, এরূপ অনেক কর্ম্ম করিতে পারে। যিনি এই বিবরণটী লিখিয়াছেন, তিনি একদিন রাত্রে তাহার ওখানে উপস্থিত হইয়া, তাহাকে ৮৭কে ৬৮ দ্বারা গুণ, ও গুণ করিয়া যে ফল হইবে তাহা ৮ দ্বারা ভাগ করিতে বলেন, এবং সে অনায়াসে এই অঙ্কটী কষিয়া দেয়। একশত সংখ্যার মধ্যে তাহাকে যে কোন অঙ্ক দেওয়া যায়, সে তৎক্ষণাৎ তাহা কষিয়া দিতে পারে। সে দিবস এক জনের সঙ্গে সে অনায়াসে তাস খেলিল, সকলে ইহা দেখিয়া অবাক হইলেন। লণ্ডনের কৃষ্টাল্-প্যালেসে আর একটী মোগলাকৃতি পুতুল আছে। সে বাজি রাখিয়া দাবা খেলা করে এবং এ পর্য্যন্ত কখন কাহারও নিকট পরাজিত হয় নাই।

—ইংলণ্ডে চারিজন স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্বারিষ্টার হইবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন। তাঁহাদের পড়া প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে। তাঁহারা যখন এই ব্যবসায় শিক্ষা করিতে প্রবর্ত্ত হন, তখন অনেকে সন্দেহ করেন যে তাঁহারা ইহাতে কৃতকার্য্য হইবেন না, কিন্তু একজনের পাঠ সমাপ্ত হইতে না হইতে তিনি একটী বণিকালয়ের আটর্ণি হইয়াছেন।

—একজন পণ্ডিত গণনা দ্বারা সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, পৃথিবী ওজন করিলে, উহার গুরুত্ব ১৪০০০-০০০০০০০০০০০০০০০০০০০ মণ হইবে।

—সম্প্রতি ইংলণ্ডে একটী বাষ্প-যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা ৪০টি অশ্বের কার্য্য করিবে, অথচ যন্ত্রটী অতিশয় ক্ষুদ্র। ইহা সর্ব্ব সদ্ধ ২২ ইঞ্চ লম্বা এবং ৯ ইঞ্চ উচ্চ। কলটী একটী মেহগণি কাষ্ঠের বাক্সের মধ্যে মণ্ডিত রহিয়াছে। ষ্টিম কলে যেরূপ বিরক্ত জনক শব্দ হয়, ইহাতে তাহা হইবে না। কলের গা দিয়া যেরূপ তৈল মিশ্রিত ময়লা নির্গত হয়, ইহাতে সেরূপ হইবে না। ইউরোপীয় জাতি অঙ্গুরীর উপর ঘড়ি প্রস্তুত করিয়াছেন, বিচিত্র কি ক্রমে অঙ্গুরীর উপর বাষ্পযন্ত্র প্রস্তুত হইবে।

হিন্দুজাতির পুরাবৃত্ত।

ভারতবর্ষ নানাবিধ জাতির নিবাসভূমি। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পারসীক, ইংরাজ, মুসলমান, সাঁওতাল, প্রভৃতি বহু সংখ্যক জাতি এখানে বাস করে। এই সকল জাতির পরস্পর সম্বন্ধ কি, ইহারা কোথা হইতে, কোন্ সময়ে ভারতবর্ষে আগমন করিল ইত্যাদি প্রশ্ন, সহজেই মনে উদয় হইতে পারে। আমরা আধুনিক ইতিহাস পাঠে অবগত হই, যে প্রায় আট শত বৎসর হইল, মুসলমানেরা উত্তর পশ্চিম দিক্ হইতে আগমন পূর্ব্বক হিন্দুস্থান আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছিলেন: এবং প্রায় দুই শত বর্ষ গত হইল ইংরাজেরা এতদ্দেশে বাণিজ্যোপলক্ষে প্রবেশ করিয়া এক্ষণে সমগ্র ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইয়াছেন। কিন্তু হিন্দুজাতির ভারতভূমিতে আগমন সম্বন্ধে কোন ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। হিন্দুজাতির প্রকৃত ইতিহাস অতি অল্পই আছে।* যাহাও আছে, তাহাতে এ সমস্ত বিষয় বর্ণিত নাই। সুতরাং হিন্দুদিগের সবিস্তার পুরাবৃত্ত লাভের আশা করা বৃথা। যাহা যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা কবিদিগের লেখনী-নিঃসৃত গ্রন্থ হইতে, ও আমাদের আদি ধর্ম্ম-পুস্তক বেদ হইতে সঙ্কলিত। কিন্তু ঐ সকল বিষয় কবির কল্পনাজালে এমনই আচ্ছন্ন, যে প্রকৃত ঘটনা উন্নয়ন করা এক প্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার বলিতে হইবেক। সে যাহা হউক, ঐ সমস্ত পুস্তক পাঠে অন্ততঃ ইহা অবগত হওয়া যায় যে, হিন্দুরা ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী নহেন; তাঁহারা অন্য স্থান হইতে আগমন করিয়া এই স্থানে উপনিবেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের আসিবার পূর্ব্বে বহু সংখ্যক অসভ্য জাতি এখানে বাস করিত। আধুনিক সাঁওতাল, ভিল, কোল, গোঁড় ইত্যাদি, উক্ত জাতি সমূহের সন্তান সন্ততি। বোধ হয় ইহারাই ভারতবর্ষে সর্ব্বাগ্রে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং এই নিমিত্ত আদিম-নিবাসী দস্যু বলিয়া পশ্চাদাগত

* "রাজতরঙ্গিণী" নামক কাশ্মীর দেশীয় ইতিহাস ভিন্ন, ভারতবর্ষের আর কোন ইতিহাস পাওয়া যায় নাই।

হিন্দুকর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছে। বিন্ধ্যাচল হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত এই বংশীয় লোক, সমুদ্রমধ্যস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জের ন্যায়, বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছে। ইহাদের আকার ও গঠন কোন অংশেই হিন্দুদিগের সদৃশ নহে। ইহারা সকলেই অসভ্য, মূর্খ, কৃষ্ণবর্ণ, কৌপিনধারী ও দেখিতে অতি কদাকার। রামায়ণে যে রাক্ষসদিগের বিবরণ পাঠ করা যায়, তাহারা বোধ হয়, এই বংশীয় হইবেক। এই অসভ্যজাতিরা সেই সময়ে হিন্দুঋষিদিগের যজ্ঞধ্বংস, তপস্যাবিঘ্ন ও প্রাণসংহার করিয়া মহা উৎপাত করিত। আর যাহারা বানর বলিয়া আখ্যাত, তাহারাও সম্ভবতঃ এই বর্ব্বর জাতিদিগের মধ্যে এক জাতি হইবেক। অনুমান হয়, রামচন্দ্র ইহাদেরই সহিত বন্ধুতা সংস্থাপন করিয়া দুর্দ্দান্ত লঙ্কাদ্বীপবাসী অসভ্যজাতিকে সমূলে বিনাশ করিয়া ছিলেন।

ইহাদের পরে, ও হিন্দুদিগের আসিবার পূর্ব্বে, বোধ হয় আর এক সম্প্রদায় ভারতভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিল। তামুল, তেলুগু প্রভৃতি দ্রাবিড়ভাষী দাক্ষিণাত্যবাসী লোক এই সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁহারা ভিল প্রভৃতি জাতি অপেক্ষা অনেকাংশে সভ্য ছিলেন। তাঁহারা যে হিন্দুবংশীয় নহেন তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে, তাঁহাদিগের ভাষা হিন্দুদিগের সংস্কৃত ভাষা হইতে অনেক বিভিন্ন; কিন্তু হিন্দুদিগের সহিত অনেক কাল একত্র বাস করাতে, কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ দ্রাবিড়ভাষায় সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। দুইটী ভাষার পরস্পর বিভেদ থাকিলে, তদ্ভাষী ব্যক্তিরা যে ভিন্নজাতীয় হইবে তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে।

ইহাদের উপনিবেশের পর, হিন্দুজাতি ভারতবর্ষে পদবিক্ষেপ করেন। পূর্ব্বে যে দুইটী জাতির বিবরণ লিখিত হইল, তাহারা কোথা হইতে, কোন্ সময়ে এখানে আগমন করিয়াছে, কোন্ মূলজাতি হইতেই বা উৎপন্ন, তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। বস্তুতঃ, ঐ সকল বিষয় নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই, কেবল কল্পনার উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু হিন্দুজাতি সম্বন্ধে সেরূপ বলা যায় না।

প্রকৃত ইতিহাসের অবিদ্যমানেও তাঁহাদের পুরাবৃত্ত অন্যান্য পুস্তক হইতে কথঞ্চিৎ জানিতে পারা যায়।

সকলেই স্বীকার করিবেন, যে মনুষ্যের প্রথমাবস্থায় বৃহৎ অর্ণবযান নির্ম্মাণ সম্ভবে না, অতএব পূর্ব্বকালীন লোকেরা উত্তাল-তরঙ্গমালা-সঙ্কুল সমুদ্র পার হইতে অক্ষম ছিলেন। ভারতবর্ষ পূর্ব্ব পশ্চিম ও দক্ষিণে সমুদ্রদ্বারা সংবেষ্টিত, সুতরাং ঐ সকল দিক্ হইতে কোন জাতির আগমন সম্ভবপর নহে। আবার উত্তর দিক্স্থিত তুষারাবৃত উত্তুঙ্গ হিমালয়পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করা মনুষ্যের আয়াস সাধ্য নহে। অতএব পুরাকালে উত্তরপশ্চিম দিকস্থ সিন্ধুনদী পার হইয়া, ও উত্তর-পূর্ব্বস্থিত ব্রহ্মদেশ দিয়া, ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার কেবল এই দুইটী মাত্র পথ। হিন্দুরা যে উত্তরপশ্চিম দিক্ হইতে ভারতবর্ষে পদ বিক্ষেপ করেন, ও ক্রমশঃ দক্ষিণ ও পূর্ব্বাভিমুখী হন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। তাহার মধ্যে দুইটী এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম;—

১। "হিন্দুদিগের প্রাচীনতম শাস্ত্র অর্থাৎ বেদসংহিতা পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা ভারতবর্ষ মধ্যে সর্ব্বাগ্রে পশ্চিমোত্তর ভাগে আসিয়া অধিবাস করেন। বেদসংহিতায় দক্ষিণাপথের কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু হিমালয়ের ও হিমালয়ের উত্তরদিকের সুস্পষ্ট প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব তাঁহাদের ভারতবর্ষের উত্তরদিক হইতেই আসা সম্ভব বোধ হয়।"

২। "হিন্দুরা হিমালয়ের উত্তরাংশকেই চিরকাল সমধিক পবিত্র ও লোকাতীত মহিমান্বিত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন। ঐ দিকেই তাঁহাদের দেব-নিবাস সুমেরু পর্ব্বত। ঐ দিকেই তাঁহাদের স্বর্গারোহণের প্রশস্ত পথ। ঐ দিকেই তাঁহাদের কৈলাসাদি দেবভূমি ও সর্ব্বপ্রধান তপস্যাস্থল।" *

এক্ষণে হিন্দুরা কোন্ মূলজাতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, ও এই মূলজাতি সর্ব্বাগ্রে কোথায় বাস করিতেন, তাহা আলোচনা করা

* শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত কৃত "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" ৮ পৃষ্ঠা দেখ।

যাউক। ভাষাতত্ত্ববিদ্ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনুমানসিদ্ধ করিয়াছেন যে, আশিয়ার মধ্যভাগের একাংশে আর্য্যনামধেয় এক জাতি বাস করিতেন। সম্ভবতঃ হিন্দুকুশপর্ব্বতের উত্তরস্থিত এবং বেলুরতাগ ও মুস্তাগ পর্ব্বতের পশ্চিম পার্শ্বস্থ উন্নত ভূমি, ইহাদের নিবাস স্থান ছিল। ইউরোপবাসী ইংরাজ, ফ্রেঞ্চ, ওলন্দাজ, গোলন্দাজ প্রভৃতি জাতিসমূহ, ও আশিয়ানিবাসী পারসীক ও হিন্দুজাতি এই আর্য্যবংশ-সম্ভূত। পাঠিকা বিস্মিত হইয়া বলিতে পারেন, এই সকল বহুদূরস্থ জাতিবর্গ যে এক আদিম জাতি-সম্ভূত, তাহা কিরূপে বিশ্বাস করিব? কিন্তু এই বিস্ময়কর তত্ত্বটী, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অকাট্য প্রমাণে সুসিদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, এক সহস্র যোজনস্থিত লণ্ডননিবাসী ইংরাজ, ও ভাগীরথীতীরনিবাসী ব্রাহ্মণে ভ্রাতৃ সম্পর্ক। এই প্রমাণ ঐ সমস্তজাতির ভাষা হইতে গৃহীত। যে সময়ে ইতিহাসের সৃষ্টি হয় নাই, সেই সময়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইলে, এক মাত্র ভাষার প্রমাণই বিশ্বাসযোগ্য। পূর্ব্বে যে সকল জাতির নাম উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাদিগের ভাষার কতকগুলি শব্দের, ও ব্যাকরণ-ঘটিত প্রত্যয়াদির পরস্পর সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এই নিমিত্ত সেই সকল ভাষার যে এক মূল ছিল, এবং পূর্ব্বোক্ত জাতিরা যে এক সময়ে ঐ মূল ভাষায় কথোপকথন করিত, ও এক সমাজভুক্ত ছিল, তাহা সহজেই প্রতীতি হয়।

হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী যে একজাতি-সম্ভূত তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন; কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ না থাকিলেও, তাহাদিগের ভাষা পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, তাহারা যে এক মূলজাতি হইতে সমুদ্ভূত, তাহা বলিতে পারা যায়। হিন্দী ও বঙ্গভাষার পরস্পর এরূপ সাদৃশ্য আছে, যে ঐ দুই ভাষা যে এক মূলভাষা হইতে উৎপন্ন, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। বস্তুতঃ, ঐ দুই ভাষাই সংস্কৃত ভাষার অপভ্রংশ মাত্র। সংস্কৃত এবং ইংরাজীতেও ঐরূপ অনেক সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত ভাষায় পিতৃ, মাতৃ, ভ্রাতৃ ইত্যাদি শব্দ, ইংরাজিতে ফাদর্, মাদর্, ব্রাদর্ ইত্যাদি হইয়া

থাকে।* ইংরাজী একটী আধুনিক ভাষা। ইংরাজী যে ভাষা হইতে উৎপন্ন, তাহারও সহিত সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য আছে। গৃহ, দেবতা, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কন্যা, বৃক্ষ, কুঠার প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় শব্দ সকল প্রাগুক্ত ভাষাসমূহে প্রায় একরূপ। এই সাদৃশ্য কিরূপে হইল? ইংরাজ প্রভৃতি জাতিরা কি অতি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা হইতে ঐ সমুদায় শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন? কখনই না। ইহা সম্ভব বটে যে, কাল সহকারে ও একত্র সহবাসে, এক ভাষার কোন কোন শব্দ অপর একটী ভাষায় প্রবিষ্ট হইতে পারে; † কিন্তু পিতা, মাতা প্রভৃতি সম্পর্কবাচক; আমি, তুমি প্রভৃতি সর্ব্বনাম, এক, দুই প্রভৃতি সংখ্যাবাচক; গো, অশ্ব প্রভৃতি প্রাণীবাচক; নাসা, দন্ত প্রভৃতি অঙ্গবাচক; ইত্যাদি সর্ব্বদা প্রযোজ্য শব্দগুলি সেরূপ হওয়া কখনই সম্ভব নহে। অতএব ইহাতেই স্থির সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ইউরোপ খণ্ডের অধিকাংশ ভাষা, এবং সংস্কৃত ও পারসীক ভাষা একটী মূল ভাষা হইতে সমুদ্ভূত; এবং সেই মূলভাষা, দেশ, কাল ও অবস্থা ভেদে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছে। সেই মূলভাষার নাম আর্য্যভাষা। তাহা এক্ষণে কুত্রাপি প্রচলিত নাই। এই আর্য্যভাষাই সংস্কৃত, পারসীক ও প্রায় সকল ইউরোপীয় ভাষার জননী স্বরূপা। এক মাতার পুত্র কন্যাদির মধ্যে যেমন অনেক সৌসাদৃশ্য দেখা যায়, সেইরূপ আর্য্যভাষাসম্ভূত যাবতীয় ভাষাতেই সর্ব্বনাম, সংখ্যাবাচক, সম্পর্কবাচক অনেক শব্দের ও ব্যাকরণ-ঘটিত প্রত্যয়াদির সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। যদি উপর্য্যুক্ত জাতিসমূহের মধ্যে ভাষা, আচার, ব্যবহার ও শাস্ত্রোক্ত দেবোপাখ্যান প্রভৃতি নানা বিষয়ে পরস্পর সদৃশতা থাকে, তবে যে তাহারা এক মূল জাতি হইতে উৎপন্ন, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এই মূল জাতির নাম আর্য্যজাতি। গৃহ-

* বঙ্গদর্শন, দ্বিতীয় ভাগ, ষষ্ঠ সংখ্যায়, "ভাষাসমালোচন" শীর্ষক প্রবন্ধে এই সকল শব্দের একটী সুন্দর তালিকা আছে।

† যথা বঙ্গভাষায়, বাক্স, জজ্, টেবিল্ ইত্যাদি ইংরাজী শব্দ চলিত হইয়াছে।

বিচ্ছেদেই হউক, বা লোকসংখ্যাধিক্যবশতঃই হউক, এই আর্য্য-জাতি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া, একভাগ পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করতঃ ইউরোপখণ্ডের নানাস্থানে অধিবাস করেন, এবং দ্বিতীয়ভাগ দক্ষিণাভিমুখে আগমন পূর্ব্বক সরস্বতী, শতদ্রু, ইত্যাদি সপ্তনদীসঙ্কুল সিন্ধু ও পঞ্জাব দেশে অবতীর্ণ হইয়া, ক্রমশঃ সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন, ও তত্রত্য বিবিধ বংশীয় অনার্য্য বর্ব্বর জাতিদিগকে পরাজিত ও নির্ব্বাসিত করিলেন। হিন্দুরা যে প্রথমে সিন্ধুদেশ অধিকার করেন, তাহার পরিচায়ক ভূরি ভূরি বচন বেদের প্রাচীনতম অংশে সন্নিবেশিত আছে। তাহাতে গঙ্গা যমুনার নাম প্রায় দেখা যায় না। তাঁহারা সিন্ধুদেশ পার হইয়া বংশবৃদ্ধি সহকারে, ক্রমশঃ বিন্ধ্যাচল ও হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেন। সিন্ধু হইতে পঞ্জাবে, পঞ্জাব হইতে অযোধ্যায়, অযোধ্যা হইতে মগধ, ক্রমান্বয়ে সকল দেশের উপর তাঁহারা জয়পতাকা উড্ডীন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের প্রভুতা সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইল। আদিমনিবাসী প্রায় সকল বর্ব্বর জাতি নির্জ্জিত হইয়া বন ও পর্ব্বতে আশ্রয় লইল, কেবল কিয়দংশ মাত্র হিন্দুদিগের পদানত হইল।

সেই অতি প্রাচীন সময়ে, প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, হিন্দুরা যে সভ্যতার উচ্চাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আমাদিগের বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। যে সময়ে ইউরোপে যাবতীয় জাতি ভীষণ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, সে সময়ে হিন্দুরা জ্ঞান ও সভ্যতায় জগৎ সমুজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন। "তাঁহারা গ্রাম ও নগর নির্ম্মাণ করিতেন, ভূমিকর্ষণ করিয়া যবাদি শস্য সমূহ উৎপাদন করিতেন, রাজত্বপদ ও রাজকীয় ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়া রাজ্যশাসন করিতেন, অস্ত্র, বর্ম্ম, স্বর্ণালঙ্কার নির্ম্মাণ করিয়া ব্যবহার করিতেন, এবং ঔষধ ও চিকিৎসাবৃত্তি, গগন পর্য্যবেক্ষণ, ও মাস, মলমাসাদি নির্দ্ধারণ করিয়া আপনাদের অবস্থোন্নতির প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রদান করিতেন।" *

* ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, পৃঃ ৭৩।

সে সময়ে আর্য্যবংশীয় স্ত্রীগণের অবস্থাও নিতান্ত হীন ছিল না। "তাঁহারা দেবার্চ্চনায় ও যজ্ঞানুষ্ঠানে অধিকারী ছিলেন, যজ্ঞ সমাজেও উপস্থিত থাকিতেন, উদ্বাহকালে যৌতুক লাভেও সমর্থ হইতেন, ও স্থলবিশেষে দুহিতৃ-পুত্রেরা শাস্ত্রানুসারে মাতামহের ধন অধিকার করিতেন। বিশ্ববারা নাম্নী একটী অত্রিবংশীয় স্ত্রীলোক ঋগ্বেদের অন্তর্গত একটী সম্পূর্ণসূক্ত (অর্থাৎ বেদমন্ত্র) রচনা করেন, এরূপ লিখিত আছে। স্ত্রীজাতি শিক্ষালাভ বিষয়ে একবারে বঞ্চিত থাকিলে ও রূপ কথার উল্লেখ থাকা কদাচ সম্ভব হইত না।"*

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, যে তৎসাময়িক হিন্দুমহিলারা শিক্ষালাভে ও নানা বিষয়ে অধিকারিণী ছিলেন, এবং উত্তরকালে যে তাঁহারা অধিকতর উন্নত হইয়াছিলেন, ও হিন্দুগৃহ অলঙ্কৃত ও পবিত্র করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ মনুসংহিতা, রামায়ণ ও মহাভারতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ সত্ত্বেও আমরা আমাদিগের যোষিদ্‌বর্গের শোচনীয়াবস্থা অক্ষুব্ধ হৃদয়ে দেখিতেছি, ও তাঁহাদের প্রকৃত উন্নতি সাধনে এক প্রকার নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছি, ইহা সামান্য পরিতাপের বিষয় নহে।

স্ত্রীলোকের প্রকৃত স্বাধীনতা।

বঙ্গমহিলাগণের হীনাবস্থা লইয়া কৃতবিদ্য মহাশয়গণ অনেক দিনাবধি চীৎকার করিতেছেন; কিন্তু আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ সে চীৎকারে কোন উপকারই হইতেছে না। বঙ্গরমণীগণের উন্নতির জন্য কত পুস্তকই প্রণীত হইয়াছে, কত প্রবন্ধই প্রকাশিত হইয়াছে, কত বক্তৃতাই বঙ্গদেশকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে; কিন্তু কি উপকার হইয়াছে? অনেকে বলিবেন—"উপকার হইয়াছে বৈ কি।" কিন্তু আমার বিবেচনায় উপকার হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত বর্ত্তমান শিক্ষার দোষে ইংরাজ মহিলাগণের ন্যায়, ক্রমে আমরা নানাপ্রকার

* ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়, পৃঃ ৭৩।

ক্লেশে পতিত হইতেছি। আমার এ কথা শুনিয়া হয় ত পাঠকবর্গ চমৎকৃত হইবেন, কিম্বা ভাবিবেন, আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, নতুবা ইংরাজ মহিলাগণের আবার ক্লেশ কি। তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনা, যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই যাইতেছেন, পদব্রজে, যানারোহণে, অশ্বারোহণে, একাকিনী, স্বামীর সহিত, এবং বন্ধু বান্ধবের সহিত, প্রকাশ্য স্থানে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে তাঁহাদের কিছুমাত্র বাধা নাই। তাঁহারা পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা ও অন্যান্য প্রকাশ্য সভা স্থানে যাইয়া বসিবার উপযুক্ত স্থান পাইতেছেন। নানা প্রকার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া কত জ্ঞানলাভ করিতেছেন। এদিকে আপনারাও লেখা পড়া উত্তম শিখিয়াছেন, এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা করিতেও সক্ষম হইয়াছেন। যাঁহাদের সুখের দৃশ্য এত মনোহর, তবে আমি কেন তাঁহাদের দুঃখ কল্পনা করিতেছি। পাঠকগণ, আপনারা স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, যে আমার এ কল্পনা নিতান্ত অমূলক নহে।

বিলাতীয় স্ত্রীগণকে উত্তম রূপে লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া হয়। তাঁহারা জ্ঞানবতী ও বিদ্যাবতী হইয়া ইহা বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারেন যে, পরাধীন হইয়া পরান্নে প্রতিপালিত হওয়া দুঃসহনীয় ক্লেশ! বুঝিলে কি হইবে—সম্মানশালী প্রধান প্রধান ব্যবসায় ও কার্য্যালয় প্রভৃতি তাঁহাদিগের সম্মুখে রুদ্ধদ্বার। প্রচলিত সামাজিক নিয়মাধীনে তাঁহারা এত আবদ্ধ যে, "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং," এই মহাবাক্য হৃদয়ে ধারণ করিয়াও মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অধীনতার পদসেবা করিতেছেন। ব্যারিষ্টারী, ওকালতী, চিকিৎসা ব্যবসায়, ধর্ম্মোপদেশকের পদ, পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বরের পদ প্রভৃতি যত প্রকার মাননীয় ব্যবসায় ও পদ আছে তাহার সহিত তাঁহাদিগের কোন সম্বন্ধই নাই, এবং রাজ্যসংক্রান্ত কোন কার্য্যেই তাঁহাদের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। পুরুষগণ বিলক্ষণ রূপে বুঝাইয়া দিতেছেন যে, পরাধীন হইয়া পৃথিবীতে বাস করা অপেক্ষা আর ক্লেশ নাই; আবার তাঁহারাই যতদূর সাধ্য তাহাদিগকে

অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা সামান্য নিষ্ঠুরতার কার্য্য নহে। এ প্রকার বিদ্যা ও জ্ঞান লাভাপেক্ষা অজ্ঞ ও মূর্খ হইয়া থাকা সুখের বিষয়। যে ব্যক্তি অধীনতাকে ভয়ানক ক্লেশ মনে করিয়া অন্তরের সহিত ঘৃণা করে, তাহার পক্ষে অধীনতা যার পর নাই ক্লেশপ্রদ। অনেকের সংস্কার আছে যে, ইংরাজমহিলারা সুখী, আমরা নিতান্ত দুঃখী। আমি অনেক দিন অবধি চিন্তা করিয়া ও বিলাতি স্ত্রীদিগের অবস্থার সহিত এ দেশীয় রমণীগণের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিয়াছি যে আমরাই প্রকৃত সুখী ছিলাম। অজ্ঞতা-নিবন্ধন অধীনতাকে আমরা কিছুমাত্র ক্লেশ মনে করি নাই। মনের সুখই যথার্থ সুখ, সুতরাং তাহার অভাব ছিল না। পর অন্নে প্রতিপালিত হওয়াই স্ত্রীদিগের উপযুক্ত, এইটী মনে করিয়া আমরা পরম সুখী ছিলাম। এক্ষণে ইংরাজী ধরণের শিক্ষায় আমাদিগকে দুঃসহনীয় ক্লেশে পতিত করিতেছে। অভিভাবক অভাবে জীবিকা নির্ব্বাহে অসমর্থতা প্রযুক্ত বন্ধু বান্ধবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, এ অবস্থা কি শোচনীয়! আমরা লেখা পড়া শিক্ষা করিতেছি, অথচ এই শোচনীয় অবস্থা হইতে উদ্ধার হইতে পারিতেছি না। এখন কৃতবিদ্য মহাশয়দিগের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করি যে, ইংরাজী প্রণালীতে আমাদিগকে স্বাধীনতা না দিয়া যথার্থ স্বাধীনতা দেন, যে স্বাধীনতা আমাদিগকে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের উপযুক্ত করিতে পারে। এস্থানে স্নেহপাত্রী মুগ্ধস্বভাবা ভগিনীদিগকেও একটী বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেছি। তাঁহারা যেন স্বাধীনতার আশা-মরিচীকায় ভ্রান্ত হইয়া পুরুষদিগের সমকক্ষ হইয়া ভোজন ও ভ্রমণকেই অধীনতার শৃঙ্খলচ্ছেদন হইল মনে না করেন। অবগুণ্ঠনমোচনপূর্ব্বক পুরুষের সমকক্ষ হইয়া আহার বিহার করা প্রকৃত স্বাধীনতা নহে। আপনাকে আপনি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে শিক্ষা করাই প্রকৃত স্বাধীনতা ও শিক্ষা।

শ্রীমতী———

ক্রমশঃ।

সাবিত্রী।

কুসুম-লতিকা সম কোমলাঙ্গি সতি!
কে তুমি এ নিরজন গহন কাননে,
ভ্রমিতেছ একাকিনী—অবসন্ন-মতি,
মণিহারা ফণি যথা; সজল নয়নে।
আলুথালু কেশপাশ জিনি কাদম্বিনী
আবরি বদনশশী করেছে মলিন,
দারুণ চিন্তার বেগে মরি উন্মাদিনী,
ইতি উতি ধাবমানা হ'য়ে সংজ্ঞাহীন;
অসম সাহসে করি হৃদয় কঠিন।

মানস-সরস-শোভা ফুল্ল-কুমুদিনী
মলয় মরুত-ভরে মৃদু আন্দোলিত;
আজু সে চারুতা নহে চিত্ত-বিনোদিনী,
বিশুষ্ক তপত নীরে হ'য়ে সন্তাপিত।
যে কনক বিহঙ্গিনী পারিজাত-কোলে
শীতাতপ-নিবারণে লভিলা আশ্রয়,
সে তরুর পতনে সে কাঁদে উতরোলে;
হায় রে দুরন্ত কাল—নিঠুর-হৃদয়!
প্রণয়ি-পরাণ-ঘাতি নীচ দুরাশয়!

নবীন নীরদগত নব সৌদামিনী,
এক আত্মা এক তনু একই পরাণ,
আনন্দে অদৃশ্য রহে পতিসোহাগিনী,
নিমীলিত ভাবে করে প্রেমসুধাপান।
বিধির বিপাকে কিন্তু যবে পয়োধর
শীতলিতে বসুমতী ঝরে অবিরল,
অমনি চঞ্চলা-সতী কাতর-অন্তর
আলুথালু আথিবিথি পড়ে ধরাতল;
সে বিরহ হাহাকারে ক্ষিতি টলমল।

গিরীশ-হৃদয়ে বাস লভি কুরঙ্গিণী,
মৃগয়ু-আয়ুধে সত্য পায় পরিত্রাণ,
প্রবেশিলে কিন্তু তাহে কাল ভুজঙ্গিনী,
নিরাশ্রয়-মৃগী হয় শরব্য-নিদান।
অথবা স্নেহে ভৃঙ্গী যথা ভৃঙ্গ অদর্শনে
বিপিনে বিপিনে ফিরে গুন্ গুন্ করি,
সকরুণ আর্ত্তনাদে বিরস-বদনে;
তেমতি ভ্রমিছ তুমি লজ্জা পরিহরি;
বদন-কমলে দুখে অঞ্চল আবরি।

বিজন গহন দেশ স্তম্ভিত প্রকৃতি
চারিদিকে চম্ চম্ করে বিভাবরী,
গরজে ভীষণ-নাদে ভীষণ-আকৃতি
দুরন্ত শার্দ্দূল ঋক্ষ মাতঙ্গ কেশরী
বরাহ মহিষ খড়্গী আদি বনচর
কৃতান্তের সহচর—হিংস্র, বন্যবীর,
মদমত্ত, দম্ভে কম্পে বিশ্ব চরাচর।
তাহে তিথি চতুর্দ্দশী নিবিড় তিমির,
ততোধিক ভয়াবহ নিশীথ গভীর।

হেন ঠাঁই হেন কালে বীরেন্দ্র-পরাণ
নিশ্চয় পশিতে হয় মহা শঙ্কাতুর,
কিন্তু তুমি অনায়াসে ত্যজি বাহ্যজ্ঞান।
অটল অন্তরে শঙ্কা করিয়াছ দূর।
কিম্বা হবে কৃতান্তের সখ্য-ভাবাগত
ভূতলে অতুল স্পর্দ্ধা—ধ্বংস বিরহিত।
কিন্তু তুমি মানবী যে মৃত্যু-পরাহত,
অথবা হতাশে তব লৌহময় চিত
অক্ষম ভাবিতে তচ্ছু নিজ হিতাহিত।

অহো! কি নিরখি অই তব অঙ্কনীত
মনোহর-কান্তি এক যুবক নবীন,
তন্দ্রাবেশে অভিভূত চেতনা-রহিত
লোল-তনু-গউর্য়াঙ্গ, বদন মলিন!
একি দেখি চারুশীলে, কুরঙ্গ-নয়নে!
ললিত কপোল-যুগে বহি অশ্রুধার
সে যুবক উরস্তট তিতিছে সঘনে
কাঁপিতেছে বিম্বাধর ঘন অনিবার;
কোকনদ-দল যথা তরঙ্গে অপার।

মুষল, মুদ্গর, পাশ, জাটি, শেল, শূল,
ল'য়ে করে কে উহারা ভীম-দরশন,
ঘূর্ণিত যুগল আঁখি বর্ণ জবাফুল;
সুদীর্ঘ কঙ্কাল-কায়, বঙ্কিম-বদন?
কালকুণ্ঠ-অভিসর, বিকট দশনে
অট্ট অট্ট হাসে ঘোর নেত্র কটমটি;
কিন্তু সতি, তব জ্যোতিঃ অক্ষম ধারণে
পলায়নপর সবে প্রমাদ প্রকটি
নাহি চায় ভয়ে পাছু নয়ন পালটি।

অহহ! তুমি না সতি সাবিত্রী বিদিত
ধর্ম্মশীল-অশ্বপতি-ভূপাল-দুহিতা,
লভিয়াছ তপোবনে পতি মনোনীত
মন্মথ-নিন্দিত রূপে হ'য়ে বিমোহিতা?
কিন্তু আজু ভাগ্যদোষে দমসেন-সুত
তুয়া পতি সত্যবান, কাল-কবলিত;
সম্বর নয়ননীর বিলাপ-সংযুত,
তোমার করুণ-স্বরে চিত আকুলিত;
ধর অঙ্কে মৃতপতি কৃতান্ত-লিপ্সিত।

অই শুন ধর্ম্মরাজ—পতিত-পাবন
ভব-নদী-বৈতরণী পারের কাণ্ডারী
কহিছেন তোমা প্রতি মধুর বচন:—
"আশ্চর্য্য হইনু আমি নৃপাল-কুমারি
"সাবিত্রি! হেরিয়া তব বল্লভ-ভকতি!
"এই তব প্রাণনাথ হইল জীবিত,
"যাও বৎসে, গৃহে যাও পতিব্রতে সতি!
"উজ্জ্বল ভারত আজি সতীত্ব-ভূষিত;
"তুয়া নামে ব্রত অদ্য বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত॥"

মুক্তা।

স্ত্রীলোকমাত্রেই অলঙ্কারপ্রিয়। কি সভ্য কি অসভ্য সকল জাতীয় নারীগণ স্বাভাবিক-রূপলাবণ্যে সন্তুষ্ট নহেন; নানাপ্রকার অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া স্বকীয় নৈসর্গিক মনোহারিত্ব বৃদ্ধি করিতে বাসনা করিয়া থাকেন। এতদ্দেশীয় পুরন্ত্রীবর্গ সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কার অপেক্ষা মৌক্তিক অলঙ্কার অধিকতর ভাল বাসিয়া থাকেন। বস্তুতঃ, মুক্তার হারে যোষিদ্বর্গের সুশ্রীকতা যেরূপ বৃদ্ধি পায়, এরূপ বোধ হয় কিছুতেই পায় না। অতি প্রাচীন কাল হইতে মুক্তা ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সংস্কৃত গ্রন্থে ইহার অশেষ প্রশংসা দৃষ্ট হয়। এই সর্ব্বজনাকাঙ্ক্ষিত মুক্তা কিরূপে বা কোথা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা অনেক পাঠিকা না জানিতে পারেন। সেই জন্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী লিখিত হইল।

মুক্তা এক প্রকার সমুদ্রগর্ভস্থিত শুক্তি অর্থাৎ ঝিনুকের অভ্যন্তর হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাধারণ ঝিনুকের আকৃতি বোধ হয় সকলেই জ্ঞাত আছেন। সকলেই জানেন, যে শুক্তির শরীরের কোমল ভাগ দুইখানি কঠিন আবরণে আবৃত। ঐ কোমল গাত্র হইতে এক প্রকার লালের ন্যায় অর্দ্ধতরল পদার্থ বহির্গত হয়। এই পদার্থ

শুক্তির কঠিন আবরণের অভ্যন্তরে স্তরে স্তরে জমিতে থাকে। মুক্তা-শুক্তি কোনরূপে আহত হইলে তাহার কোমল গাত্রে সহজেই ব্রণ জন্মে এবং ঐ ব্রণের চতুষ্পার্শ্বে উক্ত তরল পদার্থ স্তরে স্তরে জমিয়া গোলাকার মুক্তাফলে পরিণত হয়। মুক্তার উৎপত্তির এই এক কারণ। অন্য আর এক প্রকারেও মুক্তা জন্মিয়া থাকে। কোনগতিকে সমুদ্রতলস্থিত বালুকা-কণা শুক্তির কোমল গাত্র ও কঠিন আবরণের মধ্যভাগে প্রবিষ্ট হয় এবং উহা শুক্তির গাত্র আহত করিলে, এই তরল পদার্থ পূর্ব্বমত সেই বালুকা-কণার চতুর্দ্দিকে জমিতে থাকে ও ক্রমশঃ মুক্তাফলের আকার ধারণ করে। এই নিমিত্ত কোন কোন দেশীয় লোকেরা শুক্তি সকল অপক্কাবস্থায় সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়া তন্মধ্যে বালুকা কণা বা অন্য কোন সূক্ষ্ম পদার্থ প্রবেশ করাইয়া পুনরায় সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। কাল সহকারে ঐ প্রবিষ্ট বস্তুর চতুর্দ্দিকে মৌক্তিক পদার্থ জন্মে। চীনেরা বালুকা-কণার পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্ত্তি শুক্তির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করে এবং উহা কয়েক বৎসরের পর উত্তোলন করিয়া মৌক্তিক পদার্থাবৃত বুদ্ধমূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, ও বিক্রয় করিয়া বিলক্ষণ ধন লাভ করে। এইরূপ একটী বুদ্ধমূর্ত্তি "এসিয়াটিক মিউসিয়ামে" স্থাপিত আছে। মুক্তা-শুক্তি পৃথিবীর অনেক স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে সিংহল ও পারস্যোপসাগর মুক্তা-প্রসূর প্রধান আবাসস্থান বলিয়া বিখ্যাত। সিংহল দ্বীপের মুক্তা অন্যান্য সকল স্থানের মুক্তাপেক্ষা অধিকতর সুন্দর ও মূল্যবান্। এখানে মুক্তাবাণিজ্যোপলক্ষে অনেক লোকের সমাগম হয়। সিংহল দ্বীপের সন্নিকটস্থ সমুদ্র হইতে শুক্তি আহরণ করিবার পূর্ব্বে, রাজপুরুষেরা সমুদ্র-গর্ভস্থিত শুক্তি পরীক্ষা করেন। যখন মুক্তা পরিপক্কাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে দেখেন, তখন মুক্তার মহাজনদিগকে শুক্তি উত্তোলন করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করেন। কিছু দিন হইল একবার শুক্তি তুলিয়া তাহার মধ্যে মুক্তা না পাওয়াতে, চারি পাঁচ বৎসর শুক্তি উত্তোলিত হয় নাই এবং তন্নিবন্ধন কয়েক বৎসর মুক্তা অতিশয় মহার্ঘ হইয়াছিল।

ফাল্গুন মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত শুক্তি ধরিবার প্রশস্ত সময়। এই সময়ে মুক্তা সংগ্রাহকদিগের মহা সমাগম হয়। শুক্তি-উত্তোলকেরা নৌকারোহণপূর্ব্বক প্রাতঃকাল হইতে বৈকাল পর্য্যন্ত শুক্তি তুলিতে নিযুক্ত থাকে। ডুবুরিরা জলে নিমগ্ন হইয়া শুক্তি সকল আহরণ করে। উহারা অভ্যাস বলে শুক্তি-আহরণে অতিশয় পারদর্শী ও কর্ম্মঠ। উহারা প্রায় দুই তিন মিনিট কাল বারি-নিমগ্ন হইয়া থাকিতে পারে; কথিত আছে একজন কাফ্রিবালক প্রায় ছয় মিনিট জলে ডুবিয়া ছিল। এইরূপ প্রতিদিন শুক্তি ধৃত হইয়া থাকে। শুক্তিসমূহ সমুদ্রতীরে নীত হইলে, প্রত্যেক মহাজন স্বকীয় অংশ লইয়া দুই হস্ত পরিমিত গর্ত্তে উহাদিগকে নিক্ষেপ করে। উহা তথায় পচিতে থাকে ও সম্পূর্ণরূপে পচিলে পর, মুক্তা-শুক্তির আবরণ ছাড়াইয়া তন্মধ্যস্থিত মুক্তাফল বহিষ্কৃত করা হয়। কখন কখন শুক্তি সিদ্ধ করিতে হয়, কেননা সময়ে সময়ে মুক্তাফল শুক্তির গাত্রমধ্যেও পাওয়া যায়।

নৌকারোহী ও ডুবুরিরা ধনলাভাশয়ে ভক্ষণ করিয়া শুক্তি অপহরণ করে। ইহা জানিতে পারিয়া, এক্ষণে মহাজনেরা ঐ সকল ব্যক্তিকে রুদ্ধ করিয়া ভেদক দ্রব্য সেবন করান। এবং যদি তাহারা শুক্তি ভক্ষণ করিয়া থাকে, তবে মল হইতে মুক্তা সংগ্রহ করিয়া লন।

মুক্তা কেবল স্ত্রীলোকের শোভাবর্দ্ধন করে এমন নহে; আমাদের কবিরাজেরা "মুক্তাভস্ম"কে একটী প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য করেন! কিন্তু রসায়ন-বিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে মুক্তাভস্ম ও চূণে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, উভয়ই এক পদার্থ সংযোগে গঠিত এবং উভয়েরই গুণ এক প্রকার।

বঙ্গমহিলার স্বপ্ন।

১

কি স্বপন অনুপম গত নিশি হেরেছি,
কিবা সুখ অতুলন, প্রিয়সই পেয়েছি,
গভীরা যামিনী যবে,
নিদ্রায় আবৃত সবে,
নিদ্রা আবরিতা হয়ে জ্ঞানহীন হয়েছি,
কি স্বপন সে সময় প্রাণসই হেরেছি।

২

অপরূপ ধরি রূপ যেন কোন কামিনী
আসিল আমার কাছে তপ্ত-হেম-বরণী;
লাবণ্যের ছটা যত,
সই লো কহিব কত,
দেবাঙ্গনা হবে বুঝি ত্রিভুবন-মোহিনী!
হেন রূপ অপরূপ নাহি হেরি কামিনী।

৩

শয্যাপাশে মৃদুহাসে দাঁড়াইয়ে সুন্দরী
মৃদুল বচনে কন ধরি কর আমারি,
কি মধুর হাসি সেই,
মুকুতা দশন সই,
কিবা মরি! সুমধুর সে বচন তাহারি
মৃদুহাসে মৃদুভাষে কহিলেন সুন্দরী,—

৪

"বিচিত্র ভারতধাম খ্যাত এই ভুবনে—
মর্ত্তে সুরধাম জ্ঞান হয় হেরি নয়নে—
যাহার তনয়গণ,
নরশ্রেষ্ঠ অতুলন,

অতুল সৌন্দর্য্যরাশি যার শুনি শ্রবণে,
সেই ভারতের সুতা তুমি কিলো ললনে?

৫

"সাবিত্রী জানকী আদি কত শত রমণী—
বিরাজি ভারত মাঝে—যেন চারু নলিনী—
করিল অপূর্ব্ব শোভা,
সর্ব্বজন মনোলোভা,
হেন চমৎকার কভু নাহি হেরি না জানি;
সেই ভারতের কন্যা তুমি কি লো কামিনী?

৬

"ভারত ললনা-কুল রত্নময়-আকরে,—
যুধিষ্ঠির আদি সব জন্মিল যে জঠরে,—
যেই ভারতের সুতা,
সুবর্ণ চম্পকলতা,
পালিতেন সযতনে দেবঋষি যাহারে,
সেই কি ভারতাঙ্গনা হেরি আজি তোমারে?

৭

"কোথা সে কমলদ্যুতি চরাচর-মোহিনী,
কোথা সে মোহিনী মূর্ত্তি সর্ব্বমন-হারিণী
কেন ঘোর নিদ্রা ভরে,
আছ অজ্ঞান আঁধারে,—
কেন বা ঘেরিল আজি এই দুখযামিনী,
কোথা সে সুখেরি দিন আজি তব কামিনী?

৮

"হায় এ দুখের কথা কহিব বা কাহারে;—
ধিক্ লো তোমারে ধিক্, নাহি লাজ অন্তরে।
হইয়ে ভারতসুতা,
কেন মোহ-নিদ্রাযুতা,
আলস্য কলহে কেন দিবানিশি যাপ রে
ডুবালে ললনা নাম;—ধিক্ থাক তোমারে।

৯

"কর তবে গাত্রোত্থান নিদ্রাবেশ ত্যজিয়ে;
কেমনে রয়েছ আজি পূর্ব্ব কথা ভুলিয়ে।

আমি লো কহিব কত ;
পূর্ব্বের কাহিনী যত,
মরমে শরম কি লো নাহি হয় স্মরিয়ে ?
মোহাবেশে চিরদিন থাকিবে কি পড়িয়ে ?

১০

"অজ্ঞকার ভেদি, হের, জ্ঞান রবি উদিছে
আলোকি সকল দেশ এ ভারতে আসিছে ;
বিদ্যার মধুর গীত,
করি চিত পুলকিত,
জুড়ায়ে জগৎপ্রাণ গগনেতে উঠিছে,
'উঠ লো সকলে তোরা,' বারবার গাইছে।"

১১

এই বলি সে রমণী অকস্মাৎ লুকাল
দেখিতে দেখিতে সই অদর্শন হইল ;
ভাবিলাম পায়ে ধরি,
মিনতি তাঁহারে করি
থাকিতে ক্ষণেক আরো,—অনর্থ যে ঘটিল,
অধীরা হ'লেম সই নিদ্রা মোর ভাঙ্গিল।

স্বাস্থ্য-রক্ষা।

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাদি আলোচনা করিতে হইলে, যে সকল শারীরিক ক্রিয়ার দ্বারা জীবন রক্ষা হয়, তাহার বিষয় অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। নিঃশ্বাস, পান ও আহার, এই তিনটী শরীরের প্রধান ক্রিয়া, এবং ইহা বায়ু জল ও খাদ্য এই তিন প্রকার দ্রব্য দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ ক্রিয়ার মধ্যে কোন একটীর অভাব হইলেই জীবন নষ্ট হয়। বায়ুর অভাব হইলে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া অতি অল্প ক্ষণ মধ্যেই জীবের প্রাণ নষ্ট হয়, এই নিমিত্ত পৃথিবীর সকল স্থানেই বায়ুরাশি এত প্রচুর পরিমাণে ব্যাপিয়া আছে, যে জীব মাত্রকে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও উহার অভাব বোধ করিতে হয় না। জলাভাবে পিপাসা সহ্য করিয়াও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কাল

জীবিত থাকা যায় বলিয়া, বায়ুর অপেক্ষা জলের ভাগ অল্প দেখা যায়, এবং আহার অভাবে জীব তদপেক্ষাও অধিক কাল জীবিত থাকিতে পারে, এই নিমিত্ত আহারের দ্রব্য অধিক দুর্লভ এবং অপেক্ষাকৃত অধিক যত্নে সংগ্রহ করিতে হয়।

অতএব স্বাস্থ্য ভোগের প্রধান কারণ নির্ম্মল বায়ু, পরিষ্কার জল, ও সুস্থকর শরীর-পোষক-খাদ্য প্রভৃতি। এক্ষণে বায়ু ও জল প্রভৃতির গুণ কি, কি প্রকারেই বা তাহারা আমাদিগের জীবন-রক্ষার কারণ হইয়া থাকে, এবং কি নিয়মে ও কি অবস্থায় তাহারা ব্যবহার্য্য, এ সকল বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, আমাদিগের দেহ কি কি উপকরণে গঠিত, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অবগত হওয়া কর্ত্তব্য।

আমাদিগের শরীর অস্থি, মাংস, চর্ম্ম প্রভৃতি পদার্থে নির্ম্মিত। শরীরের সর্ব্বোপরি আচ্ছাদনকে চর্ম্ম বলে। ইহার দ্বারা স্পর্শ জ্ঞান জন্মে। ইহা বহুসংখ্যক সুক্ষ্ম ছিদ্র অর্থাৎ লোমকূপে পরিপূর্ণ, এবং এই সকল লোমকূপ দিয়া ঘর্ম্ম নির্গত হয়। চর্ম্মও যে পদার্থ, আমাদিগের নখ ও কেশও সেই পদার্থ, কেবল রূপান্তর মাত্র। চর্ম্মের মধ্যে এক প্রকার বর্ণময় পদার্থ আছে, যাহার দ্বারা, ঐ চর্ম্ম ব্যক্তি বিশেষে, কৃষ্ণ, শ্যাম গৌর বা শ্বেত বর্ণ হইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশবাসিদিগের চর্ম্ম সচরাচর শ্বেতবর্ণ, উষ্ণপ্রধান দেশবাসিদিগের কৃষ্ণবর্ণ ও সমশীতোষ্ণ দেশবাসিদিগের মিশ্রবর্ণ হইয়া থাকে। চর্ম্মের নিম্নে বসা নামে এক প্রকার তৈলাক্ত কোমল পদার্থ আছে, চলিত ভাষায় উহাকে চর্ব্বি বলে। উহা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের শরীরে অধিক পরিমাণে থাকে, এই নিমিত্ত স্ত্রীলোকের শরীর পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর কোমল পুষ্ট ও চিক্কণ। শরীর রুগ্ন হইলে বসার হ্রাস অপেক্ষাকৃত শীঘ্র ও অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে, এবং ইহারই অভাবে শরীর ক্ষীণ ও লাবণ্যহীন হইয়া যায়।

চর্ম্ম এবং বসার নিম্নে মাংস। মাংস কোমল ও রক্তবর্ণ, এবং অস্থির সহিত সংলগ্ন। ইহার প্রধান গুণ এই যে, ইহা টানিলে সহসা ছিঁড়িয়া যায় না। বহুসংখ্যক সুক্ষ্ম মাংসসূত্র একত্রিত হইয়া একটী

আমি লো কহিব কত ;
পূর্ব্বের কাহিনী যত,
মরমে শরম কি লো নাহি হয় স্মরিয়ে ?
মোহাবেশে চিরদিন থাকিবে কি পড়িয়ে ?

১০

" অন্ধকার ভেদি, হের, জ্ঞান রবি উদিছে
আলোকি সকল দেশ এ ভারতে আসিছে ;
বিদ্যার মধুর গীত,
করি চিত পুলকিত,
জুড়ায়ে জগৎপ্রাণ গগনেতে উঠিছে,
'উঠ লো সকলে তোরা,' বারবার গাইছে।"

১১

এই বলি সে রমণী অকস্মাৎ লুকাল
দেখিতে দেখিতে সই অদর্শন হইল ;
ভাবিলাম পায়ে ধরি,
মিনতি তাঁহারে করি
থাকিতে ক্ষণেক আরো,—অনর্থ যে ঘটিল,
অধীরা হ'লেম সই নিদ্রা মোর ভাঙ্গিল।

স্বাস্থ্য-রক্ষা।

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাদি আলোচনা করিতে হইলে, যে সকল শারীরিক ক্রিয়ার দ্বারা জীবন রক্ষা হয়, তাহার বিষয় অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। নিঃশ্বাস, পান ও আহার, এই তিনটী শরীরের প্রধান ক্রিয়া, এবং ইহা বায়ু জল ও খাদ্য এই তিন প্রকার দ্রব্য দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ ক্রিয়ার মধ্যে কোন একটীর অভাব হইলেই জীবন নষ্ট হয়। বায়ুর অভাব হইলে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া অতি অল্প ক্ষণ মধ্যেই জীবের প্রাণ নষ্ট হয়, এই নিমিত্ত পৃথিবীর সকল স্থানেই বায়ুরাশি এত প্রচুর পরিমাণে ব্যাপিয়া আছে, যে জীব মাত্রকে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও উহার অভাব বোধ করিতে হয় না। জলাভাবে পিপাসা সহ্য করিয়াও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কাল

জীবিত থাকা যায় বলিয়া, বায়ুর অপেক্ষা জলের ভাগ অল্প দেখা যায়, এবং আহার অভাবে জীব তদপেক্ষাও অধিক কাল জীবিত থাকিতে পারে, এই নিমিত্ত আহারের দ্রব্য অধিক দুর্লভ এবং অপেক্ষাকৃত অধিক যত্নে সংগ্রহ করিতে হয়।

অতএব স্বাস্থ্য ভোগের প্রধান কারণ নির্ম্মল বায়ু, পরিষ্কার জল, ও সুস্থকর শরীর-পোষক-খাদ্য প্রভৃতি। এক্ষণে বায়ু ও জল প্রভৃতির গুণ কি, কি প্রকারেই বা তাহারা আমাদিগের জীবন-রক্ষার কারণ হইয়া থাকে, এবং কি নিয়মে ও কি অবস্থায় তাহারা ব্যবহার্য্য, এ সকল বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, আমাদিগের দেহ কি কি উপকরণে গঠিত, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অবগত হওয়া কর্ত্তব্য।

আমাদিগের শরীর অস্থি, মাংস, চর্ম্ম প্রভৃতি পদার্থে নির্ম্মিত। শরীরের সর্ব্বোপরি আচ্ছাদনকে চর্ম্ম বলে। ইহার দ্বারা স্পর্শ জ্ঞান জন্মে। ইহা বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম ছিদ্র অর্থাৎ লোমকূপে পরিপূর্ণ, এবং এই সকল লোমকূপ দিয়া ঘর্ম্ম নির্গত হয়। চর্ম্মও যে পদার্থ, আমাদিগের নখ ও কেশও সেই পদার্থ, কেবল রূপান্তর মাত্র। চর্ম্মের মধ্যে এক প্রকার বর্ণময় পদার্থ আছে, যাহার দ্বারা, ঐ চর্ম্ম ব্যক্তি বিশেষে, কৃষ্ণ, শ্যাম গৌর বা শ্বেত বর্ণ হইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশবাসিদিগের চর্ম্ম সচরাচর শ্বেতবর্ণ, উষ্ণপ্রধান দেশবাসিদিগের কৃষ্ণবর্ণ ও সমশীতোষ্ণ দেশবাসিদিগের মিশ্রবর্ণ হইয়া থাকে। চর্ম্মের নিম্নে বসা নামে এক প্রকার তৈলাক্ত কোমল পদার্থ আছে, চলিত ভাষায় উহাকে চর্ব্বি বলে। উহা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের শরীরে অধিক পরিমাণে থাকে, এই নিমিত্ত স্ত্রীলোকের শরীর পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর কোমল পুষ্ট ও চিক্কণ। শরীর রুগ্ন হইলে বসার হ্রাস অপেক্ষাকৃত শীঘ্র ও অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে, এবং ইহারই অভাবে শরীর ক্ষীণ ও লাবণ্যহীন হইয়া যায়।

চর্ম্ম এবং বসার নিম্নে মাংস। মাংস কোমল ও রক্তবর্ণ, এবং অস্থির সহিত সংলগ্ন। ইহার প্রধান গুণ এই যে, ইহা টানিলে সহসা ছিঁড়িয়া যায় না। বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম মাংসসূত্র একত্রিত হইয়া একটী

অপরূপ রূপ হেরি কিবা মন ভুলিল।
খচিত হীরকাসনে
শোভিত রজতবর্ণে
মাঝে মাঝে তারাগণ কিবা শোভা দিতেছে।
আহা মরি বিভাবরী
বসিয়ে পৃথিবী'পরি
মানবের মনধনে একেবারে মোহিছে।
শুভ্র বাস দেহে পরি
ধরাতল শুভ্র করি,
নাচি নাচি সকলের ক্রোড়োপরে বসিছে।
আদরেতে অঙ্গে স্থান
করিতেছে আহবান
পাইয়া সুখরজনী সকলেতে মেতেছে।
শ্যামল বসনোপরি,
কত মণি সারি সারি,
সাজায়েছ তুমি ধনি, কিবা শোভা দিতেছে।
কি রূপ ধরেছ ধনি
চন্দ্র আদি তারাগুনি
ধীরে ধীরে সমীরণ তালে তালে নাচিছে।
মাঝে মাঝে পাখিগণ
করিতেছে জাগরণ
কোকিলের কুহু ধ্বনি কর্ণে সুখ দিতেছে।
দেখিতেছি কি সুন্দর
জগজন মনোহর
রজনী গো নিজ রূপ কি মোহিত করেছে।
মৃদু মন্দ সমীরণ
বহিতেছে অনুক্ষণ
পত্রের মধুর শব্দ কিবা মিষ্ট লাগিছে।
সন্তপ্ত হৃদয় যারা
তোমার করেতে তারা
হৃদয় অনল সব একেবারে নাশিছে।
হৃদয়ের তাপ যত
তোমার কিরণে স্বতঃ
ক্রমে ক্রমে শীত সেথা অনুভব করিছে।

তোমার কোমল করে
মলিনতা দূর করে
হাসি হাসি রজনী কি সুখ দাও অন্তরে।
প্রফুল্ল কুসুমসম
হেরিতেছি নিরুপম
তোমার তুলনা ধনি, দিব বল কাহারে।
কিবা শোভা নিরমল
নিজ রূপে ঢল ঢল
চন্দ্রের কিরণে আরো রূপবতী হয়েছ।
পশু পক্ষী আদি যত
সকলেতে হরষিত
তোমারে পেয়ে যামিনী পুলকিত রয়েছ।
হেরে তোমারি মহিমা
পাসরি নিজ গরিমা,
সমীর বহিছে ধীরে লুকায়ে আছে অশনি।
প্রবল জলদ যারা
হয়ে অনুগত তারা
অদূরে দাঁড়ায়ে আছে হাসিতেছে সৌদামিনী।
যত দেখি তরুগণ
হয়ে যেন এক মন
চামর ঢুলিছে সবে হেন মনে অনুমানি।
চৌদিকে প্রাসাদ যত
সবে প্রহরীর মত
সম্মুখে দাঁড়ায়ে তব সুধাকর-বিলাসিনী।
নগরনিবাসিগণ
আনন্দে মগন মন
কৌতুক করিছে কত তোমারে পেয়ে যামিনী।
কোথাও বীণার তান
কোথাও কবির গান
কোথাও নাচিছে নটী হেরিছে পুরকামিনী।
মিলিয়া বন্ধুবান্ধবে
কোথাও হাসিছে সবে

কোথাও শাস্ত্রের কথা—কোথাও সেবে বারুণী।
কেহ বা বিরলে বসি
প্রেয়সীর মুখশশী
হেরিছে নয়ন ভরি,—কোথাও প্রিয়া মানিনী।
ভাবিতেছে অনুক্ষণ
কবে বা হবে এমন
নাথের সহিত আমি হেরিব তোরে রজনী।
তোমার রূপেতে ধনি
হৃদয়ে জলে আগুনি
একান্ত হেরিতে নারি সুধাকর—বিলাসিনী।
দুঃখ যত এ জগতে
সব পারি পাসরিতে
নিরবধি থাকি যদি তব মুখ নিরখিয়া।
তুমিত এখনি ধনি
গমন করিবে শুনি
তব অদর্শনে যাবে মম হৃদয় ভেদিয়া।
কোথা ওহে ভগবান
তুমি সর্ব্ব শক্তিমান
তব এ ভবের ভাব বুঝিতে না পারিনু।
এই প্রভু ভিক্ষা চাই,
ও চরণে স্থান পাই,
একমনে নিবেদন শ্রীচরণে করিনু।

শ্রীমতী——সর্ব্বাধিকারিণী।

☞ স্থানাভাব প্রযুক্ত অন্যান্য রচনা এবার প্রকাশিত হইল না।

সংবাদসার।

কোন সন্ন্যাসী বলিয়াছেন, আফুলা বেলের শিকড় এবং লঙ্কাগাছের শিকড় ও পাতা সর্পদংশনের উত্তম ঔষধ। পরীক্ষা করা আবশ্যক।

ঢাকা ও ফরিদপুর জেলায় মৎস্যে এক প্রকার কীট হইয়াছে, এই আশঙ্কায় সকলে মৎস্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। কলিকাতায়ও অনেকে মৎস্য ত্যাগ করিয়াছেন। জনরব মৎস্যের শরীরে বসন্ত হইয়াছে। এস্থলে মৎস্য আহারে ঘৃণা হইতে পারে, কিন্তু ডাক্তারেরা বলেন, ইহাতে কোন অনিষ্ট সম্ভবে না।

বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ সংস্কার।

যে দেশে স্ত্রীলোকেরা সকল বিষয়ে পুরুষদিগের অধীন, যেখানে রমণীগণ কোন বিষয়ে স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করিতে সক্ষম নহে, সে দেশে পুরুষদিগের অপেক্ষা বামাগণের অবস্থা কোন অংশে উত্তম হইতে পারে না। বিশেষতঃ, স্বেচ্ছাধীন পুরুষগণ যদি আপন আপন উন্নতি সাধনে যত্নশীল না হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক স্ত্রীলোকদিগের যে বিশেষ মঙ্গল সাধন হইবে, ইহা আমাদিগের প্রতীতি হয় না। যাঁহাদিগের উপর নারীগণের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে, তাঁহারা যদি স্বার্থপর হইয়া বামাগণের স্বেচ্ছাধীনতা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন, তাহা হইলে স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি বিষয়ে হতাশ হইতে হইবে।

আমাদিগের দেশে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতির মধ্যে অনেক বৈষম্য দেখা যায়। পুরুষেরা স্বাধীন, সুতরাং যথায় ইচ্ছা তথায় গমন করিতে পারেন, এবং যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে সক্ষম, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের এরূপ ক্ষমতা নাই। এখানে স্ত্রীলোকেরা স্বাধীনতা কাহাকে বলে তাহা কিছুমাত্র অবগত নহেন। পুরুষদিগের উপর ইহাদিগকে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইতেছে, সুতরাং এরূপ অবস্থাতে পুরুষেরা যদি স্ত্রীলোকদিগের বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা না করেন, যদি তাঁহারা স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া রমণীগণের মঙ্গল সাধনে যত্নবান না হয়েন, তাহা হইলে আমাদিগের দেশের বামাগণের অবস্থা যে ভাল হইবে, ইহা আশা করা যায় না। বিশেষতঃ, যখন দেখা যাইতেছে যে, পুরুষেরা আপনাদিগের বিষয়েই সাতিশয় অবহেলা প্রকাশ করিতেছেন, তখন তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগের বিষয়ে যে মনোযোগ করিবেন, ইহা কোন প্রকারে সম্ভব নহে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমাদিগের দেশের পুরুষেরা শরীরের প্রতি নিতান্ত ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদিগের নানাবিধ সুবিধা সত্ত্বেও তাঁহারা আলস্যের বশবর্ত্তী হইয়া স্বাস্থ্যপ্রদ

শ্রমসাধ্য কোন কর্ম্মে হস্তার্পণ করিতে সহজে স্বীকার করেন না। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের স্বাস্থ্যরক্ষা দূরে থাকুক, তাহাদের ও পক্ষে কোন প্রকার সুবিধাই দেখিতে পাওয়া যায় না। নবম বা দশম বর্ষ হইতে প্রৌঢ়াবস্থা পর্য্যন্ত আমাদিগের বামাগণ অন্তঃপুর মধ্যে বদ্ধ থাকেন। কাহারও স্বীয় ভবনের বহির্ভূত হইবার ক্ষমতা থাকে না, সুতরাং তাহাদিগের সকল কার্য্যই অন্তঃপুর মধ্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এতাদৃশ সঙ্কীর্ণ স্থান মধ্যে বাস করিয়া যাহাদিগকে চিরজীবন অতিবাহিত করিতে হয়, স্বাস্থ্যরক্ষা তাহাদিগের পক্ষে তাদৃশ সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। স্বাভাবিক, নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া, যথেচ্ছবিহরণ বা একস্থানে উপবেশনজনিত ক্লেশ অপনোদন করিবার নিমিত্ত, সুশীতল বায়ু সেবন প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি যাহাদিগের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, তাহারা কিরূপে সুস্থশরীরা ও বলবতী হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বাস্তবিক আমাদিগের পুরুষেরা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করিবার অনেক সুবিধা পান। স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় তাঁহাদিগকে এক স্থানে বদ্ধ থাকিতে হয় না। তাঁহারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রবাত স্থলে গমন করিয়া সুখসেব্য মরুৎসেবন করিতে পারেন, এবং এক স্থানে শয়ন বা উপবেশন করিয়া যে দারুণ ক্লেশ উৎপন্ন হয়, তাহা তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হয় না; সুতরাং বলপ্রদ ব্যায়াম কার্য্যে নিযুক্ত না হইলেও তাঁহাদিগের স্বাস্থ্যের তাদৃশ ক্ষতি হইতে পারে না। কিন্তু আমাদিগের অঙ্গনাগণের শোচনীয় অবস্থা চিন্তা করিলে অসীম দুঃখ উপস্থিত হয়। পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় ইহাদিগের ইচ্ছাধীন কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা নাই। ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা হইলে ইহাদিগকে সে ইচ্ছা সংযমিত করিতে হইবে। এই রূপে একদিন নয়, যাবজ্জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। হস্ত পদাদির সম্যক সঞ্চালন ক্রিয়া একেবারে রোধ করিতে হইবে। অধিক কি, যে সকল ক্রিয়াদ্বারা স্বাস্থ্যলাভ করা যাইতে পারে, তাহা হইতে ইহাদিগকে বিরত হইতে হইবে, সুতরাং এতাদৃশ অত্যাচার করিলে কিরূপে যে ইহা-

দিগের শরীরের উন্নতি সাধন হইবে, তাহা আমরা সবিশেষ বুঝিতে পারি না।

কেহ বলিতে পারেন যে, আমাদের স্ত্রীলোকদিগের গৃহকর্ম্ম হইতে অনেক উপকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা। ইঁহাদের মতে রন্ধন, শয্যারচন, গৃহসম্মার্জ্জন প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি যথানিয়মে সম্পাদন করিলে স্ত্রীলোকেরা যথেষ্ট বল ও স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারেন। আমরা এ মত সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিতে পারি না। রন্ধনকার্য্যাদি করিলে যথেষ্ট পরিমাণে শারীরিক পরিশ্রম হইবে তাহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু ধূমময় পাকগৃহে উপবেশন করিয়া প্রতিনিয়ত রন্ধন করিতে হইলে নিরতিশয় ক্লেশানুভব হয়। যাঁহারা এইরূপ রন্ধন করিয়া থাকেন এই ক্লেশ তাঁহাদিগের অবিদিত নাই। যদি রন্ধন সমাধার পরেও তাহারা স্বচ্ছন্দে বিহার বা বিশুদ্ধ বায়ুসেবন করিতে পারিতেন, তাহা হইলেও পাকগৃহের অনেক ক্লেশ দূর হইতে পারিত। কিন্তু ইহা-দিগের তাহা করিবার ক্ষমতা নাই। পাকগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ইহাদিগকে শয়ন বা উপবেশনে কালক্ষেপ করিতে হয়। কেহ বা ঐ সময় আবদ্ধ প্রাঙ্গণে বিচরণ করিয়াই কথঞ্চিৎ অবসান করেন। গৃহকার্য্য এইরূপে সমাধা করিতে হয় বলিয়া আমাদিগের রমণী-দিগকে শারীরিক স্বাস্থ্যে জলাঞ্জলি দিতে হইতেছে।

আমরা পূর্ব্বে পুরুষদিগের ব্যায়াম বিষয়ে যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহার অধিকাংশই স্ত্রীলোকদিগের প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয়েরই শারীরিক উন্নতি সাধনে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। ব্যায়াম প্রভৃতি ক্রিয়া উভয়ের পক্ষেই সমানরূপে আবশ্যক। (তবে উভয়কে যে এক প্রকার ব্যায়াম করিতে হইবে তাহা আমরা বলিতেছি না।) পুরুষদিগকে কঠিন পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া তাঁহারাই যে কেবল শরীরের প্রতি মনোযোগ করিবেন, ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। বস্তুতঃ, উভয়েরই শরীর এক নিয়মের বশবর্ত্তী। পুরুষই যে কেবল শরীর চালনা করিবে, ইহা সঙ্গত বোধ হয় না। পুরুষদিগের ব্যায়াম অভাবে যদি শরীরের ক্ষতি হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকদিগেরও সেই কারণে শরীর

নষ্ট হইতে পারে। পুরুষদিগের শরীর যেরূপ মাংস, অস্থি, শোনিত, পেশ প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা নির্ম্মিত, স্ত্রীলোকদিগের শরীরও সেই রূপ পদার্থে নির্ম্মিত। পুরুষদিগের মাংসাস্থি প্রভৃতি দ্রব্যগুলির পুষ্টির নিমিত্ত শরীর চালনা যেরূপ প্রয়োজনীয়, স্ত্রীলোকদিগেরও সেইরূপ। সুতরাং স্ত্রীলোকদিগের শরীরপুষ্টি যদি স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে পুরুষদিগের শরীরপুষ্টিও ব্যায়াম সাপেক্ষ নহে। বাস্তবিক চিকিৎসা শাস্ত্রের দ্বারা সম্যকরূপে অবগত হওয়া যাইতে পারে যে, স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই শারীরিক পুষ্টি ও স্বাস্থ্য শারীরিক শ্রমাপেক্ষ। আমরা স্ত্রীলোকদিগকে বহুকাল হইতে অবরোধ মধ্যে রাখি বলিয়া, বর্ত্তমানে তাহাদিগের ব্যায়াম শিক্ষায় আমরা আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকি; যদি আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা ইউরোপীয় প্রভৃতি সভ্য দেশের রমণীদিগের ন্যায় বাহিরে আসিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমরা ব্যায়াম বিষয়ে কোন আপত্তি করিতাম না। ইউরোপ ও আমেরিকার মহিলাগণ কত প্রকার স্বাস্থ্যকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। তাঁহাদিগের অনেকেই অশ্বারোহণ করিতে পারেন। যাঁহারা অশ্বারোহণ করিতে না পারেন, তাঁহাদিগের কেহ বা নৌকারোহণ, কেহ বা পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

এইরূপ ক্রিয়াগুলি যথানিয়মে সম্পাদন করাতে ইউরোপ মহিলাগণ আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা অধিকতর বলবতী হইয়া থাকেন। এই কারণ বশতই, তাঁহারা অধিক দিবস জীবিত থাকেন, এবং তাঁহাদিগের নিজ শরীর সুস্থ বলিয়া তাঁহারা সুস্থ ও বলিষ্ঠ সন্তান সন্ততি প্রসব করেন। কিন্তু আমাদিগের দেশে কোন প্রকার ব্যায়াম ক্রিয়া প্রচলিত নাই, সুতরাং আমাদিগের রমণীগণ সাতিশয় রুগ্ন ও বলহীন হইয়া থাকেন এবং ইহাদিগের জরা শীঘ্র উপস্থিত হইয়া থাকে। আর, ইহার প্রতিফল যে কেবল ইহারাই ভোগ করেন এমন নহে, ইহাদিগের সন্তান সন্ততিও জননীর দৌর্ব্বল্যের উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে।

আমরা উপরে যাহা কিছু বলিলাম, তাহা নগরবাসিনীদিগের প্রতি বিশেষরূপেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকেরা নগরবাসিনীদিগের অপেক্ষা অধিক শারীরিক পরিশ্রম করিয়া থাকেন। তাঁহারা শেষোক্তদিগের ন্যায় কেবল অন্তঃপুর মধ্যে বদ্ধ থাকেন না, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের বাটীতে গমনাগমন করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্বয়ং কলস লইয়া পুষ্করিণী হইতে জল আনয়ন করেন, অবসর কালে উদ্যানের বৃক্ষতলে জলসেক করিয়া থাকেন, কেহ বা সন্তরণ প্রভৃতি সন্তোষকর ব্যায়াম দ্বারা চিত্তের আনন্দ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, ও ক্ষেত্রের শস্যাদি উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত নিতান্ত ক্লেশ স্বীকার করেন। সন্ধ্যাসমীরণ সেবন করিবার তাঁহাদিগের যাদৃশ সুবিধা, নগরবাসিনীগণের তাদৃশ নহে। নগরবাসিনীগণ একস্থানে উপবেশন করিয়া সামান্য পুস্তক পাঠে বা সূচিকর্ম্মে,বৃথা গল্পে বা সম্পূর্ণ অলসভাবে প্রায় সকল দিন অতিবাহন করেন। ইঁহাদিগের প্রায় সকল কার্য্যই দাস দাসীর দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং ইঁহারা বিলাসবশেই সময় নষ্ট করেন। যদি ইঁহারা গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন, আর গৃহকর্ম্ম শেষ হইলে অন্যান্য স্বাস্থ্যকর কর্ম্মে রত হন,তাহা হইলেও ইঁহাদিগের শরীর কিঞ্চিৎ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতে পারে। যাঁহাদিগের বাটীর সীমানার মধ্যে উদ্যান আছে, তাঁহাদিগের উচিত বৃক্ষরোপণ, জলসিঞ্চন প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি সুনিয়মে সমাধা করেন। যাঁহাদিগের সেরূপ নাই, তাঁহারা প্রাঙ্গণের মধ্যে কতক পরিমাণেও বৃক্ষাদি রোপণ করিতে পারেন। তাঁহারা ক্রীড়াচ্ছলে সন্তানদিগের সহিত ইতস্ততঃ বিচরণ করিলেও অঙ্গের চালনা হইতে পারে। একস্থানে উপবেশন করিয়া তাঁহারা যে স্বাস্থ্যলাভ করিবেন,পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অঙ্গচালনায় তাহা অপেক্ষা অধিক লাভ করিতে অবশ্যই পারিবেন। পল্লীগ্রামবাসিনীগণ এইরূপ করেন বলিয়া তাঁহারা নগরবাসিনীদিগের অপেক্ষা অধিক বলবতী, ও সুস্থশরীরা হয়েন। নগরবাসিনীগণ কাচনির্ম্মিত গৃহ মধ্যে রোপিত বৃক্ষের ন্যায় ম্লান হইয়া যান, কিন্তু পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকেরা বনলতার ন্যায় প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দেখা যাইতেছে যে, আমাদিগের দেশের কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ উভয়েই শরীরের প্রতি উপযুক্ত পরিমাণে যত্ন প্রকাশ করেন না। এক্ষণে দেখা যাউক আমাদিগের নৈতিক শিক্ষা কি প্রণালীতে সম্পাদিত হইতেছে।

সকলেই অবগত আছেন যে, বাল্যাবস্থা হইতে নীতিশিক্ষা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সদুপদেশ জীবনের প্রথম কালে যাদৃশ দৃঢ়বদ্ধ হইবে, অন্য কোন কালে তাদৃশ হইবে না। সকল বিষয়ের বীজ শৈশবাবস্থায় রোপণ করিলে সুন্দর ফল উৎপন্ন হইবে, কিন্তু আমাদিগের অদৃষ্টে তাহা ঘটিয়া উঠে না। পিতামাতারা সন্তানদিগকে পাঠ করিতে আদেশ করেন, কিন্তু সদসৎ বিষয়ে বিচার শিক্ষা কিছুই দেন না। তাঁহাদিগের মনে বিশ্বাস আছে যে, বালক বালিকাগণ লিখিতে বা পড়িতে শিখিলেই সকল বিষয় শিক্ষা হইল। তাঁহারা ইহা চিন্তা করেন না যে, কোমলমতি শিশু পুস্তক পাঠ করিয়া নীতিবিষয়ক জ্ঞান আহরণ করিতে সক্ষম হইবে না। তাঁহারা পুত্র বা কন্যার হস্তে পুস্তক দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন। ইহাতে নীতিশিক্ষা কি পরিমাণে আহৃত হইবে তাহা তাঁহারা ভ্রমেও ভাবেন না। এইরূপে অবহেলা প্রযুক্ত অধুনা আমাদিগের দেশের লোকদিগের নৈতিক বন্ধন নিতান্ত শিথিল হইতেছে। বয়োবৃদ্ধি সহকারে অস্মদ্দেশীয় অধিকাংশ যুবকগণ যে জঘন্যভাব ধারণ করিয়া থাকেন, তাহা দেখিয়াও যে জনকজননীগণ তাহাদের নীতিশিক্ষা বিষয়ে কিছুই মনোযোগ করেন না, ইহা নিতান্ত শোচনীয় বলিতে হইবে। এই নিমিত্ত আমরা অনুরোধ করিতেছি যে শৈশব হইতেই পিতামাতারা সন্তানদিগের নীতিবিষয়ে যত্ন প্রকাশ করেন।

শাসন-প্রণালী।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে শাসন-প্রণালী দুইটী প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—রাজতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্র। রাজতন্ত্র পুনরায় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) কোন কোন রাজ্যে রাজার অখণ্ডনীয় প্রভাব দৃষ্ট হয়, তাঁহার যাদৃশ ইচ্ছা তিনি সেই প্রকার কার্য্য করিতে পারেন, আপনার রাজ্য মধ্যে তাঁহারই আজ্ঞা সকলের শিরোধার্য্য, কেহই তাঁহার ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য করিতে পারে না; সঙ্ক্ষেপতঃ, তিনিই সেই রাজ্যের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। তিনি যখন যাহা আজ্ঞা করিবেন, ন্যায়ই হউক বা অন্যায়ই হউক, সাধারণের হিতসাধক হউক বা অহিতসাধক হউক, প্রজাগণ কর্ত্তৃক তাহা তৎক্ষণাৎ অবশ্য প্রতিপাল্য; নতুবা রাজার ইচ্ছানুরূপে তাহাদিগকে দণ্ডপ্রদান করিতে পারেন। এই প্রকার শাসন-প্রণালীকে একাধিপত্য কহে।

(২) অপর কতিপয় রাজশাসিত প্রদেশে রাজার এতাদৃশ আজ্ঞা করিবার বা দণ্ড দিবার ক্ষমতা দৃশ্য হয় না। তথায় অমাত্যবর্গ ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ একত্র হইয়া রাজ্য শাসন করিতে থাকে; তাঁহার কেবল এই মাত্র প্রভুত্ব যে, তাঁহার সম্মতি ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই হইতে পারে না। ইহারা সকলে কতকগুলি নিয়ম প্রস্তুত করিলে, রাজা যদি তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনিও তাহা উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন না। এবং দণ্ড দিবারও এবম্বিধ রাজার কোন অধিকার নাই। বিশেষ বিশেষ দোষের বিশেষ বিশেষ দণ্ড কর্ম্মচারিগণ নির্দ্ধারিত করিয়া দেয় এবং সেই দণ্ড প্রদানের নিমিত্ত কতকগুলি অপর কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হয়। এই প্রকার শাসন-প্রণালীকে মিশ্ররাজতন্ত্র কহে।

উপর্য্যুক্ত দুইটী প্রণালীর মধ্যে দ্বিতীয়টী যে সকলাংশে উৎকৃষ্ট, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। প্রথমোক্ত রাজার মন্ত্রীত্বপদে যাহারা অভিষিক্ত হয়, তাহাদের কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষমতা থাকে না; তাহারা রাজাকে অসৎপথ হইতে সৎপথে লইয়া যাইতে পারে না; রাজার উপর তাহারা কণামাত্র আধিপত্য প্রকাশ করিতে পারে না! বস্তুতঃ, তাহাদিগকে মন্ত্রীর পরিবর্ত্তে রাজার প্রধান পারিষদবর্গ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রাজা যদি রাজকার্য্য স্বয়ং চালনা করেন, তাহারা

সকলেই নিস্তেজ হইয়া প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করতঃ তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধনার্থ সচেষ্ট হয়। তাঁহার আজ্ঞা অন্যায় বা ন্যায়, ইহা বিচার করিবার তাহাদিগের অধিকার নাই। কিন্তু তিনি যদি ইন্দ্রিয়াদির বশীভূত হইয়া বা বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত রাজকার্য্যে বিমুখ হয়েন, তাহা হইলে ইহারা তাঁহার ন্যায় যদিচ্ছা আধিপত্য করিতে থাকেন। মন্ত্রীর প্রকৃত কার্য্য কাহাকে বলে, তাহা ইহাদিগের মধ্যে কেহই জানে না। বস্তুতঃ জানিবার কোন সম্ভাবনাও নাই। ইহারা অসীম ক্ষমতাপন্ন প্রভুর দাসত্ব করে;—প্রভু মনে করিলেই নিমেষের মধ্যেই ইহাদিগের প্রাণদণ্ড করিতে পারেন; সুতরাং প্রজাবর্গের হিত অপেক্ষা ইহারা প্রভুর মনস্তুষ্টি বিষয়ে অধিক যত্ন করিতে থাকে। মিশ্ররাজতন্ত্রের প্রধান লাভ এই যে, রাজার অধিক ক্ষমতা নাই। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, মন্ত্রীবর্গ অত্যাচার করিলে প্রজাদিগকে কে রক্ষা করিবে, তাহার উত্তর এই যে, একজন হইতে অত্যাচারের যতদূর সম্ভাবনা, বহুসংখ্যক ব্যক্তি হইতে ততদূর সম্ভাবনা নাই। দশজন মন্ত্রীর পাঁচ জন মন্দ হইলে, অপর পাঁচ জন উত্তম হইতে পারে এবং সেই উত্তম পাঁচ জন কর্ত্তৃক অনেক উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু যেখানে এক রাজার উপর সমস্ত ভার অর্পিত আছে, সেখানে রাজা মন্দ হইলে আর কে প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে পারে? আরও প্রভেদ এই যে, রাজা উত্তম হইলেও মতিভ্রম বশতঃ অন্যায় কর্ম্ম করিতে পারেন, কিন্তু মিশ্ররাজতন্ত্রে একজনের ভ্রম উপস্থিত হইলে অপরের দ্বারা সেই ভ্রম সংশোধিত হইতে পারে।

মিশ্ররাজতন্ত্রকে পুনরায় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) কোন কোন দেশে রাজা দেশের কতিপয় প্রধান প্রধান লোক মনোনীত করিয়া তাহাদের সাহায্যে রাজ্যশাসন করেন। (২) অপর কতিপয় দেশে প্রজাবর্গ আপনাদিগের মধ্য হইতে কতিপয় লোককে মনোনীত করিয়া দেয়, এবং রাজা ইহাদিগের সাহায্যে কার্য্য করিতে থাকেন।

যে দেশে রাজা নাই, কেবল প্রজাবর্গের মনোনীত ব্যক্তিগণ শাসন-

কার্য্য সমাধা করে, তাহাকে সাধারণতন্ত্র কহে। সেই প্রজাগণ কর্ত্তৃক মনোনীত ব্যক্তিগণ, সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য, আপনাদিগের মধ্য হইতে একজনকে সর্ব্বপ্রধান করিয়া থাকেন। ইনি অধ্যক্ষ বলিয়া বিখ্যাত। কোন কোন দেশে প্রতিবৎসর নূতন নূতন অধ্যক্ষ মনোনীত হয়, অপর কোন কোন দেশে দুই, তিন, বা অধিক বৎসর অন্তর হইয়া থাকে। মিশ্ররাজতন্ত্রের রাজার যেরূপ স্বল্প ক্ষমতা, সাধারণতন্ত্রের অধ্যক্ষেরও সেইরূপ স্বল্প ক্ষমতা। প্রভেদ এই যে, রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র পৌত্র ইত্যাদি রাজা হয়েন, কিন্তু অধ্যক্ষের মৃত্যু বা কর্ম্মাবসানের পর, তাঁহার পুত্র বা পৌত্রের সেই পদে কোন অধিকার থাকে না; অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ যাহাকে মনোনীত করে, সেই অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ, স্পেন, ইটালি, পর্টুগাল, রুশিয়া, প্রুসিয়া, তুর্ক, চীন, আফগানস্থান, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশসমূহ রাজা দ্বারা শাসিত; এবং হলণ্ড, ফ্রান্স, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স প্রভৃতি দেশে সাধারণতন্ত্র প্রণালী চলিত। স্পার্টা নামক গ্রীসদেশের এক নগরে পুরাকালে দুই জন রাজা রাজকার্য্য করিতেন, কিন্তু বর্ত্তমানকালে এরূপ প্রায় দৃষ্ট হয় না; কেবল একবার ইংলণ্ডে উইলিয়ম এবং তাঁহার স্ত্রী মেরি এককালে রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

জানকী।

তোমার ভারতী সতি! কেন মনে পড়িল;
ভাবিতে ভাবিতে মরি, হৃদয় আকুল করি
অনিমেষ দুনয়নে বারিধারা ঝরিল;
কেন স্মৃতি সেই কথা পুনঃ হৃদে তুলিল।
অপূর্ব্ব কাহিনী তব, চিরদিন অভিনব,
পবিত্র চরিতে তব নীতিরত্ন ভাসিল;
হেরি সে কোমল দ্যুতি মনঃ প্রাণ মোহিল।

সংসার-সরসী-জলে, রমণী-কমল-দলে,
কণ্টক-বিহীন-বৃন্তে বিকসিত হইলে;
ধরি শোভা নিরুপম, ঘুচায়ে হৃদয়তমঃ
সদ্গুণ-সৌরভে সতি, ত্রিভুবন পূরিলে।
তব প্রসূ বসুন্ধরা, রূপগুণে মনোহরা,
তেঁই সর্ব্ব-গুণান্বিতা ধৃতিমতি সুশীলে!
জনক মিথিলারাজে স্নেহে তাত বলিলে।

শাপ-ভ্রষ্টা নারী তুমি উজলি ভারতভূমি
রাখিলে অক্ষয় নাম অনন্ত সঙ্গীত-ধাম,
যেই চারুগাথাগানে কবিগুরু জীবিত;
'রামায়ণ' সুধার্ণব ভব-মরু-বাহিত!
নবনী-নিছিত অঙ্গ, তাহাতে হরিদ্রা রঙ্গ,
রকত-কুমুদ জিনি সুবদন শোভিত;
ভ্রমর-চিকুরাবলী ঝাঁকে ঝাঁকে কুতূহলী
চরণ-কমল আশে নতমুখে ধাবিত;
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি হৃদয়-ঋজুতা মাখি
অকপট ভাব ধরি মরি কিবা বিনীত;
কামধনু যুগ ভুরু মধ্যভাগ তাহে গুরু
নাসিকা বন্ধনী সম মুকুতায় ভূষিত;
অধর যুগল মরি, গুলাবের রূপ ধরি
ত্রিদিবের সুধা হরি দেবকুল-দয়িত।
হায়! হেন নারী কেন এ ভুবনে উদিত!

কহ অয়ি চারুশীলে! ত্রিজগত-মোহিনি!
কোন্ পুণ্যবলে ধরা, পাপতাপে তনু জরা,
প্রসবিল নারীরত্ন মুনি-মনোহারিণী।
যৌবন-আগমে সতি, লভি মনোমত পতি,
মহাবীর দাশরথী, হ'লে তার কামিনী;

সূর্য্য-বংশে অবতংস রাম নারায়ণ-অংশ
অযোধ্যা-নগরী যাঁর জন্মে খ্যাত মেদিনী;
যাঁর গুণগানে মত্ত সরযূ যে তটিনী।

হেন পতিভাগ্য যার হ'য়ে যুবরাজ-দার
নাথ-সনে সিংহাসনে বড় সাধ আছিল;
হইবারে রাজ্যেশ্বরী হৃদয়ে বাসনা করি
আনন্দ-লহরী চিত বিচলিত করিল;
বিধির বিপাকে কিন্তু বিপরীত ঘটিল।
কোথা স্বর্ণ-সিংহাসন, কোথা বন উপবন,
কনক পালঙ্ক কোথা—ক্ষিতি-শয্যা হইল।
কোথা দাস দাসী সেবে একাকিনী কোথা এবে
কোথা রাজ-অন্তঃপুর—রবিকর দহিল।
কোথা হেমপাত্রে ভোগ, কোথা ফলমূল-যোগ,
কোথা পাটরাণী কোথা ভৃক্ষাবৃত্তি আনিল;
তবুও নাথের সাথে সব দুখ ঘুচিল।
পতি ধ্যান পতি জ্ঞান, পতি বিনা নাহি আন,
একান্ত কান্তের পদে যার মনঃ মজিল;
ঐহিক বিভব তার পরাভূত হইল।

পঞ্চবটী উপবনে শ্রীরাম লক্ষ্মণ সনে
পরণ-কুটীরে বাস যবে তুমি করিতে,
যুগল গিরীশাধিনী রহে যথা কুরঙ্গিণী
নিদয়-নিষাদ-শরে পরিত্রাণ লভিতে;
নিরন্তর সেইরূপ চিন্তাহীন থাকিতে।
কালের কুটিল গতি নাহি তাহে অব্যাহতি
অদৃষ্টের ভাবী দুখ মনে নাহি ভাবিতে,
কানন-বিহার-ক্লেশ এই শেষ জানিতে।
হায় কেন কুলাঙ্গনে, মায়া-মৃগ-দরশনে
প্রেমভরে রঘুবরে বলিলে তা ধরিতে!

কিন্তু হেম-কুরঙ্গিণি, দাশরথী-বিলাসিনি,
শ্রীরাম-সর্ব্বস্ব-ধন সেই ফাঁদ হরিতে!
হায় কি কুক্ষণে সতি, দেবর লক্ষ্মণ প্রতি
করিলে দারুণ আজ্ঞা নাথরিপু বধিতে;
সুযোগে পুলক-চিত দশানন সুবিদিত
হরিল তোমায় হায়! দেখিতে না দেখিতে;
স্ববংশে দুরাত্মা নিজে অচিরায় মজিতে!

ভাবিলে তোমার দুখ, বিদরিয়া যায় বুক,
অশোক-কানন সতি, শোকাকুল করিলে,
ভীমকায় নিশাচরী ভীষণ মূরতি ধরি
কটুভাষ হৃদে তব শেল সম হানিলে,
ভাসিত কপোলযুগ দুনয়ন-সলিলে।
লঙ্কানাথ দশানন ধরি নানা প্রলোভন
লঙ্কেশ্বরী করিবারে করযোড়ে যাচিত;
অমনি হৃদয়নাথে চিত তব ডাকিত।
বিপুল কাহিনী তব উপমাবিহীন ভব
দুখের আঁধারে তব চিরদিন যাপিত;
হরিতে জননী ভার ভবে তুমি উদিত!
পুরুষ পরুষ প্রাণ, পরীক্ষায় পরিত্রাণ
না লভিয়া পরিশেষে বসুমতী ভেদিত,
করিল প্রাণের কন্যা স্বীয় গর্ভে নিহিত।
নারী-কুল-রত্ন তুমি উজ্জ্বল ভারত-ভূমি
তবগুণে কর সতি, বঙ্গাঙ্গনা ভূষিত;
আশীষ ভগিনীগণে লভিতে সে চরিত।
তব নাম উচ্চারণে ভারত মহিলাগণে
লভুক তোমার কীর্ত্তি ত্রিভুবন-বিদিত;
ভারত-সংসারে সতী সুরলোক পূজিত।

প্রজাপতি।

প্রজাপতির নিরুপম কান্তি নিরীক্ষণ করিলে কাহার নয়ন পরিতৃপ্ত না হয়? বসন্তকালে যখন প্রকৃতিদেবী নবপল্লবে ও কুসুমে সুসজ্জিতা হয়েন, তখন প্রজাপতি বিচিত্র-বর্ণবিশিষ্ট পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক উড্ডীন হইয়া আমাদিগের মন মোহিত করে। বস্তুতঃ, ইহাদিগকে সুখ ও সৌন্দর্য্যের আদর্শ স্বরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বোধ হয়, এই কারণেই অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা প্রজাপতিকে অতি সুলক্ষণযুক্ত মনে করেন; তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, প্রজাপতি যাহার গাত্রে বসে তাহার উদ্বাহক্রিয়া শীঘ্রই সম্পন্ন হইবে। ইহাদের শরীর যেমন সুন্দর ও কমনীয়, ইহাদের জন্মবৃত্তান্তও ততোধিক কৌতুককর।

মনুষ্য ও পশুদিগের সন্তানসন্ততি যেরূপ আকৃতি বিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করে, সেই আকৃতি তাহাদের মৃত্যুপর্য্যন্ত এক ভাবেই থাকে, কেবল আয়তনের বৃদ্ধি হয় মাত্র। পক্ষীদের জন্মবৃত্তান্ত পশুদের সদৃশ নহে। পক্ষীরা প্রথমে অণ্ড প্রসব করে, পরে কালসহকারে অণ্ড হইতে যে শাবক বহির্গত হয়, তাহার আকৃতি পূর্ণাবয়ব পক্ষীর সহিত কিছু মাত্র বলক্ষণ্য জন্মে না। কিন্তু প্রজাপতির জন্মবৃত্তান্ত এরূপ নহে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহাদের তিন প্রকার রূপভেদ হইয়া থাকে। প্রথম কীটাবস্থা, দ্বিতীয় গুটীপোকাবস্থা, তৃতীয় প্রজাপতিঅবস্থা। যেমন পুষ্পসমূহ প্রথমে অতি ক্ষুদ্র পল্লবের ন্যায় দৃষ্ট হয়, পরে মুকুলাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে প্রস্ফুটিত পুষ্পরূপে পরিণত হয় ও চারিদিকে সৌন্দর্য্য বিস্তার করে, প্রজাপতির পক্ষেও সেইরূপ। তাহার সবিশেষ এস্থলে বিবৃতি হইতেছে।

শীতকালের অনতিপূর্ব্বেই প্রজাপতিগণ বৃক্ষপত্রে বা বৃক্ষশাখায় অণ্ড প্রসব করিয়া কিছু দিনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করে। ঐ সকল অণ্ডে এক প্রকার আঠা থাকাতে উহা বৃক্ষে সংলগ্ন হইয়া যায়, ভূতলে পতিত হয় না। যখন বসন্তাগমে বৃক্ষসমূহ নব

পল্লবে বিভূষিত হয়, তখন ডিম্বস্থিত কীটগণ উপযুক্ত পরিমাণে উত্তাপ পাইলে আচ্ছাদন ভেদ করিয়া বহির্গত হয়। অণ্ড হইতে যে কীট বহির্গত হয়, তাহা কোন অংশে প্রজাপতির সদৃশ নহে; এক প্রকার গ্রন্থিল প্রাণীর ন্যায় হইয়া থাকে। তাহাদিগের কতকগুলিকে 'সুয়াপোকা' বলে। সকল কীটই সুয়াপোকার আকার ধারণ করে না। ইহারা অনেক জাতিতে বিভক্ত। কতকগুলির গাত্র কণ্টকবিশিষ্ট, কতকগুলির চর্ম্ম মসৃণ। সুয়াপোকা ইহাদের মধ্যে একজাতি মাত্র। কিন্তু এই বংশীয় সকল কীটই অবশেষে প্রজাপতির আকারে পরিণত হয়। সুয়াপোকা বা তজ্জাতীয় কীট প্রজাপতির প্রথমাবস্থা। ইহারা অন্যান্য কীট সকল হইতে বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দ্বারা বিভিন্ন। ইহাদের শরীর দ্বাদশ গ্রন্থি বিশিষ্ট, দ্বাদশটী পুঁতি সংযোজন করিলে যেরূপ হয়, তদ্রূপ। ইহাদের দুইটী সুতীক্ষ্ণ দন্ত আছে। তদ্দ্বারা ইহারা কুল, অশ্বত্থ, তুঁত প্রভৃতি বৃক্ষপত্র কর্ত্তন করিয়া ভক্ষণ করে। অনবরত ভোজন করাই এই অবস্থার প্রধান কর্ম্ম, এবং তাহারা এক দিবসের মধ্যে তাহাদের শরীরের দ্বিগুণ পরিমাণ ভক্ষণ করে।

উপর্য্যুক্ত দ্বাদশটী গ্রন্থির মধ্যে নয়টীর উভয়পার্শ্বে একটী করিয়া ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, তদ্দ্বারা ইহারা শ্বাসগ্রহণ করে। ইহাদের আর একটী বিচিত্র লক্ষণ এই যে, তাহারা প্রথমাবস্থায় খোলোশ ত্যাগ করিয়া, বয়োবৃদ্ধি সহকারে পূর্ব্বাবরণ সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইলে, তৎপরিহার পূর্ব্বক নূতন আবরণে আপনাদিগকে আচ্ছাদিত করে। এইরূপে যখন তাহারা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন আর চর্ম্ম ত্যাগ করে না। এই সময়ে উহারা আহার করিতে বিরত হয় ও বৃক্ষপত্র ত্যাগ করিয়া বৃক্ষশাখা অবলম্বন করে। এতদবস্থায় কতিপয় দিবস থাকিয়া কীটচর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে যত্নবান হয়। প্রথমে বহুকষ্টে গাত্রাবরণের শেষার্দ্ধভাগ আপনাদের গাত্র হইতে বিচ্যুত করে, ও আবরণের পূর্ব্বার্দ্ধভাগের অভ্যন্তরে স্বকীয় শরীর সঙ্কুচিত করিয়া রাখে। অতঃপর যতই পশ্চাৎ হইতে পূর্ব্বভাগের আবরণ ভেদ

করিতে চেষ্টা করে, ততই ঐ আবরণ স্ফীত হইতে থাকে, ও অবশেষে মস্তক দ্বারা উহা তিন চার ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলে। এইরূপ সমস্ত শরীর চর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আর এক অভিনব আকার ধারণ করে, উহাকে গুটীপোকা কহে। গুটীপোকা নানা প্রকার, যথা, তুঁতপোকা, কুলপোকা ইত্যাদি। উহাই প্রজাপতির দ্বিতীয়াবস্থা। এই অবস্থায় প্রজাপতির অবয়ব সকল সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়। কিন্তু এই সময়ে এরূপ কোমল থাকে, যে স্পর্শমাত্রেই তৎসমুদয় বিশৃঙ্খল হইয়া যায়।

কীটাবরণ ত্যাগের অব্যবহিত পরেই, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি অনুসারে হরিত, পীত, শুক্লাদি নানা বর্ণ ধারণ করে। ক্রমে দশ বার ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ অপেক্ষাকৃত কঠিন হয়। এই সময়ে ইহারা জড় পদার্থের ন্যায় নির্জীবভাবে অবস্থান করে, ও স্বকীয় কোমলাঙ্গ রক্ষণার্থে নাসিকারন্ধ্র হইতে এক প্রকার লাল নির্গত করিয়া ঊর্ণনাভের জালের ন্যায় অঙ্গের চতুষ্পার্শ্ব আবৃত করে। এই লাল বাতাস পাইলে বিলক্ষণ কঠিন সুত্র হইয়া উঠে। এই আচ্ছাদনকে গুটী বা কোয়া বলে। তুঁতপোকার গুটী হইতে রেসম প্রস্তুত হয়। এই গুটী 'গুলিসুতার' ন্যায় গোল ও একগাছি সুতায় জড়িত এবং খুলিলে প্রায় ছয়শতহাতের অধিক নির্গত হয়। কুলপোকার গুটী হইতে সচরাচর মৎস্য ধরিবার সুতা প্রস্তুত হয়।

এইরূপে কিছুকাল অবস্থান করিয়া, যখন প্রজাপতির সমস্ত অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পন্ন হয়, যখন গাত্রস্থিত জলীয় পদার্থ শুকাইয়া যায়, তখন গুটীর বহির্ভাগ বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্য হইতে বিচিত্র পক্ষবিশিষ্ট প্রজাপতি বহির্গমন করে। একাল পর্য্যন্ত তিন চারি সহস্র প্রকার প্রজাপতি দৃষ্ট হইতেছে। যত প্রকার বর্ণ মনুষ্যের নয়নগোচর হয়, তৎসমুদায়ই প্রজাপতির পক্ষে দেখা যায়। তাহাদের পক্ষোপরি মৎস্যের শল্কের ন্যায় এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম রেণু আছে, ইহা দ্বারাই প্রজাপতির পক্ষ নানাবর্ণে রঞ্জিত দেখায়। ঐ রেণু সমূহ পক্ষেসংশ্লিষ্ট নহে, প্রজাপতি স্পর্শমাত্রে উহা অঙ্গুলিতে লিপ্ত হইয়া যায়।

প্রাকৃত ভূগোল-বিজ্ঞান।

পৃথীবির গতি।

পৃথিবীর উপরিভাগে কিরূপ নৈসর্গিক ব্যাপার ও পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, পৃথিবীর আকার কিরূপ, পৃথিবীর সহিত সূর্য্যাদির সম্বন্ধ কি, ইত্যাদি বিষয় সম্যকরূপ অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

পৃথিবী যে গোলাকার, সামান্য ভূগোলবিবরণেও তাহার প্রমাণ পাঠ করা যায়, এজন্য তাহা এস্থলে প্রস্তাবদীর্ঘতাশঙ্কায় নির্দ্দেশ করা গেল না। এক্ষণে ইহা সহজেই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, পৃথিবী যদি গোলাকার, তবে ইহা কিরূপে শূন্যে অবস্থিতি করিতেছে। মহাভারতে পাঠ করা যায়, যে নাগরাজ বাসুকি ইহা মস্তকে ধারণ করিয়া আছে;

"ব্রহ্মার আজ্ঞায় গিয়া পাতাল ভিতর।
তথা থাকি পৃথিবী ধরিল বিষধর॥"

তাহাই যদ্যাপি হয়, তবে বাসুকি কাহার উপর অবস্থান করিতেছে? বাসুকি যদি পৃথিবীর ভার বহন করে, তবে বাসুকির ভার কে বহন করে? অবলম্বহীন হইয়া বাসুকি যে কি রূপে শূন্যে রহিয়াছে, ইহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। অতএব এ কথা বিশ্বাস যোগ্য নহে। বস্তুতঃ পৃথিবী কাহারও উপরে নাই; শূন্যে অবস্থান করিতেছে। এই অপরিসীম আকাশে বৃহৎ বৃহৎ অসংখ্য গোলাকার পদার্থ নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। পৃথিবী ইহাদের মধ্যে একটী গোলক ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, পৃথিবী যদি শূন্যে রহিয়াছে, তবে পড়িয়া যায় না কেন, আমরাই বা কেন পৃথিবী হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়া যাই না? পৃথিবী যে শূন্যে অবস্থান করিতেছে, সূর্য্যের আকর্ষণই তাহার একমাত্র কারণ। যেমন রজ্জু দ্বারা লোষ্ট্র ঝুলাইয়া দিলে পড়িয়া যায় না, সেইরূপ সূর্য্য-স্বকীয়-আকর্ষণী-শক্তিরূপ রজ্জু

দ্বারা পৃথিবীকে পড়িতে দেয় না। কিন্তু সে আকর্ষণ বস্তুতঃ রজ্জুর ন্যায় চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। দেখা নাই বা গেল, কার্য্য দেখিয়া তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যাইতেছে। চুম্বকপ্রস্তর লৌহ আকর্ষণ করে, কিন্তু তাহার আকর্ষণী শক্তি কখন চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া কি বুঝিব যে, চুম্বকপ্রস্তর লৌহ আকর্ষণ করিতেছে না?

পূর্ব্বকালীন পণ্ডিতদিগের এই স্থির সিদ্ধান্ত ছিল যে, পৃথিবী অচলা ও অন্তরীক্ষ বিক্ষিপ্ত জ্যোতিষ্ক সমুদায়ের মধ্যস্থিতা। সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্রাদি তাহার চতুর্দ্দিকে সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করে। এই মত পূর্ব্বকালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা প্রামাণিক বলিয়া পোষকতা করিয়া গিয়াছেন, এবং বস্তু সকল স্থূল দৃষ্টিতে আপাততঃ এইরূপ প্রতীয়মান হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু অধুনাতন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অসংশয়িতরূপে প্রমাণ করিয়াছেন, যে সূর্য্য, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্রাদি গ্রহগণের কেন্দ্রভূত। সূর্য্য গ্রহমধ্যে পরিগণিত নহে, যাহারা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে, তাহারাই গ্রহ। পৃথিবীও যথানিয়মে অন্যান্য গ্রহের ন্যায় সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে।

পূর্ব্বে যে আকর্ষণের কথা বলা গিয়াছে, তাহাকে মাধ্যাকর্ষণ কহে। ইহা সকল পদার্থেই বিদ্যমান আছে। প্রত্যেক পরমাণুরই আকর্ষণ আছে, সুতরাং যে বস্তুতে যত পরমাণু আছে, তাহার আকর্ষণও তত প্রবল। সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা ঘনত্বে ৩২০,০০০ গুণ বড় *। অতএব সূর্য্যের আকর্ষণও সেই পরিমাণে অধিক। যেমন আমাদের অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবী নিকটস্থ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বস্তুসমূহের গতি স্বকীয় আকর্ষণ শক্তি দ্বারা পরিবর্ত্তিত করে, সূর্য্যও সেইরূপ পৃথিবীর গতি পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। এক্ষণে কেহ ইহা বলিতে পারেন যে, যদি সূর্য্যের আকর্ষণ এত অধিক, তবে লোষ্ট্রাদি সমস্ত সামগ্রী শূন্যে প্রেরিত হইলে, সূর্য্যের দিকে না যাইয়া পৃথিবীর উপর কেন

* আয়তনে সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা ১৫ লক্ষ গুণ বড়; সূর্য্যের অধিকাংশ ভাগ বাষ্পময়।

পতিত হয়? তাহার উত্তর এই যে, জড়বস্তু সকল যত দূরে থাকে, তাহাদের আকর্ষণ তত অল্প হয়। সূর্য্য পৃথিবী হইতে প্রায় চার কোটী পঞ্চাশৎ লক্ষ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই জন্য পৃথিবীস্থ দ্রব্য সমূহকে আকর্ষণ করিয়া আপনার দিকে লইয়া যাইতে পারে না।

মাধ্যাকর্ষণ যে সকল পদার্থেই আছে, তাহা পণ্ডিতবর নিউটন আবিষ্কার করেন। তিনিই এই সুকৌশল-সম্পন্ন পরম সুন্দর বিশ্ব-যন্ত্রের মর্ম্মোদ্ভেদ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি একদিন উদ্যানে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একটী আতাফল বৃক্ষচ্যুত হইয়া ভূমিতে পড়িল। গুরুত্ব অর্থাৎ ভারহেতু জড়পদার্থ অধোগমন করে, পূর্ব্বে লোকের এই বিশ্বাস ছিল। কিন্তু নিউটন ভাবিলেন, পৃথিবী গোলাকার, আমরা একস্থানে যে বস্তুর অধঃপতন বলিতেছি, আমাদের বিপরীত দিকে অবস্থিত লোকেরা তাহার ঊর্দ্ধগমন বলিতে পারে। অতএব ভারহেতু যে অধোগমন করিতেছে ইহা না বলিয়া, পৃথিবীর দিকে যাইতেছে, এইরূপ বলা উচিত। এখন পৃথিবী যদি গুরুত্বের কারণ হয়, তবে পতনশীল বস্তুও গুরুত্বের কারণ হইবে, কেননা উহা পৃথিবীর খানিক অংশ মাত্র। অতএব স্থিরীকৃত হইতেছে যে, বস্তুর পরস্পর আকর্ষণই গুরুত্বের কারণ। যদি মাধ্যাকর্ষণ না থাকিত, তাহা হইলে বৃহৎ বৃহৎ দ্রব্যেরও কিছুমাত্র ভার বোধ হইত না। পৃথিবী নিকটস্থ সমস্ত বস্তুকে আপনার দিকে টানিতেছে। যদি আকৃষ্ট বস্তু কোন অবলম্বকে আশ্রয় করিয়া না থাকে, তবে ভূতলে পতিত হয়; হস্তাদি অবলম্বকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে, উহা ভূতলে পতিত না হইয়া, ঐ অঙ্গের উপর ভর দিয়া, গুরুত্বের বোধ জন্মাইয়া দেয়।

অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখরেও এই আকর্ষণের অভাব নাই; কিন্তু তথায় উহার ন্যূনতা প্রত্যক্ষ করা যায়। কলিকাতায় যে সামগ্রী পঞ্চাশৎ মণ ভারী, তাহা দুই ক্রোশ উচ্চ পর্ব্বতের উপর লইয়া পরিমাণ করিলে, তদপেক্ষায় প্রায় এক সের ন্যূন হয়। নিউটন ভাবিলেন, যদি পর্ব্বতশিখরে মাধ্যাকর্ষণের বিরাম নাই, তবে চন্দ্রমণ্ডল পর্য্যন্ত

ইহা কেন ব্যাপ্ত হইতে না পারে? তিনি চন্দ্রের পরিমাণ ও দূরত্ব অবগত ছিলেন, অতএব সহজেই পৃথিবী ও চন্দ্রের পরস্পর আকর্ষণের পরিমাণ অনুমান করিয়া লইলেন। এবং এই অনুমিত আকর্ষণের দ্বারা চন্দ্রের কক্ষ * কিরূপ হইবে, তাহা গণিতের দ্বারা স্থির করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, অনুমিত কক্ষ দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ কক্ষের সহিত অনেকাংশে মিলে; প্রভেদও অধিক। পরে ভাবিলেন, যদি পৃথিবী ও চন্দ্র পরস্পর আকর্ষণ করে, তবে সূর্য্য ও গ্রহ উপগ্রহগণ পরস্পর আকর্ষণ কেন না করিবে? এইরূপ চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার অঙ্ক করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং এইবার প্রত্যক্ষ জ্ঞাত কক্ষের সহিত তাহার অনুমিত কক্ষের সহিত সম্পূর্ণ-রূপে মিলিল। এইরূপে নিউটনের প্রতিভা গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে, গ্রহান্তর হইতে সূর্য্যে গমন করিয়া, সূর্য্য, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহবর্গকে এক মাধ্যাকর্ষণ সূত্রে বাধিয়া ফেলিল। স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে, যে কারণানুসারে আতাফল ভূতলে পতিত হয়, সেই কারণেই গ্রহ উপগ্রহাদি স্ব স্ব কক্ষে অবস্থাপিত আছে, ও তাহাই পরমাশ্চর্য্য শক্তি সহকারে অতি সহজে জ্যোতিষ্কসমূহের গতি নিয়মিত করিতেছে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যেমন হস্ত-স্খলিত লোষ্ট্রাদি পৃথিবী কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ভূমিতলে পড়িতেছে, সেইরূপ পৃথিবী সূর্য্য কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া সূর্য্যে পতিত হয় না কেন? ইহার উত্তর, পৃথিবীর একটী স্বাভাবিক গতি আছে। ইহার দ্বারা পৃথিবী যতই সূর্য্যের দিক্ হইতে ক্রমশঃ দূরে যাইতে চেষ্টা করে, সূর্য্যও ততই স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে। এই জন্যই পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকার কক্ষে পরিভ্রমণ করে, অথচ সূর্য্যের মধ্যে গিয়া নিপতিত হয় না। বস্তুতঃ, যদি পৃথিবীর এই স্বাভাবিক গতি না থাকিত, তাহা হইলে উহা কোন্ কালে সূর্য্যের অভ্যন্তরে পড়িয়া যাইত, ও তাহার ভীষণ উত্তাপে গলিয়া ধূমাকার

* কক্ষ—গ্রহ ও উপগ্রহগণের পরিভ্রমণ পথ।

প্রাপ্ত হইত। তবে সূর্য্য পদার্থটী কি? ইহা পৃথিবীর ন্যায় একটী গোলা। তবে পৃথিবী ছোট, সূর্য্য লক্ষ গুণ বড়, পৃথিবী শীতল, সূর্য্য অগ্নিময়। শুনিয়া বিস্মিত হইবে যে, প্রায় এক কোটী যোজন দূরস্থিত সূর্য্যে কি কি পদার্থ আছে, তাহা ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন। পৃথিবীতে যে যে বস্তু পাওয়া যায়, সূর্য্যে তাহার অনেক গুলির অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইয়াছে। সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে যে লৌহ প্রভৃতি ধাতু ও অন্যান্য বস্তু বিদ্যমান আছে, তাহা এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু সেই লৌহ প্রভৃতি সূর্য্যের ভয়ঙ্কর উত্তাপে ধূমাকারে তাহার চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে। সূর্য্যের মধ্যভাগে কি পদার্থ আছে, তাহা প্রকৃষ্টরূপে সপ্রমাণ হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সূর্য্যের অভ্যন্তর তরল পদার্থে নির্ম্মিত। সে যাহা হউক, সূর্য্য হইতে যে আমরা তাপ ও আলোক পাইয়া থাকি, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে পৃথিবী এক ঘণ্টায় প্রায় ৮৬৪০০ ক্রোশ যায়। এত দ্রুতগামী হইলেও আমরা পৃথিবীর গতি বোধ করিতে পারি না এইটী অনেকের পক্ষে আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে, বস্তুতঃ, বিস্মিত হইবার বিলক্ষণ কারণও আছে। কিন্তু পৃথিবীর তুলনায় আমরা কীট মাত্র, এজন্য পৃথিবীর গতি না বোধ করাই সম্ভব। যদি কখন আমাদের কোন পাঠিকা দ্রুত-গামী নৌকায় আরোহণ করিয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি অনুভব করিয়া থাকিবেন যে, নৌকা স্থির হইয়া রহিয়াছে, ও তীরস্থিত বৃক্ষাদি নৌকার বিপরীত দিকে ক্রমাগত চলিতেছে। পৃথিবীর পক্ষেও এইরূপ। পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ঘুরিতেছে বলিয়া, সূর্য্য নক্ষত্রাদি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে যাইতেছে বোধ হয়। পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের উপর ২৪ ঘণ্টায় এক বার আবর্ত্তন করে বলিয়া দিবা রাত্রি হয়। পৃথিবী গোলাকার, অতএব সূর্য্য একবারে তাহার সমুদয় ভাগ আলোকিত করিতে পারে না; অর্দ্ধভাগে আলো পড়ে, অপর অর্দ্ধভাগ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। যখন আমরা সূর্য্যের সম্মুখীন

হই, তখন বলি দিন হইয়াছে, সূর্য্যের বিপরীত দিকে থাকিলে রাত্রি হইয়াছে কহিয়া থাকি। পৃথিবী যে কেবল আপন মেরুদণ্ডের উপর ঘুরিতেছে এমন নহে, ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে। যেমন রথচক্র ঘুরিতে ঘুরিতে অগ্রগামী হয়, সেইরূপ পৃথিবীও ঘুরিতে ঘুরিতে প্রতিদিন আপন কক্ষের কিয়দ্দূর গমন করে। পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় দশ ক্রোশ করিয়া অগ্রগামী হয়, ও ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে।

সমস্যা।

এক বর্ণে নাম তার শ্রবণ মধুর,
ললনাকুলের যাহে আনন্দ প্রচুর;
সুখ দুঃখে যেই নাম ধরে জীবগণ,
এ ভব সংসারে যাহা অমূল্য রতন;
যার সম প্রিয়তম নাহি কিছু আর,
লক্ষ্মী আদি নানা অর্থ বিদিত যাহার;
যাহার প্রসাদে তুমি দেখিলে ভুবন,
বল দেখি সুধীবর কেবা সেই জন? (১)

*** ইহার উত্তর কি তাহা পাঠিকাগণ নির্ণয় করিবেন।

বামাগণের রচনা।

নারীজন্ম কি অধর্ম্ম!

আমরা কি কুক্ষণেই নারী হইয়া এই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যদি পরমেশ্বর আমাদিগকে সহিষ্ণুতা গুণ অধিক পরিমাণে না দিতেন, তাহা হইলে আমাদের অবস্থা যে কি হইত, তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না। আমাদিগের জন্মাবধিই পোড়া কপাল। ভূমিষ্ট হইবামাত্র পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সকলেই বিমর্ষ। মঙ্গলসূচক শঙ্খধ্বনি পর্য্যন্ত হইল না। পিতা বলিলেন, আহা একটী পুত্র না হইয়া 'একটা মেয়ে' হইয়াছে! সময় গুণে সকলই হয়! আমরা যে কি দোষে তাঁহাদের বিষচক্ষে পতিত হই, তাহা বুঝিতে পারি না। যদি বল, আমাদের বিবাহে অধিক টাকা

লাগে, কিন্তু তেমন পুত্রদিগের ন্যায় আমাদের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত এক পয়সাও ব্যয় হয় না। যদি বল, তাহারা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া টাকা উপার্জ্জন করিবে এবং বৃদ্ধ পিতা মাতাকে ভরণপোষণ করিবে, আমরা তাহা পারিব না, বরং কত টাকা ঘর হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাইব, কিন্তু সে দোষ কাহাদের? তোমাদের একটী পুত্র থাকিলে, তোমরা তাহার বিবাহের সময় যদি দুই হাত দিয়া টাকা কুড়াও, ও কন্যাকর্ত্তার সর্ব্বস্বান্ত কর, তবে তোমাদের কন্যার বিবাহের সময়, তোমাদের নিকট হইতে অপরে কেন না লইবে?

আমরা রীতিমত লেখা পড়া শিখিতে পাই না। ইদানীন্তন আমাদের মনে বিদ্যার অঙ্কুর উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু সমাজের কুনিয়ম বশতঃ তাহা অঙ্কুরাবস্থায় থাকিয়া যায়। পিতা মাতা কন্যাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন বটে, কিন্তু সেরূপ বিদ্যালয়ে দেওয়া আর না দেওয়া, দুই সমান। দশ বৎসর হইতে না হইতেই বিদ্যালয় হইতে ছাড়ান হইল, কেন না কন্যাটীর এখন বিবাহের সময় উপস্থিত। আহা! যাহার মনে বিবাহ যে কি পদার্থ, স্বামী যে কি বস্তু, তাহার জ্ঞান জন্মে নাই, তাহার আবার বিবাহ! বিবাহও হইল, লেখা পড়ায় ও জলাঞ্জলি হইল। সারাদিন দেড় হাত ঘোম্‌টা দিয়া, মুখ বুজিয়া থাক, তাহা না হইলে লোকে নির্লজ্জা বলিবে। তবে যদি স্বামীর পড়াইবার নিতান্ত জেদ থাকে, তিনি একটু আধ্‌টু পড়াইলেন। কিন্তু অল্প-দিনের মধ্যে তাহাও স্থগিত হয়। বাল্যবিবাহের ফল বাল্যকালে সন্তান প্রসব। স্ত্রীলোকের যদি একটী সন্তানহইল, তবে সে তাহাকে লালন পালন করিবে, না পুস্তকের পাত উল্টাইবে? অতএব নারীগণের ঐ পর্য্যন্ত বিদ্যার চূড়ান্ত হইল। স্ত্রীলোকের কিছু দেখিবার হুকুম নাই। কলিকাতায় গঙ্গার উপর পুল নির্ম্মাণ হইল, লোকে কত তাহার প্রশংসা করিল, কিন্তু আমাদের শোনাই সার হইল, এক দিনও চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে পারিলাম না। আমরা যদি বিদ্যাশিক্ষা করিতে না পারিলাম, জগতের অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া জন্মসার্থক করিতে না পারিলাম, তবে আমাদের জীবনে অল্পই সুখ। আমরা যে একবারে সুখবিহীন তাহা বলি-তেছি না। সুখ আছে কিন্তু দুঃখের ভাগই অধিক।

শ্রীমতী মায়াসুন্দরী।

প্রাবৃট কমল।

এ কি! সন্ধ্যার কমল সম আনন তোমারি,
কেন গো নলিনি তব দিবা দ্বিপ্রহরে?
শোভে তব সুখ রবি মধ্যাহ্ন অম্বরে,
তবে কেন তব মুখ মলিন নেহারি?

এই তো জগতে রীতি, পতি পাশে সুখী সতী,
আনন্দে দম্পতী ভাসে সুখ সরঃনীরে।
বিরহিণী সম হেরি সুধাই লো তোরে,
প্রণয় কি নাই তব রবির সংহতি?

"আছে লো প্রণয় আছে, থাকিতে না পাই কাছে,"
সখেদে, পবনে কাঁপি কহিল আমায়;
"দেখ, বরষা জলদ-জালে ঘেরিয়াছে তাঁয়,
ঘনাচ্ছন্ন স্বামী মুখ দেখে হৃদি ফাটিছে!!"

"পতি মম লক্ষান্তরে, আমি ভাসি জল' পরে,
ভাসি জলে তবু হাঁসি দেখিলে তাঁহায়।
পাইলে কিরণ তাঁর কাঁদি নাকি হায়!
কত সুখী সরোজিনী দেখ সরোবরে।"

"মম ভাগ্যে এ দুর্দ্দিন, বরশা বরষা দিন,
প্রভাকর করহীন হ'য়েছে গো স্বজনি।
ভাসি জলে, আঁখি জলে হায়! দিবা রজনী,
মনে করিয়াছি আর হবনা প্রণয়াধিনী।"

"এ সংসারে এই রীতি, যে যাহার গতি মুক্তি,
সে তার দুর্গতি করে তাই দেখি নয়নে।
চাতকিনী বাঁচে প্রাণে জলধর - জীবনে
কাল নিদাঘেতে হায় তাই তার দুর্গতি!"

"হেরে শশী সুখে ভাসে কুমুদিনী স্বজনি।
সুখে ফুল্ল হয়ে ধনী ভাসে ফুল্ল জীবনে।
এক পক্ষান্তরে বিধু তাই উদে গগনে,
হেমন্তে হিমাংশু তাই কাঁদায় গো কামিনী।"

জনৈক হিন্দু-মহিলা।

সংবাদসার।

মশৌরীতে এক বিবি একটা চিতা মারিয়াছেন। আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা দেখুন, এ স্ত্রীলোকটী কেমন সাহসী। একটা কুকুর বা শৃগাল বাটীতে প্রবেশ করিলে গৃহলক্ষ্মীদের ভয়ের সীমা থাকে না। কি হইবে ভাবিয়া তাঁহারা হতজ্ঞান হন। আবার আর একটী হাস্যের কথা এই, এমন দুই একটি পুরুষও খুঁজিয়া মেলে, যাহারা অন্ধকারময়ী রজনীতে প্রাণান্তেও গৃহের বাহির হইতে চান না। দরকার হইলে গৃহিণীকে দাঁড়াইতে বলেন।

এক ব্যক্তি পদব্রজে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবেন এই অভিপ্রায়ে গত ৩রা এপ্রিলে নিউইয়র্ক হইতে যাত্রা করিয়াছেন। ইনি প্রতিদিন ৩৩ মাইল হাঁটিয়া ১৮৭৬ সনের ২৩শে নবেম্বর নিউইয়র্কে পুনরাগমন করিবেন।

আমেরিকা প্রদেশের মন্টব্লাঙ্ক পর্ব্বতের নিম্নদেশে এক সম্প্রতি আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া হইয়া গিয়াছে। পর্ব্বতের উপরিভাগ হইতে এক খণ্ড বরফ খসিয়া নিম্নে পতিত হয়। উহার মধ্যে দেখা গেল, একটী মনুষ্য-দেহ অবিকৃত ভাবে রহিয়াছে। প্রায় তিন বৎসর হইল জন ব্লাকফোর্ড নামক এক জন আমেরিকান ঐ পর্ব্বতে উঠিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সেই পর্য্যন্ত তাঁহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। ঐ মৃত দেহ তাঁহারই। তাঁহার দেহ ও পরিচ্ছদাদির কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই, যেমন তেমনিই রহিয়াছে। বোধ হইল যেন এই মাত্র তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তদিগকে গর্জ্জন তৈল দ্বারা চিকিৎসা করান হইতেছে। তাহাতে উপকারও দর্শিতেছে।

স্ত্রীশিক্ষা।

স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীগণের অন্তঃপুর হইতে বহির্গমন, ও পুরুষদিগের সমাজে উপস্থিত থাকা, এবম্প্রকার প্রথা যে পুরাকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, তদ্বিষয়ে প্রাচীন গ্রন্থাদিতে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রমাণ না থাকিলেও, স্বভাবের অকৃত্রিম ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিলে এমন কখনই বিশ্বাস হয় না যে, কোন অনৈসর্গিক কারণব্যতীত, বামাগণকে পিঞ্জরের পক্ষির ন্যায় অন্তঃপুর মধ্যে বদ্ধ রাখা এবং তাহাদিগকে জ্ঞানালোক হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা কুপ্রথাদ্বয় কখন কোন দেশে অবলম্বিত হইতে পারিত। কন্যা ও পুত্র উভয়ের প্রতি পিতামাতার সমান স্নেহ থাকা স্বভাবসিদ্ধ; এবং পুত্রের প্রতি তাঁহাদিগের যে যে স্নেহ-কার্য্য কর্ত্তব্য, কন্যার প্রতিও তদ্রূপ করা স্বভাবের নিয়ম। পুত্রকে বিদ্যাভ্যাস করান এবং সাংসারিক কার্য্যের ভার গ্রহণে পারদর্শী করা, পিতামাতার পক্ষে যেমন উচিত, কন্যার প্রতিও তদ্রূপ আচরণ সমতুল্য রূপে যুক্তিযুক্ত। এই মাত্র বিভিন্নতা সম্ভব যে, সন্তান লালন পালন, পরিজনের সুখ সচ্ছন্দ বর্দ্ধন প্রভৃতি যে সমুদায় কোমলতা ও স্নেহের কার্য্য স্ত্রীজাতির বিশেষ কর্ত্তব্য, এবং বলবীর্য্য ও কঠিন শ্রমসাধ্য যে সমস্ত কর্ম্ম পুরুষজাতির বিশেষরূপে করণীয়, তদ্বিষয়ে বালক ও বালিকাগণের শিক্ষার বিভিন্নতা প্রয়োজনীয়। কিন্তু বিদ্যাভ্যাস, মনোবৃত্তির উৎকর্ষণ, প্রবৃত্তি সমূহের সংস্করণ, ধর্ম্মানুরাগ সংস্থাপন, রিপুদলের শাসন, এবং অবস্থান্তর্গত সম্যক ব্যাপারের যথোচিত অনুধাবন, মীমাংসা, ও সম্পন্নকরণ-ক্ষমতার্জ্জন প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্য উভয়জাতির পক্ষে সমতুল্য রূপে কর্ত্তব্য, এবং এই সমস্ত বিষয়ের চর্চ্চা উভয়জাতির শিক্ষাপ্রণালীর সমান উদ্দেশ্য। কথিত সকল বিষয়েই পুত্র ও কন্যা উভয়বিধ সন্তানকে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষাপ্রদান করা যে পিতামাতার প্রধান সঙ্কল্প, তাহা স্বভাবের নিয়ম অথবা ঈশ্বরের অভিপ্রেত, সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বভাবের বিশুদ্ধভাব মনুষ্যের মনঃ-ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী

নহে। মনুষ্যেরা অসাধারণ বিপদ আশঙ্কা কিম্বা স্বার্থপরতা ও অন্যান্য কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে, এবং তজ্জন্য স্বভাবের সরল ভাবের বিকৃতি জন্মে। এইরূপ বিকৃতাবস্থাতেই অন্যায্য ও অনিষ্টকারী প্রথাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্ত্রীশিক্ষার রোধ এবং স্ত্রীগণের রুদ্ধাবস্থা এইরূপেই সংস্থাপিত হইয়াছে মানিতে হইবে। বোধ হয়, অন্তঃপুরস্থ নানা ব্যাপারের সুশৃঙ্খলতা ও সৌকর্য্য লাভ প্রত্যাশায় পুরুষেরা বামাগণকে ঐ সকল কার্য্যেই অধিক পরিমাণে নিবিষ্ট রাখিয়া আসিতেছেন, এবং বিদ্যানুশীলন ও মনোবৃত্তির চর্চ্চার জন্য বামাগণকে যথেষ্ট সময় ও উৎসাহ দেন নাই। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সকল প্রদেশেই পুরুষেরা সামাজিক ও অন্যান্য সকল প্রকার নিয়মের সংস্থাপনকর্ত্তা হইয়া আসিতেছেন, এবং আপনাদের সুখ সচ্ছন্দ ও প্রভুত্বের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া স্ত্রীজাতিকে আপনাদের অপেক্ষা হীনাবস্থায় রাখিয়াছেন। বোধ হয়, এই কারণবশতঃ এদেশে এবং অপরাপর দেশে স্ত্রীশিক্ষার যথোচিত উন্নতি হয় নাই। কয়েক জন ভাগ্যবতী নারী ভিন্ন, এদেশীয় নারীগণ যে সাধারণতঃ সুশিক্ষা পাইতেন, এমন কিছুতেই সপ্রমাণ করা যায় না। হয় ত, নারীশিক্ষা সাধারণতঃ ছিল, প্রকৃত ইতিহাসের অভাবে তদ্বিষয়ের সত্যাসত্য জানিবার উপায় নাই। যাহা হউক, কেহ কেহ সুশিক্ষিতা ছিলেন, তদ্দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে, স্ত্রীশিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু বহুকালাবধি এই সদনুষ্ঠান এদেশে সম্পূর্ণরূপে রহিত হইয়াছে। বোধ হয়, মুসলমান রাজ্যকালীন কতকগুলি দুর্বৃত্ত নবাব ও অপরাপর প্রধান কর্ম্মচারীর দৌরাত্ম্যের ভয়ে অস্মদ্দেশীয়েরা বামাগণকে অন্তঃপুর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে বাধ্য হন, এবং তৎসঙ্গেই স্ত্রীশিক্ষা পদ্ধতি তিরোহিত হয়।

অধুনা সভ্য ও বিদ্যোৎসাহী ইংরাজগণের রাজ্যে আমরা অপরাপর বহুবিধ মহোপকার ও মহোন্নতিসূচক অনুষ্ঠানের সহিত স্ত্রীশিক্ষা পদ্ধতিরও পুনঃ স্থাপন দেখিতেছি। এই মহৎ

কার্য্যের অনুষ্ঠানেই উহার প্রকৃতাবস্থা ও সফলতা বিষয়ের বিবেচনা করা আবশ্যক।

শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? শিক্ষিতের প্রকৃত কর্ত্তব্যের উপযোগিতা ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হয় না। অতএব বামাগণের কর্ত্তব্য বিষয়ের অনুধাবন করিলেই, স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যের অনুভব হইবে। তত্ত্বানুসন্ধানপ্রিয় পণ্ডিতবর্গের যে প্রকার সূক্ষ্মানুভব হউক না কেন, দেশান্তরীয় কয়েকজন সুশিক্ষিতা নারীগণের যে প্রকার অসাধারণ অবস্থা লক্ষিত হউক না কেন, ভবিষ্যতে স্ত্রীজাতি পুরুষদিগের সহিত সকল বিষয়ে সমানরূপে পারদর্শী হইবেন কি না, ইত্যাদি নানাবিধ বিতণ্ডায় আমাদের প্রয়োজন নাই। আমাদের দেশে, আমাদের সমাজে, এবং আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায়, স্ত্রীজাতির কি কি কর্ত্তব্য তাহা সকলেই স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলেই অনুভব করিতে পারেন। সন্তান লালনপালন, উহার মনোক্ষেত্রে জ্ঞান ধর্ম্ম ও সত্যানুরাগের বীজ বপন, এবং উহাকে সচ্চরিত্র ও সুশীলতার উপদেশ দান, স্বামীর মনস্তুষ্টি, ও শারীরিক কুশলসম্পাদনোপযোগী অনুষ্ঠানে অবিচলিত চিত্তে যত্নবতী থাকা, ও তাঁহার ধন মান সম্পত্তি অক্ষুণ্ণাবস্থায় রাখিবার জন্য সদা সচেষ্ট হওয়া, ও পিতামাতা শ্বশুর শাশুড়ী এবং অপরাপর আত্মীয়বর্গের প্রতি যথাযোগ্য স্নেহ ভক্তি শ্রদ্ধা ও যত্ন করা, গার্হস্থ্য সমুদায় বিষয়ের সুনিয়ম ও সৌকর্য্য সাধন ও পরিবারস্থ সকলের কুশল ও প্রীতি সম্বর্দ্ধন, এবং উপরি উক্ত কার্য্যসমূহে পারদর্শী হইবার জন্য আপনার বুদ্ধি বিবেচনা ও অপরাপর মানসিক শক্তির উপযুক্ত চালনা মার্জ্জনা ও উৎকর্ষ করা, পুস্তকাদি পাঠ করিয়া নানা বিষয়ের জ্ঞানোপার্জ্জন ও সেই জ্ঞান কার্য্যে বিন্যস্ত করা, এবং সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, অধ্যবসায়, সুশীলতা, ধর্ম্মপরায়ণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে আপনাকে ভূষিত করা ইত্যাদি, স্ত্রীজাতির প্রকৃত কার্য্য। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা বর্ণিত কার্য্যসমূহের পারদর্শিতা সম্বন্ধে কি সুবিধা হইতেছে, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক।

বালিকারা এক্ষণে লেখাপড়া করিতেছে বটে; কিন্তু "লেখা" "পড়া" কথাদ্বয়ের শব্দার্থমাত্র সাধিত হইতেছে। বালিকারা লিখিতে ও রচনা করিতে পারে; পুস্তকাদি পাঠ, পঠিত পদ-সমূহের ব্যাখ্যা এবং কঠিন শব্দ গুলির অর্থ ও বানান করিতে পারে; ব্যাকরণের কতকগুলি নিয়ম কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে, হরণ পূরণ ত্রৈরাশিক প্রভৃতি অঙ্ক কসিতে, এবং ভূগোল ইতিহাস ইত্যাদির কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে পারে; এবং মোজা বিনামা গলাবন্ধ আসন প্রভৃতি পসমবুনন কর্ম্মে নৈপুণ্য লাভ করিতে পারে। কিন্তু এই কয়েকটী বিষয়েই স্ত্রীশিক্ষা পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।

শিক্ষা ও শিক্ষার ফল এই দুইটী পৃথক পৃথক পদার্থ। আমরা এক্ষণে শিক্ষামাত্র দেখিতেছি, উহার ফলের পরিচয় এ পর্য্যন্ত কিছুমাত্র পাই নাই। বর্ত্তমান শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল এই বোধ হয় যে, বালিকারা "শিক্ষিতা" নামের অধিকারিণী হয়েন। শিক্ষার কার্য্যকারিতা সম্পর্কে কি দেখা যায়? সূচিকা-কর্ম্মের পারিপাট্য, "বামাবোধিনী" বা "বঙ্গমহিলাতে" মধ্যে মধ্যে গদ্য পদ্য প্রবন্ধ প্রকাশ করা, "পরম কারুণিক পরমপিতা," "স্বভাবের অনির্ব্বচনীয় প্রভা," "বিহঙ্গকুলের কলরবের মধুরতা," ইত্যাদি কতকগুলি কণ্ঠস্থ বাক্যের উচ্চারণ, এবং বিদ্যাবতী বলিয়া আত্মগৌরবের ঘোষণা ও পরিবারস্থ অপর বামাগণকে অজ্ঞ বলিয়া তাচ্ছল্য করা, এই কয়েকটী মাত্র বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার ফল। এরূপ কেনই না হইবে? বিশেষ উদ্দেশ্যর প্রতি লক্ষ্য করিয়া কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, সেই উদ্দেশ্য সাধন হওয়া সম্ভব। আমাদিগের শিক্ষাপ্রণালী উদ্দেশ্য শূন্য, সুতরাং কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে নিষ্ফল। বালিকারা শিক্ষা পাইতেছে এবং সময়ে সময়ে পরীক্ষা দিতেছে, কেহ বা পরীক্ষা দিয়া প্রশংসাপত্র, কেহ বা স্বর্ণপদক, কেহ বা ছাত্রবৃত্তি পাইতেছে, ইহাতেই পিতামাতা ও কন্যাগণের আহ্লাদের ও গৌরবের সীমা থাকে না। বিবাহ-

কালে অনেকের মুখে কন্যার গুণানুবাদ শ্রবণ করা যায় এবং বরকর্ত্তা ও তাঁহার আত্মীয়েরা আহ্লাদে পুলকিত হয়েন। কিন্তু বিবাহানুষ্ঠান সমাপন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষারূপ নাট্যাভিনয়ের যবনিকা পতন হয়। কি অভিপ্রায়ে শিক্ষা প্রদত্ত হয়, শিক্ষাকালে কেহই তাহা চিন্তা করেন নাই, কন্যার বিবাহান্তে শিক্ষারও শেষ হইল এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য বিষয়ে চিন্তার আর প্রয়োজন থাকে না। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনতা বিষয়ে তর্ক বিতর্ককালীন অনেকেই বিদ্যাশিক্ষার প্রকৃত ফলের বর্ণনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা কেবল তর্কের জন্য। এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষা বিরোধীর সংখ্যা অত্যল্প; স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আর বাগ্‌বিতণ্ডা হয় না, সুতরাং উহার কার্য্যকারিতার চিন্তাও নিষ্প্রয়োজন হইয়াছে। শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে উহার কার্য্যকারিতা কখনও লক্ষিত হয় নাই, সুতরাং তাহা লব্ধও হয় নাই। যদিও কোন কোন সদ্বিবেচক শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর মনে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লক্ষিত থাকে, তাহার সফলতার সম্ভাবনা নাই। দশম বা একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম মধ্যে শিক্ষা কার্য্যের সমাপন হইয়া থাকে। শিশু সন্তানেরা বিদ্যার নাম ভিন্ন অধিক কি অর্জন করিতে পারে? যে সময়ে মনোবৃত্তি সমুহ বিকশিত হইতে আরম্ভ হয়, যে সময়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও সুখ অসুখের অনুভবের উপক্রম হয়, ঠিক সেই সময়েই শিক্ষা কার্য্য রহিত হয়। সুতরাং কতকগুলি কণ্ঠস্থ শব্দ পদ ও ভাবের উচ্চারণ ব্যতীত বালিকারা আর কিছুই শিখিতে পারে না।

কোন কোন বালিকা বিবাহের পরেও যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করেন। কেহ বা স্বামীর নিকট সময় সময় দুই একখানি পুস্তক পাঠ করেন, কেহ বা খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক-সম্প্রদায়ের অধীন কোন শিক্ষয়িত্রীর নিকট সূচিকা কর্ম্মে অথবা পুস্তক পাঠের প্রতি সপ্তাহে দুই চারি দিবস এক ঘণ্টার জন্য সাহায্য প্রাপ্ত হন, কেহ বা পরিবারস্থ কোন শিক্ষিতা রমণীর অবসরকালে তাঁহার নিকট

কিঞ্চিৎ উপদেশ গ্রহণ করেন। এবম্প্রকার ক্ষণিক অনিশ্চিৎ অনিয়ম অনুষ্ঠানব্যতীত বিবাহিতা বামাগণের শিক্ষার উপায়ান্তর নাই। অধুনা দুইটী বালিকা-নরম্যাল-স্কুল স্থাপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাতে ছাত্রের সংখ্যা অত্যল্প, কারণ যাঁহারা সামাজিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা এই দুই নরম্যাল স্কুলে বিবাহিতা কন্যা প্রেরণ করিতে সম্মত নহেন। সুতরাং সাধারণতঃ বিবাহিতা কন্যারা জ্ঞানলাভের চর্চ্চা হইতে বিরত থাকেন। যে যে ক্ষণিক চেষ্টার উল্লেখ করা হইল, তদ্দ্বারা অধিক ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। শিক্ষাকার্য্য সুনিয়মে আন্তরিক যত্নপূর্ব্বক স্থিরভাবে দৃঢ়তার সহিত ও বিশেষ উদ্দেশের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া সুপ্রথা অনুসারে দীর্ঘকাল চালাইতে পারিলে, উহার ফল লাভের প্রত্যাশা থাকে; নতুবা পুস্তকাদিতে কথঞ্চিৎ সময়াতিপাতমাত্র হয়, এবং কোন কোন স্থলে তদনুরোধে গৃহকার্য্যে ঔদাসীন্য, ও তদ্গৌরবে অশিক্ষিতা আত্মীয় রমণীগণের প্রতি তাচ্ছল্য প্রদর্শন প্রভৃতি চরিত্রদোষও জন্মে।

বিদ্যা অতি মনোরম ও ইষ্টজনক পদার্থ বটে, কিন্তু অল্প বিদ্যার বিপরীত ফল। এই অশুভ ঘটনাই আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে। কেবল বামাগণেরা কেন, পুরুষেরাও অধিকাংশ এ পর্য্যন্ত অল্প বিদ্যার অধিকারী। বাস্তবিক পুরুষদিগের অল্প বিদ্যা প্রযুক্তই স্ত্রীশিক্ষা পদ্ধতির এরূপ দুরবস্থা। যাঁহাদের মতানুযায়িক বামাগণকে সম্যকপ্রকারেই চলিতে হইবে, যাঁহাদিগের দ্বারা সমাজের সকল নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, তাঁহাদের মন উৎকৃষ্ট না হইলে অধিনী বামাগণের ইষ্টলাভের আশা নাই। এ সমস্ত সত্য বটে, কিন্তু তথাপি যেমন বালকদিগের উন্নতিকল্পে নানা সদুপায় অবলম্বিত হইতেছে, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধেও তদ্রূপ চেষ্টা করা উচিত। পুরুষেরা সুপণ্ডিত ও সুবিজ্ঞ হইয়া ভবিষ্যতে বামাগণের অবস্থার উন্নতি জন্য সুনিয়ম স্থাপিত করিবেন ইহা যুক্তিযুক্ত বটে, কিন্তু যতকাল পুরুষদিগের উৎকর্ষণ

সম্পূর্ণ না হইবে, ততকাল যে বামাগণ নিকৃষ্ট পশুর অবস্থায় থাকিবে, তাহা কি যুক্তিযুক্ত? ফলতঃ, বামাগণের সুশিক্ষার উপর পুরুষদিগের উন্নতি অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। মাতার কোমল হৃদয় হইতে এবং স্নেহপূর্ণ মধুর বচন দ্বারা পুত্রের সুশিক্ষা যতদূর সম্পাদিত হয় তদ্রূপ আর কিছুতেই হয় না। মাতা সুশীলা ধার্ম্মিক ও জ্ঞানযুক্তা হইলে, পুত্র কন্যার সচ্চরিত্রতার পক্ষে যেমন সুবিধা হয় এমন আর কিছুতেই হয় না। স্বামীর চরিত্রদোষ সংশোধনার্থ প্রিয়ভাষিণী ও কোমল-স্বভাবা স্ত্রীর যত্ন যেরূপ সফল হইবার সম্ভাবনা এমন আর কিছুই হইতে পারে না। ইউরোপীয় অধিকাংশ পুরুষ সুরাপান করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অল্প ব্যক্তিই মাতাল হইয়া পশুবৎ আচরণ করেন, কিন্তু অস্মদ্দেশীয় সুরাপায়ীর মধ্যে অধিকাংশই মাতাল হইয়া পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হন। ইহার কারণ কি? ইউরোপীয়েরা মাতা ভগ্নী পত্নী ইত্যাদি স্ত্রীগণের সমাজে পান ও ভোজন করিয়া থাকেন, এবং অনেকেই স্ত্রীগণের ঘৃণা ও তিরস্কারের ভয়ে অল্পমাত্রায় পান করিয়া ক্ষান্ত হয়েন, কিন্তু অস্মদ্দেশীয় যুবকেরা প্রায় সমবয়স্ক বন্ধু বান্ধবের সহিত পান করেন, সুতরাং তাহাদিগকে পানের পরিমাণ বিষয়ে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতে হয় না। ইউরোপীয় পুরুষেরা স্ব স্ব পত্নীকে মান্য ও শ্রদ্ধা করেন, এবং তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে, তাঁহাদের ইচ্ছামত আচরণ করিতে, যাহাতে তাঁহাদের মনোবেদনা জন্মিতে পারে এমন কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে, এবং তাঁহাদের প্রণয়ের ও মানের যোগ্য হইতে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করেন, সুতরাং আপন আপন চরিত্র বিশুদ্ধ রাখিতে যত্নবান হয়েন। আমাদের পুরুষেরা ভার্য্যাকে মান্য শ্রদ্ধা করা দূরে থাকুক, অনেকেই ভার্য্যার মনোবেদনা প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করেন না, সুতরাং ইউরোপীয়েরা যে ভয়ের দ্বারা অনেক প্রকার চরিত্রদোষ হইতে নিষ্কলঙ্ক থাকে, আমাদের মধ্যে সে ভয়ের উদ্রেকও হয় না, এবং তজ্জন্য অনেকেই

কিঞ্চিৎ উপদেশ গ্রহণ করেন। এবম্প্রকার ক্ষণিক অনিশ্চিৎ অনিয়ম অনুষ্ঠানব্যতীত বিবাহিতা বামাগণের শিক্ষার উপায়ান্তর নাই। অধুনা দুইটী বালিকা-নরম্যাল-স্কুল স্থাপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাতে ছাত্রের সংখ্যা অত্যল্প, কারণ যাঁহারা সামাজিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা এই দুই নরম্যাল স্কুলে বিবাহিতা কন্যা প্রেরণ করিতে সম্মত নহেন। সুতরাং সাধারণতঃ বিবাহিতা কন্যারা জ্ঞানলাভের চর্চ্চা হইতে বিরত থাকেন। যে যে ক্ষণিক চেষ্টার উল্লেখ করা হইল, তদ্দ্বারা অধিক ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। শিক্ষাকার্য্য সুনিয়মে আন্তরিক যত্নপূর্ব্বক স্থিরভাবে দৃঢ়তার সহিত ও বিশেষ উদ্দ্যেশের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া সুপ্রথা অনুসারে দীর্ঘকাল চালাইতে পারিলে, উহার ফল লাভের প্রত্যাশা থাকে; নতুবা পুস্তকাদিতে কথঞ্চিৎ সময়াতিপাতমাত্র হয়, এবং কোন কোন স্থলে তদনুরোধে গৃহকার্য্যে ঔদাসীন্য, ও তদ্গৌরবে অশিক্ষিতা আত্মীয় রমণীগণের প্রতি তাচ্ছল্য প্রদর্শন প্রভৃতি চরিত্রদোষও জন্মে।

বিদ্যা অতি মনোরম ও ইষ্টজনক পদার্থ বটে, কিন্তু অল্প বিদ্যার বিপরীত ফল। এই অশুভ ঘটনাই আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে। কেবল বামাগণেরা কেন, পুরুষেরাও অধিকাংশ এ পর্য্যন্ত অল্প বিদ্যার অধিকারী। বাস্তবিক পুরুষদিগের অল্প বিদ্যা প্রযুক্তই স্ত্রীশিক্ষা পদ্ধতির এরূপ দুরবস্থা। যাঁহাদের মতানুযায়িক বামাগণকে সম্যকপ্রকারেই চলিতে হইবে, যাঁহাদিগের দ্বারা সমাজের সকল নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, তাঁহাদের মন উৎকৃষ্ট না হইলে অধিনী বামাগণের ইষ্টলাভের আশা নাই। এ সমস্ত সত্য বটে, কিন্তু তথাপি যেমন বালকদিগের উন্নতিকল্পে নানা সদুপায় অবলম্বিত হইতেছে, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধেও তদ্রূপ চেষ্টা করা উচিত। পুরুষেরা সুপণ্ডিত ও সুবিজ্ঞ হইয়া ভবিষ্যতে বামাগণের অবস্থার উন্নতি জন্য সুনিয়ম স্থাপিত করিবেন ইহা যুক্তিযুক্ত বটে, কিন্তু যতকাল পুরুষদিগের উৎকর্ষণ

সম্পূর্ণ না হইবে, ততকাল যে বামাগণ নিকৃষ্ট পশুর অবস্থায় থাকিবে, তাহা কি যুক্তিযুক্ত? ফলতঃ, বামাগণের সুশিক্ষার উপর পুরুষদিগের উন্নতি অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। মাতার কোমল হৃদয় হইতে এবং স্নেহপূর্ণ মধুর বচন দ্বারা পুত্রের সুশিক্ষা যতদূর সম্পাদিত হয় তদ্রূপ আর কিছুতেই হয় না। মাতা সুশীলা ধার্ম্মিক ও জ্ঞানযুক্তা হইলে, পুত্র কন্যার সচ্চরিত্রতার পক্ষে যেমন সুবিধা হয় এমন আর কিছুতেই হয় না। স্বামীর চরিত্রদোষ সংশোধনার্থ প্রিয়ভাষিণী ও কোমল-স্বভাবা স্ত্রীর যত্ন যেরূপ সফল হইবার সম্ভাবনা এমন আর কিছুই হইতে পারে না। ইউরোপীয় অধিকাংশ পুরুষ সুরাপান করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অল্প ব্যক্তিই মাতাল হইয়া পশুবৎ আচরণ করেন, কিন্তু অস্মদ্দেশীয় সুরাপায়ীর মধ্যে অধিকাংশই মাতাল হইয়া পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হন। ইহার কারণ কি? ইউরোপীয়েরা মাতা ভগ্নী পত্নী ইত্যাদি স্ত্রীগণের সমাজে পান ও ভোজন করিয়া থাকেন, এবং অনেকেই স্ত্রীগণের ঘৃণা ও তিরস্কারের ভয়ে অল্পমাত্রায় পান করিয়া ক্ষান্ত হয়েন, কিন্তু অস্মদ্দেশীয় যুবকেরা প্রায় সমবয়স্ক বন্ধু বান্ধবের সহিত পান করেন, সুতরাং তাহাদিগকে পানের পরিমাণ বিষয়ে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতে হয় না। ইউরোপীয় পুরুষেরা স্ব স্ব পত্নীকে মান্য ও শ্রদ্ধা করেন, এবং তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে, তাঁহাদের ইচ্ছামত আচরণ করিতে, যাহাতে তাঁহাদের মনোবেদনা জন্মিতে পারে এমন কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে, এবং তাঁহাদের প্রণয়ের ও মানের যোগ্য হইতে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করেন, সুতরাং আপন আপন চরিত্র বিশুদ্ধ রাখিতে যত্নবান হয়েন। আমাদের পুরুষেরা ভার্য্যাকে মান্য শ্রদ্ধা করা দূরে থাকুক, অনেকেই ভার্য্যার মনোবেদনা প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করেন না, সুতরাং ইউরোপীয়েরা যে ভয়ের দ্বারা অনেক প্রকার চরিত্রদোষ হইতে নিষ্কলঙ্ক থাকে, আমাদের মধ্যে সে ভয়ের উদ্রেকও হয় না, এবং তজ্জন্য অনেকেই

নেহারি কাননে পাখী,—হিরণ্ময় অঙ্গ;
বাসনা হইল নলে, ধরিতে তা সুকৌশলে,
কিন্তু গ্রহ প্রতিকূল দেখিবারে রঙ্গ,
পিন্ধন-বসন-ধৃত উড়িল বিহঙ্গ।
হতবুদ্ধি দোঁহাকার দুনয়নে নীরধার,
পরাইয়া বসনার্দ্ধ বল্লভে উলঙ্গ,
(হরগৌরি রূপ যেন হইল প্রসঙ্গ;)
কত ক্ষণে ক্ষামেক্ষণা*, বিদ্যুল্লতা বরাঙ্গনা
কহিল মৃদুল স্বরে যথা সুপ্ত-ভঙ্গ,
বাজিল মধুর বীণা সুধার তরঙ্গ।

"জীবিতেশ! প্রাণকান্ত! হৃদয়-রতন!
নিষধ-ঈশ্বর হ'য়ে ধরাধিপ নাম ল'য়ে
শেষে কি না হ'ল সার বিপিন-ভ্রমণ,
ভবের ভিখারী ভণে ভারত ভবন?
তবু না পূরিল সাধ বিধাতার প্রতিবাদ
পদে পদে এ বিপদে দগধ জীবন;
হেন পোড়া ভাগ্য কার না দেখি কখন।
তাহে খেদ নাহি নাথ, থাকিলে তোমার সাথ
দেবেন্দ্র-বিভবে দাসী ফিরায়ে বদন,
সাদরে ও পদ হৃদে করিবে ধারণ।

"ভেবনা ভেবনা কান্ত, দাসীর বিনতি;
ধৈরয ধারণ কর নেত্রনীর পরিহর,
চল যাই স্থানান্তর তোমার সংহতি;
কিম্বা নৃপ ভীমসেন পিতার বসতি।
যা হোক তা করো পরে মাগি পদযুগ ধরে,
'দাসীর জীবন যদি রাখ মহামতি!
একাকী গহনে তারে ত্যজ না নৃপতি।"
নীরবিলা সেই রামা পতিব্রতা গুণধামা,
খেলিল করুণ সুর প্রতিধ্বনি সতী;
ক্ষণেকে নিদ্রিতা সেই নলের যুবতী।

* মলিন-নয়না।

নয়ন মেলিয়া সতী দেখে অন্ধকার;
না হেরিয়া প্রাণনাথ, শিরে হ'ল বজ্রপাত,
ভালে হানে করাঘাত করি হাহাকার;
বহিছে কপোলযুগে রুধিরের ধার।
আলুথালু কেশপাশ, অর্দ্ধেক বিচ্ছিন্ন বাস,
চিতহারা কুরঙ্গিণী উন্মাদিনী-সার;
হতাশে সম্ভাষে বামা যা সম্মুখে তার—
"বল অহে গিরিবর, কোথায় জীবিতেশ্বর,
কহ নদি কল্লোলিনি, কোথা প্রাণাধার
জান বিহঙ্গিনি, কোথা মম কণ্ঠহার?"

হেনকালে অকস্মাৎ হ'ল দৈববাণী—
"ধন্য ধন্য পতিব্রতে, কীর্ত্তিমতি ত্রিজগতে
সম্বর বিলাপ সাধু—আকুল-পরাণি,
অচিরে লভিবে পতি নৈষধের রাণি!
কুগ্রহের হ'বে শান্তি, ঘুচিবে সকল ভ্রান্তি,
তিলেক না রবে আর হৃদয়ের গ্লানি,
যাও বৎসে যথা মাতৃষসা-রাজধানী।
জনক পাইয়া ব্যথা দূত পাঠাইবে তথা,
সমাদরে ল'য়ে যাবে হ'য়ে অভিমানী;
স্বয়ম্বরে ঋতুপর্ণ দিবে পতি আনি।"

তোটক। সুখ বঙ্গ নিকেতন ধন্য মনে,
ললনাকুল মূল্য অতুল্য গুণে।
জিত-পঙ্কজ বঙ্গজ চারুসুতা,
বিধু বক্ত্র সুধার্দ্র সুনেত্রযুতা।
করপল্লব বল্লভ শৈত্য-গুণে,
যত বেণু বিদারিত কণ্ঠ শুনে।
পদ শিঞ্জিত রঞ্জিত কোকনদে,
কলধৌত* বরাঙ্গ তুয়া প্রমদে!
কর সঞ্চয় অক্ষয় ধর্ম্মধনে;
ধর চিত্ত-মহত্ত্ব সতীত্ব সনে।

* সুবর্ণ।

চা-খড়ি।

অপর সাধারণ সকলেই চা-খড়ি দেখিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। চা-খড়ি পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানে দৃষ্ট হয়। হিমালয় পর্ব্বতে, দাক্ষিণাত্যে ও ইংলণ্ড দেশে ইহা প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্ত্তমান অনেকগুলি পর্ব্বত কেবল চা-খড়ি নির্ম্মিত।

সামান্য কূপ খনন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গভীরতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মৃত্তিকা স্তরে স্তরে সজ্জিত আছে। যতদূর পর্য্যন্ত মনুষ্য কর্ত্তৃক পৃথিবী খনন করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, ভূপঞ্জরের উপরিভাগে চারি পাঁচ ক্রোশ পর্য্যন্ত, পলাণ্ডুর ত্বকের ন্যায় নানা প্রকার মৃত্তিকা, গৈরিকা এবং প্রস্তর স্তরে স্তরে সন্নিবেশিত আছে। চা-খড়ি ঐ সকল স্তরের মধ্যে একটী স্তর, কোন কোন স্থানে ইহা প্রায় সহস্র হস্ত গভীর। এক্ষণে চা-খড়ি কি পদার্থ তদ্বিষয়ে কিছু বলা যাইতেছে।

যদি আমরা অনুবীক্ষণ যন্ত্র সহকারে চা-খড়ি পর্য্যবেক্ষণ করি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, উহা বালুকা-কণার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু ও কীটের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট কতকগুলি পদার্থে গঠিত। ঐ সকল আকৃতি বিশিষ্ট পদার্থ গুলি দেখিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শম্বূকের ন্যায়। তবে কি চা-খড়ি কীটাণু পঞ্জরের সমষ্টি? কেহ বলিতে পারেন যে, ঐ সকল পদার্থ জীব-দেহাবশেষ নহে, জীব-কঙ্কালের সহিত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে এই মাত্র। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে চা-খড়ির ন্যায় এক রূপ পদার্থ আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে জন্মিতেছে। উহা যে জীব-কঙ্কালময়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; অনুবীক্ষণ যন্ত্র সহকারে প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে। ইংলণ্ডের পশ্চিম পার্শ্বে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর অতীব গভীর। সেই গভীরতম সমুদ্রতল হইতে কোন কারণ বশতঃ মৃত্তিকা উত্তোলন করা হয়। সেই মৃত্তিকা শুষ্ক হইলে, চা-খড়ির ন্যায় শ্বেতবর্ণ হয়, ও অনুবীক্ষণ যন্ত্র সহকারে উহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে, সমুদ্রতল-

চারী শম্বূকের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব বিশেষের কঙ্কাল নেত্রগোচর হয়। এই সকল জীব-কঙ্কালের আকৃতি এরূপ সূক্ষ্ম, যে এক বুরুল প্রমাণ স্থানে লক্ষ লক্ষ কীটাণু পঞ্জর দৃষ্ট হয়। এইরূপ আট্‌লাণ্টিক মহাসমুদ্রে সহস্র সহস্র ক্রোশ ব্যাপিয়া জীব-কঙ্কাল সহকারে উক্ত প্রকার স্তর জন্মিতেছে।

যখন দেখা যাইতেছে যে, আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর হইতে উত্তোলিত মৃত্তিকা ও চা-খড়িতে আকারগত কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, চা-খড়িও অর্ণবচর কীটাণুপুঞ্জের পঞ্জররাশি ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে; ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, উহা এককালে সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন ছিল। চা-খড়ি যে সমুদ্রের তলদেশে জন্মিয়াছিল, তাহার আরও অনেক প্রমাণ আছে।

চা-খড়ির স্তরের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত জীবদেহাবশেষ ভিন্ন অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ জীবসমূহের কঙ্কাল প্রোথিত দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত জীবের অস্থ্যাদি নাশ প্রাপ্ত না হইয়া বহুকাল প্রোথিত থাকায় প্রস্তরের ন্যায় কঠিন দৃষ্টিগোচর হয়। এই সকল প্রস্তর ভাবাপন্ন জীব-দেহাবশেষকে "ফসিল" কহা যায়। চা-খড়ি নামক গৈরিকস্তরে যে সকল "ফসিল" প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা দেখিতে বর্ত্তমান অর্ণবচারী জীবের ন্যায়। অতএব স্থিরীকৃত হইতেছে যে, ঐ সকল গৈরিকস্তর সমুদ্রতলে জন্মিয়াছিল। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত স্তর এককালে সমুদ্রগর্ভস্থ ছিল, তবে এক্ষণে কিরূপে সমতলক্ষেত্ররূপে পরিণত হইল, কিরূপেই বা উন্নত পর্ব্বত-শিখরোপরি উৎক্ষিপ্ত হইল? কিরূপে হইল, তাহা এপর্য্যন্ত অসংশয়িত রূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়েও যে পৃথিবীর কোন অংশ উন্নত, কোন অংশ বা অবনত হইতেছে, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। গুজরাটের সন্নিকটস্থ কচ্ছদ্বীপে ১৮১৯ খৃঃ অব্দে একটী ভূমিকম্প হয়, সেই ভূমিকম্প দ্বারা ২৫ক্রোশ দীর্ঘ ও ৮ক্রোশ প্রশস্ত একখণ্ড ভূভাগ সমুদ্র হইতে উৎক্ষিপ্ত হয়। তত্রত্য অধি-

বাসীরা উহার নাম "আল্লাবাঁধ" অর্থাৎ ঈশ্বর নির্ম্মিত বাঁধ রাখে। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে দক্ষিণ আমেরিকায় চিলি নামক দেশের সন্নিহিত একটী দ্বীপ ছয় হাত উত্থিত হইয়াছিল। এইরূপে যে নানা দেশের ভূপৃষ্ঠ উন্নত হইয়াছে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। যদি আধুনিক সময়ে ভূ-পঞ্জর কালসহকারে উন্নত ও অবনত হয়, তবে যে পুরাকালেও ঐরূপ হইত তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

সামান্য চা-খড়ি হইতে আমরা অনেকগুলি বিষয় জানিতে পারিলাম। জানিতে পারিলাম যে, চা-খড়ি সমুদ্র-সম্ভূত শম্বুকের ন্যায় এক প্রকার জীববিশেষের অসঙ্খ্য কঙ্কালসমষ্টি মাত্র, যে বর্ত্তমান সময়ে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে পূর্ব্বোক্ত জীবদেহাবশেষ হইতে চা-খড়ির ন্যায় এক প্রকার গৈরিক জন্মিতেছে, এবং যে চা-খড়ি নামক স্তর এককালে সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন ছিল, তাহা এক্ষণে কোন কারণ বশতঃ উৎক্ষিপ্ত হইয়া শুষ্ক ভূমি ও পর্ব্বতে পরিণত হইয়াছে। হিমালয় পর্ব্বতে চা-খড়ি পাওয়া যায়; অতএব সিদ্ধ হইতেছে, যে অতি বিস্তীর্ণ তুঙ্গ শৃঙ্গ পরিশোভিত হিমালয় পর্ব্বতও এককালে সমুদ্র গর্ভে নিহিত ছিল।

স্বাস্থ্য-রক্ষা।

শরীরের প্রকৃত অবস্থাকে আমরা স্বাস্থ্য বলিয়া থাকি, এবং উহার বিকৃতিভাবের নাম রোগ। অতএব স্বাভাবিক অবস্থা জ্ঞাত না হইলে, বিকৃতিভাব যে কি, তাহা জানিতে পারা যায় না। শারীরিক কার্য্য পাঁচ প্রকার, যথা পোষণ, পুনরুৎপত্তি, চলন, চেতন ও বাক্য। এই কয়েকটী ক্রিয়ার স্বাভাবিক অবস্থা আমরা সংক্ষেপে বর্ণন করিব।

পোষণ। নিশ্বাস, পান ও আহারের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে শরীর পুষ্টি ও বৃদ্ধি হওয়াকে পোষণ বলে। ইহা ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া দ্বারা সম্পাদিত হয়, যথা পরিপাক, রক্ত-সঞ্চালন, নিশ্বাস, রক্ত-মন্থন ইত্যাদি।

পরিপাক। জীবন রক্ষার যে কয়েকটী প্রধান ক্রিয়ার পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে পরিপাক একটী অত্যাবশ্যক ক্রিয়া। ইহার দ্বারা জীব আহার গ্রহণ করে এবং ঐ আহার পরিপাক হইয়া এবং দেহস্থিত কতিপয় রসের দ্বারা শোষিত হইয়া রক্তে পরিণত হয়। পরিপাক কার্য্য আট ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, (১) গ্রহণ, (২) চর্ব্বণ, (৩) লালার সহিত মিশ্রিত হওন, (৪) গিলন, (৫) পাককরণ, (৬) সারকরণ, (৭) আচুষণ, (৮) মল-ত্যাগ।

১, গ্রহণ।—অর্থাৎ মুখের মধ্যে আহারীয় দ্রব্য গ্রহণ করা। মনুষ্য এবং কয়েক প্রকার জন্তু, যথা বানর, কাষ্ঠবিড়াল ইত্যাদি হস্ত, ওষ্ঠ, দন্ত ও কিয়ৎ পরিমাণে জিহ্বা দ্বারা খাদ্য দ্রব্য মুখ মধ্যে স্থাপন করে, কিন্তু অন্যান্য ইতর প্রাণী মধ্যে এই গ্রহণপ্রণালী নানা প্রকার। কোন কোন জন্তু কেবল তাহাদিগের লম্বা জিহ্বা দ্বারা এই কার্য্য সমাধা করে, যথা গিরগিট, কাটঠোক্‌রা পাখী, ইত্যাদি। হস্তী তাহার দীর্ঘাকৃতি নাসিকা অর্থাৎ শুণ্ড দ্বারা সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্য মুখের মধ্যে স্থাপন করে। গাভী, ছাগ প্রভৃতি জন্তু সকল তাহাদিগের স্থূল ওষ্ঠের দ্বারা তৃণ পল্লবাদি ধারণ করিয়া মুখের মধ্যে প্রবেশ করে, এবং পক্ষী সকল তাহাদিগের চঞ্চু দ্বারা আহার গ্রহণ করে।

২, চর্ব্বণ।—চর্ব্বণ কার্য্য মুখ মধ্যে দন্ত দ্বারা সম্পাদিত হয়। চর্ব্বিত দ্রব্য জিহ্বা দ্বারা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয় এবং ওষ্ঠ ও গণ্ড-দ্বয় দ্বারা মুখ মধ্যে আবদ্ধ থাকে। মনুষ্য এবং অধিকাংশ স্তন্য-পায়ী জন্তুদিগের দন্ত দুই প্রকার, পতনশীল এবং স্থায়ী। ভূমিষ্ঠ হইবার পর তিন বৎসরের মধ্যে আমাদিগের যে দন্তশ্রেণী নির্গত হয়, তাহাদিগকে পতনশীল দন্ত কহে, কারণ সে গুলি কিছু দিন মধ্যেই পতন হয়। এরূপ দন্তের সংখ্যা বিংশতি মাত্র, এই সকল দন্তের পতনান্তে দ্বাত্রিংশত স্থায়ী দন্ত নির্গত হয়, উহার অর্দ্ধেক গুলি উচ্চ চিবুক-অস্থিতে এবং অপর অর্দ্ধেক নিম্ন চিবুক-অস্থিতে

দৃঢ়রূপে আবদ্ধ থাকে। কার্য্য বিশেষে দন্তের আকার ভিন্ন প্রকার, ছেদক-দন্তের সংখ্যা আটটী এবং উহার অগ্রভাগ চেপ্টা ও তীক্ষ্ণ-ধার। মাংস-চ্ছেদক দন্ত চারিটী এবং উহার অগ্রভাগ সরু এবং ধারযুক্ত। অবশিষ্ট বিংশতি দন্ত পেষক এবং ইহাদের অগ্রভাগ স্থূল ও প্রশস্ত। নিম্ন চিবুকাস্থির সঞ্চালন দ্বারা উভয় পংক্তির দন্ত পরস্পর ঘর্ষিত হইয়া চর্ব্বণ কার্য্য সম্পন্ন হয়। আহারীয় দ্রব্য যত অধিক পরিমাণে চর্ব্বিত হইবে, ততই উহা বিশেষরূপে চূর্ণ ও লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া পরিপাকোপযোগী হইবে।

৩, লালার সহিত মিশ্রিত হওন।—চর্ব্বণ দ্বারা ভুক্ত দ্রব্য পেষিত ও মুখস্থিত লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া পিত্তবৎ ও গিল-নোপযোগী হয়। মুখের মধ্যে ছয়টী লালাযন্ত্র আছে, উহা হইতে এক প্রকার তরল জলবৎ পদার্থ নিঃসৃত হইয়া সূক্ষ্ম নালী দ্বারা মুখ মধ্যে পতিত হয়। ইহা ব্যতীত গণ্ডস্থিত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র যন্ত্র হইতে এক প্রকার রস নির্গত হয়। এই দুই রস একত্রিত হইয়া লালা হয়। লালা ঈষৎ লবণাক্ত এবং সর্ব্বদাই মুখ মধ্যে ক্ষরিত হয়, কিন্তু অন্য সময়াপেক্ষা আহারকালীন অধিক পরি-মাণে নিঃসৃত হয়। লালার বিশেষ রসায়নিক গুণ এই যে, উদ্ভিজ আহারীয় দ্রব্যের শ্বেতসার অর্থাৎ পালো (ষ্টার্চ) যাহা সহজে দ্রব হয় না, লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া শর্করায় পরিণত হয়। এই শর্করা অতি সহজেই দ্রবীভূত হয়।

৪, গিলন।—আহার্য্য দ্রব্য মুখ হইতে পাকস্থলীতে যাওয়ার নাম গিলন। মুখের পশ্চাৎ ও নিম্ন ভাগে যে পথ দিয়া ভক্ষ্য দ্রব্য উদর মধ্যে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে, উহার নাম অন্ননালী। মুখ এবং অন্ননালীর মধ্যে কোমল-তালু অর্থাৎ "আলজিব" আছে। ইহা দ্বারের ন্যায় উভয়ের মধ্যে থাকিয়া চর্ব্বিত দ্রব্য গিলনোপযোগী না হইলে নালী মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না। ইহার দ্বারা নাসিকার অন্তঃছিদ্রও বদ্ধ থাকে, এবং গিলনকালীন ভক্ষ্যদ্রব্য নাসিকারন্ধ্রে আসিতে দেয় না। অন্ননালী অন্য সময়

প্রায় লিপ্ত থাকে, এবং ভক্ষ্যদ্রব্য গলাভ্যন্তরে পতন হইলেই উহা স্ফীত হয়, এবং উহার মাংসপেশীর পুনঃসঙ্কোচন দ্বারা ভুক্ত-দ্রব্য ক্রমে পাকস্থলীতে উপস্থিত হয়।

৫, পরিপাক।—এই কার্য্য কিয়ৎপরিমাণে পাকস্থলীতে এবং সম্পূর্ণরূপে ক্ষুদ্রঅন্ত্রে সম্পাদিত হয়। অন্ননালী, বক্ষ ও উদর-মধ্যচ্ছেদ-মাংসপেশী ভেদ করিয়া পাকস্থলীর সহিত যোগ হয়। আমাশয় অর্থাৎ পাকস্থলী উদরের উপরিভাগে ও ঈষৎ বামপার্শ্বে এবং উক্ত মাংসপেশীর নিম্নে স্থিত। পাকস্থলী স্বভাবতঃ অত্যন্ত সঙ্কোচন ও স্ফীতশক্তি সম্পন্ন। ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলীতে উপস্থিত হইলেই, উহার গাত্র হইতে এক প্রকার জলবৎ অম্লরস নির্গত হইয়া ঐ সকল দ্রব্যকে পরিপাক করিতে থাকে। এই পাচক রস পাকস্থলীর গাত্রস্থিত বহুসংখ্যক সূক্ষ্মনলী হইতে উৎপন্ন হয়, এবং ইহাকে আমাশয়িক রস কহে। আহার দ্বারা পাকস্থলী উত্তেজিত হইলেই ইহা নিঃসৃত হয়। বিজ্ঞান-বিদ্ পণ্ডিতেরা বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এই রস রসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা দ্রব্য বিশেষকে দ্রব করিয়া ফেলে, এবং এই পাচক শক্তি যে কেবল পাকস্থলী মধ্যেই প্রকাশ পায় এমত নহে, যথাযোগ্য উত্তাপ সংযোগে শরীরের বাহিরেও হইতে পারে। কোন প্রাণীর পাচক রস একটী ভাণ্ডে রাখিয়া তাহার আহার্য্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া যথাযোগ্য তাপ সংযোগ করিলে উহা দ্রবীভূত হয়। এই রস অম্ল এবং ইহাতে লবণ-সংযুক্ত-মহাদ্রাবক আছে। মাংস, দুগ্ধ গোধূমসার ইত্যাদি এই রসে উত্তম রূপে জীর্ণ হয়। কিন্তু বসা শর্কর বা শ্বেতসার দ্রবীভূত করিবার ইহার ক্ষমতা নাই। ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলীতে উপস্থিত হইবামাত্র উহা বার-ম্বার এক দিক হইতে অন্য দিকে চালিত ও ঘূর্ণিত হইতে থাকে, এবং এই সময় পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রঅন্ত্রের মধ্যে যে দ্বার আছে তাহা রুদ্ধ থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভুক্ত দ্রব্যের কিয়দংশ দ্রব হইয়া অবশিষ্ট ভাগ কর্দ্দমের ন্যায় রূপান্তর না হয়, ততক্ষণ

উহার কোন অংশ ক্ষুদ্রঅন্ত্রে অর্থাৎ পক্বাশয়ে যাইতে পারে না। মার্টিন নামক এক ব্যক্তি বন্দুকের গুলির দ্বারা আহত হইলে, ঐ গুলি তাহার পাকস্থলী ছেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। ডাক্তার বোমণ্ট এই ব্যক্তিকে ছয় মাস চিকিৎসা করেন এবং সেই সুযোগে অনেক পরীক্ষা দ্বারা পাকক্রিয়া সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। আমাশয়িক রস যে পাকস্থলী হইতে নিঃসৃত হয় এবং ভুক্তদ্রব্য যে উহার মধ্যে আন্দোলিত হয়, তাহা তিনি ঐ ছিদ্র দ্বারা দৃষ্টি করিয়া স্থির করেন। তিনি ইহাও স্থির করেন যে, মাংসাদি দ্রব হইতে প্রায় তিন ঘণ্টা লাগে। এইরূপে ভুক্তদ্রব্য দ্রবীভূত হইলে উহার কিয়দংশ জলবৎ হইয়া আমাশয় সংলগ্ন অসংখ্য সূক্ষ্ম শিরা দ্বারা শোষিত হয়। অবশিষ্ট পিণ্ডবৎ পদার্থ ক্ষুদ্রঅন্ত্রে প্রবেশ করে। এই স্থানে নানা রসের দ্বারা মিশ্রিত হইয়া উহার পরিপাক কার্য্য সম্পূর্ণ হয়।

৬, সারকরণ।—পাকস্থলীর দক্ষিণ শেষভাগ ক্রমে সরু হইয়া ক্ষুদ্র অন্ত্রে মিলিত হয়। অন্ত্র (যাহাকে ভাষা কথায় আমরা "নাড়ী ভুড়ী" বলি) লম্বা ও নলাকৃতি এবং উদর মধ্যে পরস্পর জড়িত ভাবে অবস্থিতি করে। ইহা প্রধান দুইভাগে বিভক্ত, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্র। ক্ষুদ্র অন্ত্রের প্রথম ভাগকে পক্বাশয় বলে এবং ইহার পরিমাণ দ্বাদশ অঙ্গুলি মাত্র। এই পক্বাশয়ে, ভুক্তদ্রব্য তিন প্রকার রসের দ্বারা মিশ্রিত হয়, যথা পিত্তরস, ক্লোমরস এবং পক্বাশয়-রস। পিত্তরস যকৃৎ হইতে উৎপন্ন হয়। উদরের উপরিভাগে দক্ষিণ-পার্শ্বে যকৃৎ নামক এক যন্ত্র আছে। ইহার গাত্রে একটী থলি সংলগ্ন আছে, যাহাতে ঐ পিত্তরস উৎপন্ন হইয়া সঞ্চিত হয়। এই থলি হইতে একটী সূক্ষ্ম নালী দ্বারা ঐ রস পক্বাশয়ে গমন করে। লালা এবং আমাশয়িক রসের ন্যায়, সময়ানুসারে নিঃসৃত না হইয়া পিত্তরস সর্ব্বদাই নিঃসরণ হয়। ইহা হরিদ্বর্ণ তিক্তরস এবং ঈষৎ ক্ষারসংযুক্ত। পিত্তরসের কার্য্য সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বসম্মত মত এই যে, বসা ও তৈলাক্ত

দ্রব্যাদি এই রসে জীর্ণ হয়। উদরের বামভাগে এবং পাকস্থলীর নিম্নে ক্লোম নামে একটী যন্ত্র আছে, তাহা হইতে ক্লোম রস উৎপন্ন হয়, এবং একটী সূক্ষ্ম নালীর দ্বারা ক্ষুদ্রঅন্ত্রে উপস্থিত হয়। ইহা লালার ন্যায় জলবৎ তরল ও নির্গন্ধ, এবং কার্য্যেও উক্ত রসের স্বরূপ। আহার্য্য দ্রব্যের যে সমস্ত শ্বেতসার (ষ্টার্চ) লালার দ্বারা শর্করে পরিবর্ত্তিত না হইয়া পাকস্থলীতে উপস্থিত হয়, ক্লোমরস দ্বারা তাহারা এই স্থানে পরিবর্ত্তিত হয়, এবং এই গুণ লালা অপেক্ষা ইহাতে অধিক পরিমাণে আছে।

আর এক প্রকার রস ক্ষুদ্র অন্ত্রের গাত্র হইতে উৎপন্ন হয়, এবং আমাশয়িক ও ক্লোমরসের যে গুণ আছে, ইহাতে সেই উভয় গুণই আছে। এই পাঁচ প্রকার রসের মধ্যে কোন একটীর অভাব, বা নিয়মিত ভাগের অল্পতা হইলেই পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে।

৭, আচূষণ।—ভুক্ত দ্রব্যের পিণ্ডবৎ অংশ পাকস্থলী হইতে পক্বাশয়ে উপস্থিত হইয়া, ও উক্ত পাঁচ প্রকার রসের দ্বারা সংশোধিত হইয়া, দুই ভাগে বিভক্ত হয়, এক ভাগ দুগ্ধবৎ তরল, শ্বেতবর্ণ সার অংশ, এবং অপর ভাগ ক্লেদপূর্ণ অসার পদার্থ। এই সার অংশ ক্ষুদ্রঅন্ত্র সংলগ্ন অসংখ্য চোষণীয় শিরা দ্বারা চোষিত হইয়া ক্রমশঃ রক্তে পরিণত হয়। চোষণীয় শিরা সমূহ একটী প্রধান রসবাহিনী শিরায় সংযুক্ত হয়, এবং এই প্রধান শিরা মেরুদণ্ডের উপর দিয়া গমন করিয়া কণ্ঠাস্থিত নিম্নস্থিত রক্ত-শিরার সহিত যোগ হয়।

৮, মলত্যাগ।—ক্লেদপূর্ণ অসার ভাগ ক্রমে ক্ষুদ্রঅন্ত্র হইতে চালিত হইয়া বৃহৎঅন্ত্রে সঞ্চিত হয় এবং সময়ানুসারে শরীর হইতে পরিত্যক্ত হয়। ক্ষুদ্র এবং বৃহৎঅন্ত্রের মধ্যে যে দ্বার আছে, উহা এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, মল ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎঅন্ত্রে অনায়াসে যাইতে পারে, কিন্তু বৃহৎঅন্ত্রে একবার প্রবেশ করিলে উহা ক্ষুদ্রঅন্ত্রে পুনর্গমন করিতে পারে না। মল বৃহৎঅন্ত্রে থাকিয়া

ক্রমে নীরস ও গাঢ় হয়। পুনঃ সঙ্কোচন দ্বারা কীটাঙ্গ যেরূপ তরঙ্গের ন্যায় সঞ্চালিত হয়, সেইরূপ বৃহৎঅন্ত্রের মাংসপেশীর পুনঃ সঙ্কোচন দ্বারা মল ক্রমে মলদ্বারের নিকট অগ্রসর হয়। মলদ্বার একটী অঙ্গুরীয়ের ন্যায় মাংসপেশীদ্বারা বেষ্টিত, এবং উহার সঙ্কোচিত অবস্থা প্রযুক্ত ঐ দ্বার বদ্ধ থাকায়, মল আপন ইচ্ছায় বহির্গত হইতে পারে না। মলত্যাগ আমাদিগের ইচ্ছাধীন, এবং বিশেষ বেগ দ্বারা বৃহৎঅন্ত্র, উদর ও অন্যান্য মাংসপেশী সঙ্কোচিত হইয়া এবং মলদ্বারের মাংসপেশী বর্দ্ধিত হইয়া মল নির্গত হয়।

পাক-যন্ত্র।

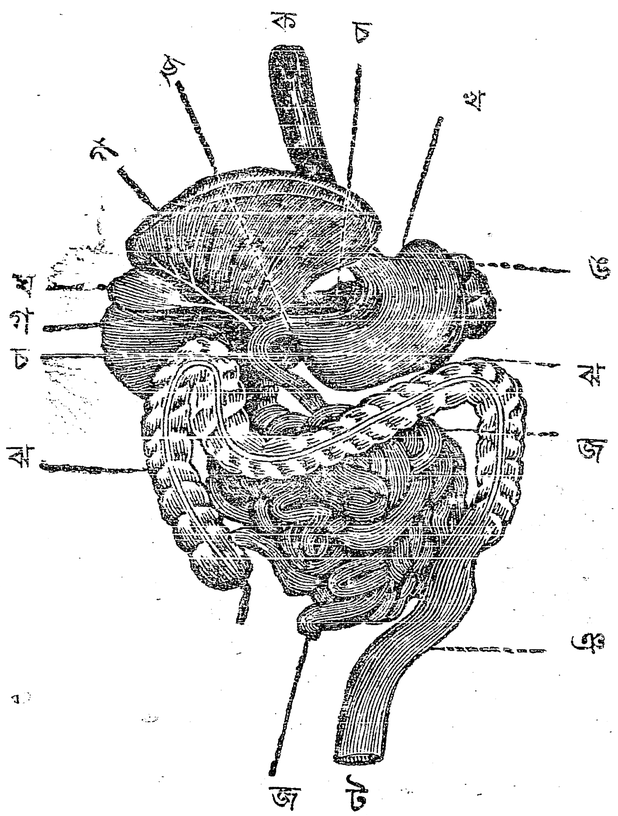

ক, অন্ননালী। খ, পাকস্থলী। গ, গ, যকৃত। ঘ, পিত্তস্থলী। ঙ, প্লীহা। চ,চ, ক্লোমযন্ত্র। ছ,পক্বাশয়। জ,জ, ক্ষুদ্রঅন্ত্র। ঝ, বৃহৎ-অন্ত্র। ঞ, মলাশয়। ট, মলদ্বার।

বামাগণের-রচনা।

মনুষ্য জীবন।

হে প্রভো জগৎপিতঃ, দয়াময় সুবিদিত,
তব পদে করি প্রণিপাত।
কাতরে ডাকিছি আমি, তুমি হে অন্তরযামী
মম বাক্যে কর কর্ণপাত॥
গত কাল কত কাল, জীবের জীবন-কাল,
কালে কালে সংহারিল সবে।
আবার আসিছে কাল, না মানিবে কালাকাল,
গুপ্তে আসি কেশে ধরে লবে॥
কৃতান্ত করুক গ্রাস, কিম্বা করি বনে বাস,
সুখ আশে অভিলাষ নাই।
'পতিত-পাবন' নাম, ধর অহে গুণধাম,
পতিতে চরণে দিও ঠাঁই॥
ভক্তের জীবন তুমি, ভক্তি-হীন হৃদি-ভূমি,
তব প্রেম বুঝিতে না পারি।
যে তব প্রেমিক হয়, সদাই তাহার জয়,
সাধু সেই, প্রেমিক ভাণ্ডারী!
স্থাবর জঙ্গম ভূমি, সকলের স্বামী তুমি,
তুমি কর সৃজন পালন।
তুমি দিয়া কলেবর, জীবেরে পালন কর,
সময়েতে করহ হরণ॥
এই যে আমার দেহ, যার প্রতি এত স্নেহ,
এত মায়া যার জন্য করি।
কালের করাল গ্রাসে, ইহাও যাইবে নাশে,
প্রাণিপূর্ণ ধরা পরিহরি॥
যতক্ষণ বহে শ্বাস, কত রূপ অভিলাষ,
পরিহাস পরম কৌতুক।
প্রবাল - মুকুতা - হারে, নানামত অলঙ্কারে,
রচি বেশ ভাব কত সুখ॥

কত কথা বলিতেছ, কত ভাবে গলিতেছ,
ইচ্ছামত চলিছ চরণে।
শ্রবণে শ্রবণ কর, মধুর বাঁশরী-স্বর,
মনোহর হেরিছ নয়নে॥
পেয়ে কর সুখকর, সম্পদ সম্ভোগ কর,
রসনায় রস লহ সুখে।
এ ভাব কভু না রবে, ত্যাজিয়ে বান্ধব সবে,
একা যাবে কৃতান্ত সম্মুখে॥
দেহ নাশ হবে যবে, রসনা নীরস হবে,
শ্রবণে না করিবে শ্রবণ।
পদযুগ না চলিবে, কর নাহি বিস্তারিবে,
দ্বার মুদি রহিবে নয়ন।
নিশ্চিত কিছুই নাই, আজি কিম্বা কালি যাই,
কিম্বা যাব কিছুকাল পরে॥
ইহার মধ্যেতে যবে, ঘোর নিশি পোহাইবে,
কার সাধ্য কে রাখিবে ধরে।
এলে পরে শেষ দিন, উপায় হইবে হীন,
হবে দীন সুদিন না রবে।
গেলে আর আসিবে না, ভব-হাটে খেলিবেনা,
বিনা বাক্ থাকিবে নীরবে॥
শমন আসিয়া শেষে, ধরিয়া লইবে কেশে,
কে তোমার তুমি কোথা রবে।
জীবন যৌবন ধন মিছামিছি আকিঞ্চন,
চিরস্থায়ী কিছু নহে ভবে॥
দেখে শুনে এ অদ্ভুত, হও মন বশীভূত,
কর হিত বিধান ইহার।
বিশ্ব মাঝে দৃষ্টি কর, জলে নানা জলচর,
স্থলে কত প্রাণীর সঞ্চার॥
ইহাদের পিতা যিনি, শিবময় শিব তিনি,
তাঁর পদে কর নমস্কার।
প্রসন্ন হইলে বিধি, পরলোকে প্রাণনিধি,
পাবে স্বর্গ—সুখের আগার।

শ্রীমতী—

ভীষণা।

অরুণ-নয়না, লোহিত-বসনা,
করাল-বদনা, কে এ কামিনী?
বিলোল-রসনা, বিকট-দশনা,
কাঁচলি-কসনা, লোহ-পায়িনী।

শঙ্খ মনোহর, দন্ত ভয়ঙ্কর,
পাশুপত শর, অসি-ধারিণী।
বজ্র খরধার, মহাপাশ আর
করেতে উঁহার; মুণ্ড-মালিনী।

অন্যতর করে, কোদণ্ড বিহরে;
নাচিছে সমরে, রণ-রঙ্গিণী।
ভীষণ-দর্শন, চক্র সুদর্শন,
করিয়া ধারণ, শোভে ভামিনী।

আছে করদ্বয়, বরাভয়ময়;
দিতেছে অভয়, ভয়-বারিণী।
সেবকের প্রতি, সুপ্রসন্না অতি,
সুখদা-শুভদা, বর-দায়িনী।

বীরেন্দ্র-পূজিতা, দশ-ভুজান্বিতা,
সমর ঈপ্সিতা, কে এ রমণী?
কভু হেরি স্থির, কভু বা অস্থির,
সর্ব্বাঙ্গে রুধির, রক্ত-বরণী।
হুঁকার-নাদিনী, মহিষ-ঘাতিনী,
অসুর-নাশিনী, সুর-রক্ষিণী।
হর্য্যক্ষ-বাহিনী, প্রলয়-কারিণী,
প্রলয়-বারিণী, অট্ট-হাসিনী।

বীররসে মাতি, আছে দিবা রাতি;
শরীরের ভাতি, যেন তরণি।
নাহি টুটে বল, না হয় বিকল;
নয়নে অনল; কে এ তরুণী?

ভক্ত জনে দয়া, করিয়া অভয়া,
দিছে পদছায়া; ভয়-হারিণী।
লভিতে যতন, করে বীরগণ,
পূজিয়ে চরণ, যশের মণি।

চিনিনু ইহায়,—এ রণ বিদ্যায়
বিখ্যাত ধরায়, যশো-দায়িনী।
ভীষ্ম কর্ণ বীর, দ্রোণ দশশির,
রাঘব প্রবীর, পূজিতা ধনী।

সিজর-পূজিতা, অর্জ্জুন-সেবিতা,
ভীম-আরাধিতা, ভীম-রূপিণী।
ব্রিটণীয়াগণ, করি প্রাণ পণ,
করে আরাধন, পেল ধরণী।

স্বাধীনতা হার, পরিতে যাহার,
ইচ্ছা অনিবার, উচিত তার,
সেবি ও চরণ, স্বাধীনতা-ধন,
করি আহরণ, গাঁথিতে হার।

শ্রীমতী ললিতাসুন্দরী দেবী,
তারপাশা।

ঈশ্বর।

শ্রী হরি ভজনে মন, সদা যে রাখিবে।
ম জিবে না এ সংসারে, তরিয়া যাইবে॥
তি মির আলোক দেখে, যেমন পলায়।
চা ঞ্চল্য মনের যায়, তাঁহার কৃপায়॥
ঋ গ্ন মন হয়ে আছে, অজ্ঞান-বিকারে।
মো হ জাল কেটে হরি, বাঁচাও আমারে॥
হি তকারী তোমা বিনা, কে আছে ভুবনে।
নী রস হ'ও না প্রভু স্নেহ-বিতরণে॥
দা সীরে কর হে দয়া, এই আকিঞ্চন।
সী মন্তিনী ভক্তিভাবে ধরে ও চরণ॥

সংবাদসার।

যুবরাজ অনুমান ২৮শে নবেম্বরে বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইবেন। তিনি ৭।৮ দিন বোম্বাই নগরে যাপন করিয়া বেপুর ও সিংহল প্রভৃতি স্থানে গমন করিবেন। সেখান হইতে জাহাজে করিয়া কলিকাতায় আসিবেন। কলিকাতায় ১২।১৪ দিন থাকিয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিবেন।

শ্রীমতী হৈমবতী দেবী কোন কুলীন ব্রাহ্মণপত্নী, তাঁহার স্বামীর নামে খোরপোষের জন্য হাইকোর্টে নালিস করিয়া, মাসিক দশ টাকার ডিক্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ব্রাহ্মণ প্রথমে হৈমবতী দেবীকে বিবাহ করেন, পরে দ্বিতীয় স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া প্রথম স্ত্রীকে প্রকৃতার্থে ত্যাগ করিয়া তাহার পিত্রালয়ে ফেলিয়া রাখেন। তিনি ৯০ টাকা মাহিয়ানা পান, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীকে গৃহে লইয়া যাইতেন না, এবং খোরপোষও দিতেন না। তাঁহার প্রথমা ভার্য্যা হৈমবতী অতি সচ্চরিত্রা ও শান্ত-স্বভাবা।

স্ত্রীশিক্ষা।

পূর্ব্বসংখ্যায় স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালীর অসম্পূর্ণতা ও নিষ্ফলতার উল্লেখ করা হইয়াছে। এক্ষণে কি প্রকারে ঐ প্রণালী সংশোধিত হইতে পারে, তাহার বিবেচনা করা আবশ্যক। কিন্তু সংশোধনের প্রকৃত উপায় নির্দ্দেশ, এবং নির্দ্দিষ্ট উপায়ের যথাযোগ্য প্রয়োগ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। সামাজিক নিয়মের এবং ব্যক্তি সাধারণের বর্ত্তমান অবস্থার বিশিষ্টরূপ পরিবর্ত্তন না হইলে, উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বনের অধিক আশা নাই। যাঁহারা কন্যা বা ভগ্নীগণকে উত্তম শিক্ষা প্রদান করিতে সচেষ্ট, উপযুক্ত শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর অভাবে তাঁহাদিগকে অপ্পায়াসের পরই ক্ষান্ত থাকিতে হয়। যদিও উত্তম শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী পাওয়া যায়, তাহাদের বেতন দিবার ক্ষমতা অনেকেরই নাই। শিক্ষা-প্রণালীর উৎকর্ষ সাধনে যাঁহাদের আন্তরিক যত্ন আছে, তাঁহারা সাধারণের উৎসাহ ও সাহায্য অভাবে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। যাঁহাদের ধন আছে, তাঁহাদের মন নাই। সুশিক্ষিত মধ্যবিত্ত লোকেরা প্রায় অর্থোপার্জ্জনেই ব্যস্ত থাকেন। ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা এমন ক্ষুদ্র বিষয়ের চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে অবকাশ পান না। অন্তঃপুরবাসিনী বিবাহিতা স্ত্রীগণের শিক্ষা সম্বন্ধে, প্রায় কেহই বিশেষরূপে মনোযোগী নহেন। যে দুই চারি-জন স্ত্রীশিক্ষার অধিক অনুরাগী, তাঁহারা এই ভাবিয়া নিরস্ত হয়েন যে, বিবিধ প্রকার সমাজ-সংস্করণ সম্পাদিত না হইলে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি দুঃসাধ্য। কিন্তু এইরূপ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কি যুক্তিসিদ্ধ? প্রবাহিত নদীর সমস্ত জল ক্রমে ক্রমে সমুদ্রে নিপতিত হইলে, নদীর শুষ্ক তলোপরি পদব্রজে গমন করিয়া নদী পার হইবেন মনে করিয়া, যে পথিক নদীতটে বসিয়া অপেক্ষা করেন, তিনি কখনই নদী পার হইতে পারেন না। যে সময়ে যে উপায় উপস্থিত হয়, তৎকালে তাহাই অবলম্বন করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

অতএব বর্ত্তমান অবস্থায় স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালী যে পরিমাণে যে যে উপায় দ্বারা সংশোধিত হইতে পারে, সেই সকল উপায় প্রয়োগ করিয়া সেই পরিমাণে শিক্ষাপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধন করা নিতান্ত আবশ্যক।

যে যে উপায় এক্ষণে অবলম্বিত আছে, সর্ব্বাগ্রে তাহাদেরই দোষ গুণ বিচার করা যাউক। আমরা পূর্ব্বসংখ্যায় বলিয়াছি যে, বিবাহিতা হিন্দু বামাগণের শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণতঃ এক মাত্র উপায় লক্ষিত হয়, তাহাও কেবল এই মহানগরীর সীমার মধ্যে নিবদ্ধ। "জানানা মিসান," অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক সম্প্রদায়ের পালিত শিক্ষয়িত্রী দ্বারা সপ্তাহে দুই চারি দিবস, অথবা প্রত্যহ এক এক ঘণ্টা পুস্তক পাঠে কিম্বা সূচিকা কর্ম্মে যে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহাই ঐ একমাত্র উপায়। স্বামী বা পরিবারস্থ অপর কোন ব্যক্তির নিকট বিবাহিতা কন্যারা যে ক্ষণিক এবং নিয়ম ও উদ্দেশ্যশূন্য উপদেশ সময়ে সময়ে পাইয়া থাকেন, তাহাকে শিক্ষাপ্রণালী মধ্যে গণ্য করা যায় না।

"জানানা" একটী পারস্য ভাষার শব্দ, উহার অর্থ, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধীয়; "মিসন" একটী ইংরাজী শব্দ, উহার সাধারণ অর্থ, কোন বিশেষ কর্ম্মে প্রেরিত হওয়া, অথবা ঐরূপ প্রেরিত ব্যক্তি সমূহের সম্প্রদায়; উহার বিশেষ অর্থ, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার জন্য প্রেরিত ব্যক্তি সমূহের সম্প্রদায়। যাঁহারা খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার জন্য ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের নাম "ইংলিস (ইংলণ্ডীয়) মিসন", স্কটল্যাণ্ড হইতে প্রেরিত সম্প্রদায়ের নাম "স্কচ (স্কটল্যাণ্ডীয়) মিসন", আমেরিকার প্রেরিত সম্প্রদায়ের নাম "আমেরিকান মিসন"। অতএব "জানানা মিসন" পদের অর্থ, অন্তঃপুরবাসিনী বামাগণের মধ্যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচার জন্য যে সকল স্ত্রীলোক নিয়োজিত আছেন, তাঁহাদের সম্প্রদায়। যাহা "মিসন" শব্দের বিশেষ অর্থ, তাহাই মিসনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। "জানানা মিসন" প্রবং পুরুষ সম্পর্কীয় অপরাপর মিসন, সকলেরই মুখ্য উদ্দেশ্য খৃষ্ট-ধর্ম্মপ্রচার। ইহা কোন সম্প্রদায়ে কেহই গোপন করেন না, এবং তাঁহাদের কার্য্যেও ঐ অভিপ্রায় স্পষ্ট লক্ষিত হয়। সাহিত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদান, ঐ মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনের একটী নিতান্ত প্রয়োজনীয় উপায়; এবং তজ্জন্যই ইংলণ্ডীয়, স্কটলণ্ডীয়, এবং আমেরিকান মিসন দ্বারা এদেশের স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। এদেশীয় বামাগণের শিক্ষার্থে যে "জানানা মিসন" সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহারও মুখ্য উদ্দেশ্য বামাগণকে খৃষ্টধর্ম্মে উপদেশ দান করা। কয়েক মাস গত হইল আমরা একটী মিসনের তত্ত্বাবধানাধীন কয়েকটী বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক দান কার্য্যে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তিন চারিটী বিদ্যালয়ের বালিকারা একত্রিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটীর ছাত্রীরা সকলেই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ও উক্ত মিসন কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত, অপর বিদ্যালয়গুলির ছাত্রীরা হিন্দুধর্ম্মাক্রান্ত হিন্দু-পরিবারস্থ কন্যা। পারিতোষিক দান সমাপ্ত হইলে, সভাপতি বক্তৃতাকালে সমবেত সকল বিদ্যালয়স্থ ছাত্রীর সংখ্যা, এবং জানানা-মিসন কর্ত্তৃক শিক্ষিতা অন্তঃপুরবাসিনী বামাগণের সংখ্যা সংযোগ করিয়া, সাতিশয় আহ্লাদ ও গৌরব প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন যে, এত সংখ্যক বামাগণের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচার-কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হইতেছে। ইহার কিছু কাল পরে, আমাদের একজন আত্মীয় আপন কন্যা ও পুত্র-বধূগণকে উত্তম শিক্ষা-দিবার অভিপ্রায়ে একটী জানানা-মিসানের তত্ত্বাবধারক এক-জন পাদ্রী সাহেবের নিকট একজন সুশিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রীর প্রার্থনা করেন, কিন্তু ঐ আত্মীয় ব্যক্তি প্রার্থনাকালে ইহাও প্রকাশ করেন যে, প্রার্থিত শিক্ষয়িত্রী ধর্ম্ম বিষয়ে কোন উপদেশ দিতে পারিবেন না। তাহাতে পাদ্রি সাহেব এই মর্ম্মে উত্তর প্রদান করিলেন যে, ধর্ম্মশিক্ষা যে স্থানে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ, সেখানে শিক্ষয়িত্রী পাঠাইবার প্রস্তাবে তিনি তাঁহার সম্প্রদায়স্থ অপরাপর কর্ত্তৃপক্ষীয় সাহেবদিগকে জিজ্ঞাসা না করিয়া উত্তর দিতে পারেন

না। কয়েক দিবস পরে উক্ত পাদ্‌রি সাহেব এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়া পাঠান যে, ধর্ম্মোপদেশ বর্জ্জিত সাহিত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা-দান জন্য তাঁহাদের সম্প্রদায়স্থ কোন শিক্ষয়িত্রী প্রেরিত হইতে পারে না। অতঃপর, এক দিবস একজন এদেশীয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী শিক্ষয়িত্রী, শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইবার প্রত্যাশায় ঐ আত্মীয়ের বাটীতে আসিয়া বেতনাদি বিষয়ের নির্দ্ধারণ করিয়া পরদিবস অবধি শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইবেন স্বীকার করিলেন, কিন্তু যাইবার সময় শুনিলেন যে, তিনি ধর্ম্মোপদেশ দিতে পারিবেন না। তখন তিনি বলিলেন, "আমি জানানা-মিসানের বেতনভোগী, সুতরাং খৃষ্টধর্ম্ম সংক্রান্ত কিছুমাত্র উপদেশ না দিতে পারিলে আমি শিক্ষা-দানের ভার গ্রহণ করিতে পারিব না।" অবশেষে আর এক-জন এদেশীয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী শিক্ষয়িত্রী ঐ আত্মীয়ের কন্যাগণের শিক্ষাদানে স্বীকৃত হইলেন, ইনি পূর্ব্বে জানানা-মিসনের অধীনে কর্ম্ম করিতেন, কিন্তু কোন কারণবশতঃ জানানা-মিসনের সহিত তাঁহার সম্পর্ক রহিত হইয়াছিল। ফলতঃ, জানানা-মিসনের প্রধান উদ্দেশ্য যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার, তাহা ঐ মিসন সংক্রান্ত অধ্যক্ষেরা ও শিক্ষয়িত্রীরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। হিন্দু গৃহ-স্বামীদিগের মধ্যে অনেকেই কন্যা বা পুত্রবধূকে জনৈক শিক্ষ-য়িত্রীর হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। ঐ শিক্ষয়িত্রীকে নিযুক্ত করিবার সময়ে এই মাত্র বলিয়া দেন, যেন কন্যা উত্তম-রূপে লিখিতে ও পড়িতে পারে এবং সূচীকর্ম্মে নৈপুণ্যলাভ করে; ধর্ম্মোপদেশ সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন না, কারণ সাধারণতঃ হিন্দুসমাজে এই ধারণা আছে যে, শিক্ষয়িত্রীরা বামাগণকে কেবল লেখাপড়া ও সূচীকর্ম্ম শিখাইবার জন্যই ঘুরিয়া বেড়ান। অনেকে জানানা-মিসনের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানেন না। কিন্তু শিক্ষয়িত্রীরা মিসনের উদ্দেশ্য অনুযায়িক, পাঠাদি সময়ে ধর্ম্ম বিষয়ের উল্লেখ করিয়া থাকেন। কেহ বা সাধারণ নীতি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পোষকতার স্বরূপ, বাইবেল

(খৃষ্টধর্ম্ম-পুস্তক) হইতে কোন কোন অংশের উল্লেখ করিয়া বলেন, প্রভু যিশুখ্রীষ্ট এমন স্থলে এই বলিয়াছিলেন। কেহ বা উদাহরণচ্ছলে, বাইবেলের উল্লিখিত কোন ব্যক্তির চরিত্র বর্ণন করেন। কেহ বা সময়ে সময়ে, বাঙ্গলাভাষায় অনু-বাদিত বাইবেলের কিয়দংশ পাঠ করিয়া শ্রবণ করান, অথবা ছাত্রীকে একখানি বাইবেল দান করিয়া যান এবং অবকাশকালে ঐ পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করেন।

যাঁহার যেটী মুখ্য উদ্দেশ্য, তাঁহাদ্বারা সেই কার্য্যই উত্তমরূপে সম্পাদিত হইতে পারে। অপরাপর কার্য্যে তাঁহার তাদৃশ যত্ন থাকিতে পারে না। সুতরাং আমাদের বিবেচনায়, জানানা-মিসন কর্ত্তৃক খৃষ্টধর্ম্মের উপদেশ দানই উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হওয়া সম্ভব। এখন আমাদিগের হিন্দু ভ্রাতৃবর্গকে এই জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কি কন্যাগণকে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী করিবার অভিপ্রায়ে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া থাকেন? যদি তাঁহাদের এই অভি-প্রায় হয়, তাহা হইলে জানানা-মিসনের আশ্রয় লওয়া যুক্তি-যুক্ত। যদি উত্তমরূপ লেখাপড়া ও হিন্দু পরিবারস্থ রমণী-গণের করণীয় গৃহকার্য্য ও আচার ব্যবহার নীতি ইত্যাদি শিখান গৃহস্বামীদিগের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে জানানা-মিসন কর্ত্তৃক তাঁহাদের সে আশা পরিপূরিত হইবার সম্ভাবনা নাই। জানানা-মিসনের অনেকেই বাঙ্গালা ও ইংরাজী সাহি-ত্যাদি অত্যল্পমাত্র জানেন, সুতরাং তাঁহাদের সাহায্যে লেখা পড়ার আরম্ভমাত্র হইতে পারে, অধিক বিদ্যালাভের আশা নাই। সূচীকর্ম্মে তাঁহারা নিপুণ, সুতরাং তাঁহাদের উপদেশে সূচী কর্ম্মে পারিপাট্য লাভ হইতে পারে।

আমরা পূর্ব্বসংখ্যায় স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যের বর্ণনা করি-য়াছি। সেই সকল উদ্দেশ্য জানানা-মিসন কর্ত্তৃক কত দূর সাধিত হওয়া সম্ভব? জানানা-মিসনের ইউরোপীয় শিক্ষয়িত্রীরা প্রায় সকলেই অল্পবয়স্কা ও অবিবাহিতা, তাঁহারা স্বয়ংই লেখা

পড়া যৎসামান্য শিখিয়াছেন, সংসারের নিয়মের ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের কিছুমাত্র দেখেন নাই, হয়ত তত্তদ্বিষয়ের কিছুমাত্র অনুধাবনও করেন নাই। যাহাতে তাঁহারা স্বয়ং অজ্ঞ, সেই সেই বিষয়ের উপদেশ দানে তাঁহারা কি প্রকারে যোগ্য হইতে পারেন? শিক্ষিতের মনোবৃত্তির উৎকর্ষণ, প্রবৃত্তি সমূহকে সৎপথে ধাবিত করা, রিপুদলের যথাযোগ্য শাসন, বিবিধ প্রকারে স্বামীর মনস্তুষ্টি সাধন, এবং তাঁহার শারীরিক মানসিক বৈষয়িক ও পরিবারস্থ সকল বিষয়ের সম্যক কুশল সম্পাদন, সন্তানের লালনপালন ও সন্তানের দৈহিক ও আন্তরিক শক্তিসমূহের সুচারু বিকাশন ও বর্দ্ধন সম্বন্ধে যথোচিত সৌকর্য্য সাধন প্রভৃতি, যে যে কার্য্যের পারদর্শিতা স্ত্রীশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য, তত্তদ্বিষয়ে অল্পবয়স্কা অল্পশিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রীরা কি উপদেশ দিতে পারেন? তাঁহারা সূচীকর্ম্মে ও কথঞ্চিৎ বাইবেলের ইতিহাসে শিক্ষাদানে পারদর্শী। স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যে তাঁহারা সম্যক্ অনভিজ্ঞ।

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী শিক্ষয়িত্রী সম্বন্ধে আর একটী আপত্তি কেহ কেহ উত্থাপন করিয়া থাকেন। ঐ শিক্ষয়িত্রীদলের কতকগুলি নীচবংশীয়া। তাহাদের চরিত্র দূষিত না হইতে পারে, কিন্তু ভদ্রকুলোদ্ভবা কামিনীগণের আচার ব্যবহার তাহারা কিছুই জানে না। এমন কি ভদ্রকুলোদ্ভবা অনেক রমণী তাহাদের বাক্য শ্রবণে, আরাধ্যা শিক্ষয়িত্রী বিবেচনা না করিয়া তাহাদিগকে অনালাপ্য দাস দাসীর শ্রেণীতে গণ্য করেন, সুতরাং তাহাদের প্রদত্ত উপদেশ কার্য্যকারী হয় না।

আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণমধ্যে এই একটী অদ্ভুত চরিত্র লক্ষিত হয় যে, তাঁহারা কোন বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্বে কখনই প্রবৃত্ত হন না, সকল বিষয়েরই বাহ্য ভাব দর্শনে সন্তুষ্ট থাকেন। ফলাফলের চিন্তা তাঁহাদের মনে একবারও উদয় হয় না। কন্যাগণকে শিক্ষা দেওয়া সাব্যস্তবিধেয় হইয়াছে জানিয়া শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু সে শিক্ষয়িত্রী কিরূপ পারদর্শী, কি শিখাইবেন, তাঁহার কি

উদ্দেশ্য, এ সকল বিষয়ের অনুধাবন এক মুহূর্ত্ত জন্যও করেন না। যদি কেহ কখন হঠাৎ শুনিতে পান যে, তাঁহার কন্যার ঘরে একখানি বাইবেল রহিয়াছে, কিম্বা কন্যার পাঠসময়ে শিক্ষয়িত্রী কোন দিবস যিশুখৃষ্টের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক কয়েকটী কথা বলিতেছিলেন, গৃহস্বামী তৎক্ষণাৎ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া শিক্ষয়িত্রীকে আসিতে নিষেধ করেন এবং কন্যার পাঠেরও শেষ হইয়া যায়।

স্ত্রীশিক্ষার সুপ্রণালী কি, এক্ষণে তদ্বিষয়ে বিবেচনা করা আবশ্যক। সর্ব্বাগ্রে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। তাহা নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। যে কোন কর্ম্ম হউক, উহাতে পারিপাট্য লাভ করিতে হইলে ঐ কার্য্য দীর্ঘকাল যত্ন পূর্ব্বক শিখিতে হয় এবং উহার অভ্যাসও করিতে হয়। ইংলণ্ড এবং ইউরোপীয় সকল প্রদেশে যে ব্যক্তি যে ব্যবসায় অবলম্বন করেন, তাঁহাকে প্রথমে কোন বিদ্যালয়ে অথবা কোন সুযোগ্য ব্যক্তির নিকট ঐ ব্যবসায়ের সমস্ত কার্য্যে দীক্ষিত হইতে হয়, এবং যিনি দক্ষতার নিদর্শন পত্র দেখাইতে পারেন তিনিই ঐ ব্যবসায় সংক্রান্ত কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারেন। এমন কি পাদুকাকারের ব্যবসায়েও শিক্ষানবীশী অর্থাৎ কর্ম্ম-শিক্ষাবস্থা আছে। কিন্তু অস্মদ্দেশে বিদ্যাবুদ্ধি সুকৌশল সচ্চরিত্র প্রভৃতি বহু গুণসাধ্য শিক্ষকতা কর্ম্মেও শিক্ষানবীশী নাই। কথঞ্চিৎ লিখিতে পড়িতে পারিলেই সকলেই আপনাদিগকে শিক্ষকের গুরুভার গ্রহণে সমর্থ বিবেচনা করেন, এবং তাঁহাদের এরূপ স্বকল্পিত পারদর্শিতার প্রতি কেহই কিছুমাত্র সন্দেহ করেন না। গৃহমার্জ্জনা প্রভৃতি কার্য্যের জন্য দাস দাসী নিযুক্ত করিতে হইলে যেমন কেহই কোন বিশেষ গুণের পরিচয় লওয়া আবশ্যক বোধ করেন না, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত কালেও প্রায় সকলেই তদ্রূপ ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন।

পূর্ব্বসংখ্যায় স্ত্রীশিক্ষার যে সমস্ত প্রকৃত উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে, সেই সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী পারদর্শিতা লাভ না করিতে পারিলে, কেহই উত্তম শিক্ষয়িত্রী বলিয়া গণ্য হইতে

পারেন না। নগরের স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট "নর্ম্মাল স্কুল," অর্থাৎ শিক্ষয়িত্রীর শিক্ষা-জন্য বিদ্যালয় সংস্থাপন করা অতি কর্ত্তব্য। এই সকল নর্ম্মাল-স্কুলে কেবল লেখা পড়া ও সূচী কর্ম্মের চর্চ্চা না হইয়া উপদেশ দানের সুকৌশল, নারীগণের সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সুশীলতা ও ধর্ম্মপরায়ণতা প্রভৃতি অপরাপর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়েও যথোচিত শিক্ষা দান ও অভ্যাস করান আবশ্যক। অনেকেই বলিতে পারেন যে, এরূপ নর্ম্মাল-স্কুল স্থাপিত করা অসাধ্য। উহার ব্যয় কে দিবেন? উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীই বা কোথায় পাওয়া যাইবে, এবং নর্ম্মাল-স্কুলেই বা কে আপন পুত্রবধূ বা বিবাহিতা কন্যা বা ভগ্নীকে পাঠাইবেন? এই কারণেই বিটন-বালিকাবিদ্যালয়ের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট-স্থাপিত নর্ম্মাল-স্কুল অল্প দিবস মধ্যেই উঠিয়া যায়। উহার তত্ত্বাবধারণই বা কে করিবেন? এবম্প্রকার আপত্তি অনেকেই উত্থাপন করিবেন, আমরা বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু যত্নের অসাধ্য কিছুই নাই। এই সাধুবচনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা বলিতেছি যে, ইহা কষ্টসাধ্য হইতে পারে, কিন্তু অসাধ্য নহে। শত শত লক্ষপতি থাকিতে যে দুই চারিটী নর্ম্মাল-স্কুলের ব্যয় যুটিবে না, তাহা অগ্রাহ্য। সহস্র সহস্র বিদ্যোৎসাহী স্ত্রীশিক্ষানুরাগী ব্যক্তি থাকিতে যে তত্ত্বাবধান হইবে না, তাহাও অগ্রাহ্য। শিক্ষয়িত্রী পাওয়া দুষ্কর ইহা সত্য বটে, কিন্তু যতকাল সুপণ্ডিতা শিক্ষয়িত্রী না পাওয়া যায়, ততকাল দুই চারিজন প্রাচীন বিজ্ঞ সুপণ্ডিত পুরুষের দ্বারা অনেক বিষয়ের শিক্ষা প্রদত্ত হইতে পারে, এবং দুই চারিজন প্রাচীনা বুদ্ধিমতী রমণীদ্বারা অপর অনেক বিষয়ের শিক্ষা দেওয়াও হইতে পারে। অনেকে বিবাহিতা কন্যা ও ভগ্নীকে নিজ গৃহের বহির্গত হইয়া অপর স্থানে শিক্ষা জন্য যাইতে দিবেন না, এইটী এক প্রধান প্রতিবন্ধক বটে, কিন্তু এ প্রতিবন্ধকও অনিবার্য্য নহে। হিন্দুসমাজস্থ অনেকেই উহাদিগকে প্রকাশ্য স্কুলে পাঠাইতে অসম্মত। যে স্থলে সাহেব সুবো বা

অপরিচিত ব্যক্তির সমাগম হয়, কিম্বা যেখানে ছাত্রীদিগকে গাউন্ পরিয়া জুতা পায়ে দিয়া বিবির ন্যায় আচার ব্যবহার করিতে হয়, অথবা যথায় কোন বিশেষ ধর্ম্মবিষয়ের শিক্ষা প্রদান হয়, এমন স্থলে বিবাহিতা কামিনীকে অনেকেই পাঠাইতে চাহেন না; কিন্তু যদি প্রতি পল্লীর জনৈক ভদ্র ব্যক্তির বাটীতে ঐ ব্যক্তির পরিচিত কতকগুলি পরিবারের বিবাহিতা রমণীরা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে একত্রিত হন এবং কোন প্রাচীনা সুশিক্ষিতা বুদ্ধিমতী রমণী সেই স্থানে তাঁহাদিগকে প্রত্যহ তিন চারি ঘণ্টা সকল বিষয়ে যথানিয়মে শিক্ষা দেন, তাহা হইলে উহাদিগকে সে স্থলে পাঠাইতে বোধ হয় সকলেই সম্মত হইতে পারেন। এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা দুঃস্থ, তাঁহারা ঐ স্থানে শিক্ষা পাইয়া পরে শিক্ষয়িত্রীর কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারেন। শিক্ষাপ্রদায়িনী প্রাচীনা রমণীর উপযুক্ত বেতন, এবং পল্লীস্থ দুঃস্থ কামিনীগণের যাতায়াতের খরচ, ঐ পল্লীস্থ ভদ্র ব্যক্তিরা চাঁদা করিয়া অনায়াসে দিতে পারেন। বোধহয় কোন পল্লীতে কোন ধনাঢ্য পরিবারস্থ সুশিক্ষিতা রমণী বিনা বেতনেও তাঁহার পল্লীস্থ কামিনীগণের শিক্ষার ও তত্ত্বাবধারণের ভার গ্রহণ করিতে পারেন। এক্ষণে কলিকাতার প্রায় সকল পল্লীতেই কতকগুলি সুশিক্ষিতা বুদ্ধিমতী কামিনী পাওয়া যায়। এক জনের যথেষ্ট অবকাশ না থাকিলে দুই চারি জন এই মহোপকারী কর্ম্ম অংশ করিয়া লইতে পারেন। দুই এক জন বেতনভোগী এবং দুই এক জন অবৈতনিক শিক্ষয়িত্রী বোধ হয় অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে। তিন চারিটী সন্নিকটস্থ পল্লীর ভদ্র মহাশয়েরা ঐক্য হইয়া ঐ কয়েক পল্লীর মধ্যস্থলে এক জন ভদ্রলোকের বাটীতে প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান করিলে অল্পকাল মধ্যেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। নিজ পল্লীর অথবা নিকটস্থ পল্লীর ভদ্রলোকের বাটীতে বিবাহাদি কোন ক্রিয়া উপলক্ষে অনেক বামাগণ সমবেত হইয়া থাকেন। শিক্ষা উপলক্ষে ঐরূপ স্থানে একত্রিত হইতে কেনই বা আপত্তি

পারেন না। নগরের স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট "নর্ম্মাল স্কুল," অর্থাৎ শিক্ষয়িত্রীর শিক্ষা-জন্য বিদ্যালয় সংস্থাপন করা অতি কর্ত্তব্য। এই সকল নর্ম্মাল-স্কুলে কেবল লেখা পড়া ও সূচী কর্ম্মের চর্চ্চা না হইয়া উপদেশ দানের সুকৌশল, নারীগণের সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সুশীলতা ও ধর্ম্মপরায়ণতা প্রভৃতি অপরাপর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়েও যথোচিত শিক্ষা দান ও অভ্যাস করান আবশ্যক। অনেকেই বলিতে পারেন যে, এরূপ নর্ম্মাল-স্কুল স্থাপিত করা অসাধ্য। উহার ব্যয় কে দিবেন? উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীই বা কোথায় পাওয়া যাইবে, এবং নর্ম্মাল-স্কুলেই বা কে আপন পুত্রবধূ বা বিবাহিতা কন্যা বা ভগ্নীকে পাঠাইবেন? এই কারণেই বিটন-বালিকাবিদ্যালয়ের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট-স্থাপিত নর্ম্মাল-স্কুল অল্প দিবস মধ্যেই উঠিয়া যায়। উহার তত্ত্বাবধারণই বা কে করিবেন? এবম্প্রকার আপত্তি অনেকেই উত্থাপন করিবেন, আমরা বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু যত্নের অসাধ্য কিছুই নাই। এই সাধুবচনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা বলিতেছি যে, ইহা কষ্টসাধ্য হইতে পারে, কিন্তু অসাধ্য নহে। শত শত লক্ষপতি থাকিতে যে দুই চারিটী নর্ম্মাল-স্কুলের ব্যয় যুটিবে না, তাহা অগ্রাহ্য। সহস্র সহস্র বিদ্যোৎসাহী স্ত্রীশিক্ষানুরাগী ব্যক্তি থাকিতে যে তত্ত্বাবধান হইবে না, তাহাও অগ্রাহ্য। শিক্ষয়িত্রী পাওয়া দুষ্কর ইহা সত্য বটে, কিন্তু যতকাল সুপণ্ডিতা শিক্ষয়িত্রী না পাওয়া যায়, ততকাল দুই চারিজন প্রাচীন বিজ্ঞ সুপণ্ডিত পুরুষের দ্বারা অনেক বিষয়ের শিক্ষা প্রদত্ত হইতে পারে, এবং দুই চারিজন প্রাচীনা বুদ্ধিমতী রমণীদ্বারা অপর অনেক বিষয়ের শিক্ষা দেওয়াও হইতে পারে। অনেকে বিবাহিতা কন্যা ও ভগ্নীকে নিজ গৃহের বহির্গত হইয়া অপর স্থানে শিক্ষা জন্য যাইতে দিবেন না, এইটী এক প্রধান প্রতিবন্ধক বটে, কিন্তু এ প্রতিবন্ধকও অনিবার্য্য নহে। হিন্দুসমাজস্থ অনেকেই উহাদিগকে প্রকাশ্য স্কুলে পাঠাইতে অসম্মত। যে স্থলে সাহেব সুবো বা

অপরিচিত ব্যক্তির সমাগম হয়, কিম্বা যেখানে ছাত্রীদিগকে গাউন্ পরিয়া জুতা পায়ে দিয়া বিবির ন্যায় আচার ব্যবহার করিতে হয়, অথবা যথায় কোন বিশেষ ধর্ম্মবিষয়ের শিক্ষা প্রদান হয়, এমন স্থলে বিবাহিতা কামিনীকে অনেকেই পাঠাইতে চাহেন না; কিন্তু যদি প্রতি পল্লীর জনৈক ভদ্র ব্যক্তির বাটীতে ঐ ব্যক্তির পরিচিত কতকগুলি পরিবারের বিবাহিতা রমণীরা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে একত্রিত হন এবং কোন প্রাচীনা সুশিক্ষিতা বুদ্ধিমতী রমণী সেই স্থানে তাঁহাদিগকে প্রত্যহ তিন চারি ঘণ্টা সকল বিষয়ে যথানিয়মে শিক্ষা দেন, তাহা হইলে উহাদিগকে সে স্থলে পাঠাইতে বোধ হয় সকলেই সম্মত হইতে পারেন। এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা দুঃস্থ, তাঁহারা ঐ স্থানে শিক্ষা পাইয়া পরে শিক্ষয়িত্রীর কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারেন। শিক্ষাপ্রদায়িনী প্রাচীনা রমণীর উপযুক্ত বেতন, এবং পল্লীস্থ দুঃস্থ কামিনীগণের যাতায়াতের খরচ, ঐ পল্লীস্থ ভদ্র ব্যক্তিরা চাঁদা করিয়া অনায়াসে দিতে পারেন। বোধহয় কোন পল্লীতে কোন ধনাঢ্য পরিবারস্থ সুশিক্ষিতা রমণী বিনা বেতনেও তাঁহার পল্লীস্থ কামিনীগণের শিক্ষার ও তত্ত্বাবধারণের ভার গ্রহণ করিতে পারেন। এক্ষণে কলিকাতার প্রায় সকল পল্লীতেই কতকগুলি সুশিক্ষিতা বুদ্ধিমতী কামিনী পাওয়া যায়। এক জনের যথেষ্ট অবকাশ না থাকিলে দুই চারি জন এই মহোপকারী কর্ম্ম অংশ করিয়া লইতে পারেন। দুই এক জন বেতনভোগী এবং দুই এক জন অবৈতনিক শিক্ষয়িত্রী বোধ হয় অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে। তিন চারিটী সন্নিকটস্থ পল্লীর ভদ্র মহাশয়েরা ঐক্য হইয়া ঐ কয়েক পল্লীর মধ্যস্থলে এক জন ভদ্রলোকের বাটীতে প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান করিলে অল্পকাল মধ্যেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। নিজ পল্লীর অথবা নিকটস্থ পল্লীর ভদ্রলোকের বাটীতে বিবাহাদি কোন ক্রিয়া উপলক্ষে অনেক বামাগণ সমবেত হইয়া থাকেন; শিক্ষা উপলক্ষে ঐরূপ স্থানে একত্রিত হইতে কেনই বা আপত্তি

হইবে? সুশিক্ষিত পুরুষেরা যদি আন্তরিক যত্ন সহকারে মনোযোগী হয়েন, তাহা হইলে আমাদের প্রস্তাব কখনই বৃথা বাক্যব্যয় হইবে না। যদি গড়ের-মাঠের ঘোড়দৌড়ের রাস্তা মেরামত জন্য দুই তিন জন হিন্দু মহাশয় ৬০০০৲ টাকা এককালে দান করিতে পারেন, যদি সাহেবগণের প্রস্তাবিত চাঁদাতে অনেকে এককালীন ও মাসে মাসে বহু মুদ্রা দান করিতে পারেন, যদি পুত্রগণের শিক্ষা জন্য সকলেই অকাতরে বিস্তর ব্যয় করিতে পারেন, কন্যাগণের সুশিক্ষার জন্য কেনই কিঞ্চিৎ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইবেন? আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, দুই চারি জন ব্যক্তি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া প্রস্তাবিত বিষয়ে কায়মনোবাক্যে চেষ্টিত হইলে তাঁহাদের চেষ্টা কখনই বিফল হইবে না।

দুর্গাপূজা।

পুরাণে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বকালে মহিষ নামে এক দুরন্ত অসুর স্বর্গলোক অধিকার করিয়াছিল। দেবতারা স্বর্গ হইতে তাড়িত হইয়া সামান্য মনুষ্যের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বারম্বার চেষ্টা করিয়াও প্রবল অসুর-সৈন্যগণকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া সকলে বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন। দেবগণের করুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভগবানের হৃদয়ে মহাকোপ উপস্থিত হইল এবং তাঁহার বদন হইতে দারুণ তেজোরাশি বহির্গত হইতে লাগিল। আনুসঙ্গিক অন্যান্য দেব-শরীর হইতেও ঐরূপ তেজোরাশি বহির্গত হইয়া মিলিত হইলে, দীপ্যমানা এক মহাদেবীর আবির্ভাব হইল। ভিন্ন ভিন্ন তেজে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের সৃষ্টি হইল। শিব-তেজে মুখ, যম-তেজে কেশ, বিষ্ণু-তেজে বাহুশ্রেণী, চন্দ্র-তেজে স্তনযুগল, ইন্দ্র-তেজে মধ্যদেশ, বরুণ-তেজে জঙ্ঘাদ্বয় ও উরুদেশ, পৃথিবী-তেজে নিতম্ব, ব্রহ্ম-তেজে পাদদ্বয় এবং সূর্য্য-তেজে

তাঁহার পদাঙ্গুলি সকল উদ্ভূত হইয়াছিল। অনন্তর দেবতারা তাঁহাকে আপন আপন অস্ত্র প্রদান করিলে, তিনি বহুবাহু বিস্তার করিয়া সকলের অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অট্টহাসে ত্রিভুবন বিকম্পিত হইতে লাগিল। মহিষাসুর এই ভয়ানক ব্যাপার অবলোকন করিয়া তাঁহার বিপক্ষে বহুসংখ্যক অসুরসৈন্য প্রেরণ করিল। কিন্তু তিনি সিংহস্কন্ধে আরোহণ করিয়া অবলীলাক্রমে সকলকেই নিপাতিত করিলেন। তদনন্তর মহিষের সেনাপতি উপস্থিত হইলে দেবী তাহাকেও সসৈন্যে বিনাশ করিলেন। ইহাতে ক্রোধোন্মত্ত অসুর মহিষরূপ ধারণ করিয়া প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিলে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর দেবী তাহার শিরশ্ছেদ করিলে, তৎক্ষণাৎ সশস্ত্র এক পুরুষ তাহার দেহ হইতে বহির্গত হইল। দেবী তাহাকে নানারূপে আবদ্ধ করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করিলেন। এই মহিষমর্দ্দিনীরূপই আমরা উপসনা করিয়া থাকি।

এই দেবী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া দক্ষগৃহে সতী নামে, ও হিমালয়-গৃহে পার্ব্বতী নামে বিখ্যাতা হন। দেবগণ অসুর কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইলে বহুবার তিনি বহুরূপ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে বধ করেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন অসুরকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া বধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামও ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। দুর্গাসুরকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি দুর্গানামে বিখ্যাত হন। দেবতারা জয়লাভের নিমিত্ত বহুবার দুর্গার পূজা করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে ভূমণ্ডলে দুর্গাপূজা প্রচলিত হয় নাই।

চৈত্র-বংশে সুরথ নামে এক প্রবল প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন। তিনিই মনুষ্যলোকে দুর্গাপূজা প্রথম প্রচলিত করেন। বিপক্ষেরা আক্রমণ করিলে তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া একাকী গহনে প্রবেশ করেন। তিনি রাজ্যচ্যুত হইয়া বনমধ্যে বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। যে সকল প্রজাকে

তিনি অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন, যে সকল দরিদ্রকে তিনি দান করিতেন, যে সকল দুর্ব্বল ব্যক্তিকে তিনি রক্ষা করিতেন, তাহাদের জন্য তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। রাজা দুঃখিত হইয়া নেত্রজলে ধরাতল অভিষিক্ত করিতেছেন, এমন সময়ে সমাধি নামে কোন বৈশ্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সমাধির বিলক্ষণ সম্পত্তি ছিল, সে ধনলোভী সন্তানগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া পুনর্ব্বার তাহাদেরই কুশলবার্ত্তা শ্রবণের জন্য দীনমনে ভ্রমণ করিতেছিল; উভয়ে উভয়ের দুঃখের কারণ অবগত হইয়া বনাশ্রমবাসী ঋষিবর সমীপে গমন করিল। ঋষি তাহাদিগের নিকট দেবীমাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া মহিষমর্দ্দিনীর উপাসনা করিতে কহিলেন। তাহারা উভয়ে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ভগবতীর আরাধনা করিলে, ভগবতী সন্তুষ্ট হইয়া উভয়ের মনোমত বর প্রদান করিলেন। সুরথ রাজা জয়দুর্গা-কৃপায় জয়লাভ করিয়া স্বীয় রাজ্য পুনঃ অধিকার করিলেন। তদবধি দেবীমাহাত্ম্য-বিস্তারে তাঁহার নিতান্ত আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। কিন্তু তাহাতেও দুর্গাপূজা সবিশেষ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে নাই।

অবশেষে রাজা রামচন্দ্র রাবণবধে হতাশ্বাস হইলে, প্রাজ্ঞগণ তাঁহাকে জয়দাত্রী দুর্গার উপাসনা করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তখন আশ্বিন মাস উপস্থিত। আশ্বিনমাসে সূর্য্য দক্ষিণায়ন পথে অবস্থিতি করেন। দক্ষিণায়ন দেবতাদিগের রাত্রি, ও উত্তরায়ণ দিন। সুতরাং আশ্বিন মাসে দেবতারা নিদ্রিত থাকেন। সুরথাদি মহাত্মারা বসন্ত সময়ে দুর্গার উপাসনা করিয়াছিলেন, সে সময়ে সূর্য্যদেব উত্তরায়ণপথে অবস্থান করেন, সুতরাং দেবী জাগরিত ছিলেন। এই পূজাকেই বাসন্তী-পূজা কহিয়া থাকে। রাম প্রসুপ্তা দেবীর পূজা হইতে পারে না জানিয়া মুমূর্ষুপ্রায় হইলেন। তিনি দেখিলেন দুর্গার করুণাব্যতীত রাবণের বধ হইবে না, এবং সীতারও উদ্ধার

হইবে না। তখন ব্রহ্মা রামের সাহায্য ও রাবণবধের জন্য অকালে দুর্গাকে বোধন বা জাগ্রত করাইতে মানস করিলেন। দেবীকে বোধন করা হইলে, রাম পূজায় প্রবৃত্ত হইয়া ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তৎপরে দেবীর অনুগ্রহে রাবণবধ হইল। রাম এই ব্যাপার চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ভারতের সর্ব্বত্র দুর্গাপূজা প্রবলরূপে প্রচলিত করিয়া যান। চৈত্রমাসে পূজার নিরূপিত কাল থাকিলেও আমরা কেবল রামের অনুকরণ করিয়া অকালে পূজা করি। আশ্বিন মাসের দুর্গোৎসব রামচন্দ্রকৃত দুর্গোৎসবের অনুকরণ মাত্র। অকালে পূজ অত্যন্ত নিষিদ্ধ এই জন্য আমরা পূজার প্রথমেই কহিয়া থাকি, "হে দেবি! রাবণের বধের জন্য এবং রামের প্রতি অনুগ্রহের জন্য ব্রহ্মা পূর্ব্বে তোমাকে জানাইয়াছিলেন আমিও তদনুসারে এই আশ্বিন মাসের ষষ্ঠীতে তোমার বোধন করিতেছি। হে মহাভাগে! তুমি দেবতাদিগের তেজে নির্ম্মিত। আমি তোমার পূজারম্ভ করিতেছি।" রামের পূজাকালে সন্ধিপূজার সময় দেবীর আবির্ভাব হইয়াছিল। রাম কৃতার্থ হইয়া নবমীর দিন হোম করিয়া পূজা সমাপন করেন। আমরাও সন্ধিপূজার সময় দেবীর আবির্ভাব বিবেচনা করিয়া, নবমীর দিবস হোম করিয়া পূজা সমাপন করি। বিজয়ার দিন বিজয়লাভ করিবার জন্য অপরাজিতা-পূজা করিয়া রামের সৈন্যগণ অপরাজিতা ধারণ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল; দেবীও তাহাদিগকে বর দিয়া কৈলাসে গমন করিয়াছিলেন। আমরাও তদনুসারে বিজয়ার দিবস, "হে মাতঃ, আমরা যেন জয় লাভ করি, আমাদের শত্রু যেন বিনষ্ট হয় কহিয়া অপরাজিতা লতা দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া থাকি। বিজয়ার দিবস যুদ্ধযাত্রায় রামের সম্পূর্ণ বিজয় হইল। সায়ংকালে যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে লক্ষ্মণ রাবণ বিনষ্ট হইয়াছে, রাক্ষসকুল নির্ম্মূল হইয়াছে, সীতার উদ্ধার হইয়াছে, ও কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে আর কিছুই অবশিষ্ট নাই দেখিয়া ধনুকের জ্যা মোচন করিয়া রামকে

গিয়া প্রণাম করিলেন। রাম এত কাল কষ্টভোগের পর আপনাকে সমস্ত বিপদজাল হইতে মুক্ত, এবং প্রাণসম ভ্রাতাকে ঘোর সমর হইতে অক্ষত শরীরে প্রত্যাগত দেখিয়া গাঢ় প্রীতির সহিত তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। বানরেরাও তাহাই দেখিয়া নমস্কার করিয়া পরস্পরকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। নিশাকাল জয়োল্লাস ও আহ্লাদে অতিবাহিত হইল। আমরাও তদনুসারে বিজয়া সায়ংকালে যথাযোগ্য ব্যক্তিকে নমস্কারাদি করিয়া নিশাকালে আহ্লাদ আমোদে অতিবাহিত করি।

ভিন্ন ভিন্ন কারণবশতঃ দুর্গোৎসবের নবম্যাদি, প্রতিপদাদি ও ষষ্ঠ্যাদি কল্প হইয়াছে। পূজা তিন প্রকার সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। সাত্ত্বিকী পূজার সহিত জীবহিংসার সম্পর্ক নাই। যপ যজ্ঞ ও নৈবিদ্যাদি সমাযুক্ত পূজার নাম সাত্ত্বিকী পূজা। এই পূজাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বলিদানাদি রাজসী পূজার অঙ্গ। রাজসী পূজা সাত্ত্বিকী পূজাপেক্ষা নিকৃষ্ট। আহ্লাদ আমোদের জন্য বারোয়ারি আদি তামসী পূজা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। এই তিন প্রকার পূজাই আমাদের দেশে প্রচলিত আছে।

যুদ্ধে জয়লাভের জন্য দুর্গাপূজার সৃষ্টি এবং দুর্গার প্রতিমূর্ত্তিও জয়সূচক। বহুভুজচ্ছলে দেবী বিবিধ অস্ত্রশিক্ষার উপদেশ করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন হস্তে ইন্দ্র, বায়ু আদি ভিন্ন ভিন্ন দেবতার অস্ত্র থাকাতে প্রবল শত্রুর সহিত সংগ্রামকালে আগ্নেয়াস্ত্র ও বায়ব্যাস্ত্র প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র প্রয়োজন, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। জয়াভিলাষী রাজা যুদ্ধকালে নানাপ্রকার মন্ত্রণা করিয়া কার্য্য করিবেন, এজন্য বিদ্যাবুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীকে দেবীর বামদিকে দেখা যায়। প্রভূত অর্থ নিজ করতলস্থ না করিয়া কদাচ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে, এজন্য সর্ব্বরত্নের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী দক্ষিণদিকে ন্যস্তা হইয়াছে। পদাতি অপেক্ষা আরোহী সৈন্যের উৎকর্ষ দেখাইবার জন্য একদিকে আরোহী সৈন্যনায়ক কার্ত্তিকের ও অপর দিকে গজসৈন্যসূচক গজানন স্থাপিত হইয়াছিল। পাছে

বিপদকালে প্রজারা পাছে বিদ্রোহী হয়, এজন্য পূর্ব্বাহ্ণে প্রজার ভক্তি জ্ঞাপনার্থ স্তূয়মান অমর সকলকে চতুর্দ্দিকে রাখা হইয়াছে। শত্রুপক্ষ সিংহবিক্রমে আক্রমণ করিবে ইহা দেখাইবার জন্য দেবী সিংহের উপর সমারূঢ়া আছেন। শত্রু মৃতপ্রায় হইলেও তাহাকে ত্যাগ করিতে নাই, এজন্য মৃতপ্রায় মহিষের উপর এক পাদ ন্যস্ত হইয়াছে। নিরস্ত্র ও মৃতপ্রায় শত্রু হইতেও কালে সশস্ত্র শত্রুর উত্থান হয় ইহা জানাইবার জন্য, মৃতপ্রায় মহিষ হইতে সশস্ত্র শত্রুর উত্থান দেখাইয়াছেন। রাজা সর্ব্বদিকে দৃষ্টি রাখিবেন এজন্য দেবীর ত্রিনয়ন সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রতপ্ত কাঞ্চন বর্ণ দ্বারা রাজাকে সর্ব্বদা তেজে প্রদীপ্ত হওয়া উচিত তাহাই প্রকাশের তাৎপর্য্য। অর্দ্ধচন্দ্রের সুস্নিগ্ধ কিরণ ধারণ করাতে রাজগণের নম্রভাবাপন্ন, সাধুগণকে স্নেহভরে পালন, এবং উৎপথগামী অসাধুগণকে শাস্তি দেওয়া উচিত, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ প্রতিমার প্রত্যেক ভাগই বিবেচনা করিয়া দেখিলে জয়যুক্ত হওয়ার লক্ষণাদি দেখা যায়।

যাহা হউক দুর্গার প্রতিমূর্ত্তিতে যে কেবল প্রবৃত্তিমার্গস্থ জীবগণের প্রতি উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এরূপ নহে। ইহাতে অধ্যাত্ম বিদ্যারও উপদেশ দেখা যায়। অজ্ঞানতা কুপ্রবৃত্তি সকলকে উত্তেজিত করিয়া মনের উপর আধিপত্য করিতে থাকে। অজ্ঞানতার প্রভাবেই মৃত্যু হয় *। মহিষ মৃত্যুর চিহ্নস্বরূপ, দুর্গোৎসবপদ্ধতিতে লিখিত আছে, "মহিষ ত্বং মহাবীর ধর্ম্মরাজস্য বাহনঃ," অর্থাৎ হে মহিষ, হে মহাবীর তুমি যমের বাহন। জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা মৃত্যুর বাহক সেই মহিষকে বিনাশ করেন।

চণ্ডীতে লিখিত আছে যে দেবাসুরে বহুকাল যুদ্ধ হয়। অবশেষে অসুরসেনাসকল দেবসেনা সকলকে পরাজিত

* শ্রুতি।

করিলে শেষে মহিষাসুর সকলের ইন্দ্র হয়*। স্বর্গলোক অসুরাধিকৃত হইলে সূর্য্য পবনাদি দেবগণ তাহাদের পরিচর্য্যা করেন। মনুষ্যের ইন্দ্রিয়সকল দেবতাস্বরূপ। ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু সূর্য্যের অংশে সম্ভূত, স্পর্শগুণবিশিষ্ট ত্বচ্ পবনের অংশ-সম্ভূত। কুপ্রবৃত্তিরূপ আসুরী সেনাসকল মহিষরূপা অজ্ঞানতাকে আশ্রয় করিয়া মনঃ-রূপ স্বর্গ অধিকার করে। তখন ইন্দ্রিয়গণ অজ্ঞানতা ও কুপ্রবৃত্তির অধীনে অবৈধ কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। পরে ক্রমাগত অবৈধ কার্য্যদ্বারা বিরক্তি জন্মিলে, দেবগণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়েরা বিষ্ণুর নিকট অর্থাৎ নির্ম্মল জ্ঞানের নিকট গমন করে। পরে হঠাৎ জ্ঞানালোকে ইন্দ্রিয় সকলের তেজ আকৃষ্ট হইয়া ত্রিভুবন অর্থাৎ শরীর প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। শরীরের পদ হইতে নাভি পর্য্যন্ত ভূলোক, নাভি হইতে কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত ভুবর্লোক এবং কণ্ঠদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্বর্লোক†। এই আত্মজ্ঞান অবহেলায় মৃত্যুরূপ বা অজ্ঞানস্বরূপ মহিষ সংহার করে।

বেদে আছে, আত্মজ্ঞান হইলে জীব মৃত্যুকে জয় করিয়া থাকে। আত্মাই ব্রহ্মস্বরূপ‡। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন, হে মৈত্রেয়ী জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। যিনি আত্মাকে ব্রহ্মরূপে জানিয়াছেন তিনি ব্রহ্মস্বরূপ§। তাঁহাকে কেহই জয়

* দেবাসুরমভূৎ যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা।
মহিষে সুরানামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে॥
তত্রাসুরৈর্মহাবীর্য্যৈ র্দেবসৈন্যং পরাজিতং।
জিত্বাচ সকলান্ দেবানিন্দ্রোভূন্মহিষাসুরঃ॥

† ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পাদৌ ভুবর্লোকশ্চ নাভিতঃ।
স্বর্লোকঃ কল্পিতঃ মূর্দ্ধ্নি ইতি লোকময়ঃ পুমান্॥

‡ অজোনিত্য চৈতদ মৃতমভয় মেতদ ব্রহ্মেতি। ইতি ছান্দোগ্য উপনিষদ্।

§ ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। ইতিমুণ্ডকোপনিষদ্।

করিতে সক্ষম হয় না*। এই জ্ঞানই পরাবিদ্যা†। দুর্গাকেও চণ্ডীতে বলা হইয়াছে,—"সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী"। অপর বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী, সর্ব্বশ্রীর অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী, মঙ্গলস্বরূপ গজানন, বিক্রমস্বরূপ উদ্যতায়ুধ কার্ত্তিক, সমস্তই এই পরাবিদ্যার আশ্রয়ভূত। শ্রুতির মতে চিন্ময় পরমেশ্বর সর্ব্বদিকে ব্যাপ্ত আছেন। দুর্গাকেও দশ হস্তচ্ছলে দশদিক আচ্ছন্ন করিতে দেখা যায়।

এই জ্ঞানপ্রাপ্তিও সহজে ঘটিয়া উঠে না। আসন, প্রাণায়াম, নীতি, ধ্যাসনাদি আবশ্যক। ইন্দ্রিয় সকলকে সম্পূর্ণরূপে আহরণ করিতে হইবে। তাহারা সকল প্রকার স্বাধীনতা পরিত্যাগ করিলে জ্ঞান লাভের উপায় হয়। দেবগণও দুর্গাকে স্ব স্ব তেজ ও অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সকল অস্ত্র মহিষবধের উপকরণ হইল। ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব বৃত্তি পরিত্যাগ করিলে প্রদীপ্তজ্ঞান অনায়াসে অজ্ঞানরূপ কৃষ্ণবর্ণ অসুরকে নাশ করিয়া থাকে। চৈত্রমাস হইতে সূর্য্যের উত্তরায়ণবশতঃ বোধন করিতে হয় না। পিঙ্গলা নাড়ী, শাস্ত্রে সূর্য্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পিঙ্গলা নাড়ী বহমান থাকিলে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত থাকে। যোগীরা এইরূপ অবস্থাপন্ন। কিন্তু ইড়া নাড়ী প্রবহমান থাকিলে কুণ্ডলিনী শক্তি সুষুপ্ত থাকে। সুতরাং জাগ্রত করা আবশ্যক। ইড়া নাড়ী শাস্ত্রে চন্দ্র স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। প্রবৃত্তিমার্গস্থ জীব সকলের ইড়া নাড়ী প্রবহমান থাকে। এই জন্য লিখিত আছে, "যদি সা বোধিতা দেবী বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ। তদা সর্ব্বং প্রসিদ্ধ্যেত মন্ত্র যন্ত্রার্চ্চনাদিকং।" অর্থাৎ, যদি বহু পুণ্য সঞ্চয় দ্বারা ঐ দেবী মূলাধারে প্রবোধিতা হন, তাহা হইলে মন্ত্র যন্ত্রার্চ্চনাদি সকল সার্থক। মেরুদণ্ডের পার্শ্ব দিয়া ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী চলিয়া গিয়াছে। আমেরিকান শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ইহার একটীকে সেন্‌সেটিভ্ ও অপরটীকে

* এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবভি।—ইতি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্।

† দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যেতি। কঠোপনিষদ্।

আক্‌টিভ্ (Sensitive and Active) কহেন। তাঁহারা এক একটীকে ছেদন করিয়া ইহার প্রমাণ করিয়াছেন। এই উভয় নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না। ইড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম্না শূন্যবাহিনী। সুষুম্না নাড়ী মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ মাজার ভিতর দিয়া শূন্য স্বরূপ হইয়া আছে। প্রকাণ্ড অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে একটী সূক্ষ্মছিদ্র বলিয়া বোধ হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ঐ পথ দ্বারা তাড়িত শক্তি গমনাগমন করে। আমাদিগের মতে ঐটী জ্ঞানসঞ্চারের পথ। যোগী ঐ পথ অবলম্বন করিলে পরাবিদ্যা-প্রভাবে মুক্তিলাভ করে।

দুর্গোৎসব দ্বারা ধর্ম্ম পক্ষে কিছু উপকার হয় কি না হয়, তাহা আমাদিগের বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহাতে সমাজের যে কিছু উপকার হয়, তাহা আমাদিগকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অহরহঃ বৈষয়িক ব্যাপারে পরিশ্রান্ত মানবগণের শ্রান্তি দূরার্থ মধ্যে মধ্যে আমোদ প্রয়োজন। প্রাচীনকালের লোকেরা আশ্বিন মাসে আমোদের সময় করিয়া বিলক্ষণ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বর্ষাকালে নদ নদী সকল প্লাবিত হইবামাত্র বণিকগণ বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া দেশদেশান্তরে গমন করে। কৃষকগণ ক্ষেত্রকার্য্যে ব্যাপৃত হয়। পশুপালকগণ বন্যার জলে গোষ্ঠ সকল প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কায় পশুসহ উচ্চ বনবিভাগে চলিয়া যায়। অপরাপর লোকগণ পথের দুরন্ত কর্দ্দম-ভয়ে গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া আপন আপন কার্য্যাদি সম্পন্ন করে। পরে বর্ষা বিগত হইবামাত্র নদীর জল শুষ্ক হইবার ভয়ে বণিকেরা শীঘ্র শীঘ্র প্রত্যাগমন করে। ক্ষেত্রকার্য্যও শেষ হইয়া যায়। পশুপালকেরা স্বদেশে আগমন করে। এবং তিন মাস গৃহে আবদ্ধ ব্যক্তিগণ অঙ্গ সঞ্চালনের সাবকাশ প্রাপ্ত হয়। এদিকে শরৎকাল আগত হওয়াতে ভূমণ্ডল রমণীয় শোভা ধারণ করে। সরোবরের জল নির্ম্মল ও স্বচ্ছ এবং পদ্ম কুমুদ কহ্লারে পরিপূরিত হয়। ক্ষেত্র সকল হরিত শোভায় মণ্ডিত হয়। পথের কর্দ্দম সকল শুষ্ক হইয়া যায়। নভোমণ্ডল পরিষ্কৃত হওয়াতে

রাত্রিকাল অতি রমণীয় হইয়া উঠে। এরূপ কাল কার্য্য হইতে অপসৃত-ব্যক্তিগণের যথার্থই আমোদের সময়। ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে গৃহে আগত ব্যক্তিগণ অপর কোনরূপ আমোদে লিপ্ত না হইয়া যে ঈশ্বর-আরাধনার প্রসঙ্গ করিয়া আমোদে লিপ্ত হয়, ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে। কিন্তু কেবল মাত্র আমোদব্যতীত এক্ষণে দুর্গোৎসব দ্বারা কতকগুলি সবিশেষ হিত সাধিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে কেহ কোন উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত করিলে রাজারা তাহার উৎসাহ দিয়া থাকেন। আমাদিগের দেশে কোন বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া দূরে থাকুক যাহাতে তন্তুবায়েরা উৎসন্ন যায়, কুম্ভকারেরা অন্নাভাবে পথে পথে পরিভ্রমণ করে, বাদ্যকারেরা বিনষ্ট হয়, ইহারই সবিশেষে উদ্যোগ দেখা যায়। এক্ষণে কেবল দুর্গোৎসবের মুখাবলোকন করিয়া তন্তুবায়েরা উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে, কুম্ভকারেরা প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ শিক্ষা করে, চিত্রকরেরা চিত্রকার্য্যে যত্ন করিয়া থাকে এবং অপরাপর শিল্পীগণ আপন আপন ব্যবসায়ের উন্নতি সাধনে যত্নবান হয়। কেবল দুর্গোৎসব থাকাতেই, কেবল পৌত্তলিকতার প্রচার থাকাতেই এখনও এগুলি ভারত হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। তাহা না হইলে এত দিন ভারতে যাহা দেখা যাইতেছে তাহাও দেখা যাইত না। প্রতিমার সজ্জা, মমের ফুল, বাজী, সর্ব্বৌষধি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া কতকগুলি লোকে প্রতিপালিত হইতেছে। দুর্গোৎসব না থাকিলে এই সকল ব্যক্তিকে অপর কোন প্রকার জীবনোপায় চিন্তা করিতে হইত। কেবল দেবপূজার জন্য কতকগুলি উৎকৃষ্ট ও সুখসেব্য গন্ধ দ্রব্য অস্মদ্দেশে আমদানী হইয়া থাকে। দুর্গোৎসব-উপলক্ষে অনেকে চতুষ্পাটিধারী ব্রাহ্মণকে বৃত্তি দিয়া থাকেন, এবং এতদ্ব্যতীত দুর্গোৎসবেও ভট্টাচার্য্যদিগের কিঞ্চিৎ প্রাপ্তি হয়। এই সকল ব্যক্তিরাই সংস্কৃত ভাষাকে এখন পর্য্যন্ত জীবিত রাখিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি প্রধান নগরের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি মনোযোগ করিয়া থাকেন।

কিন্তু দুর্গোৎসব উপলক্ষে কি উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট সর্ব্ব গ্রামের লোকই আপন আপন গ্রাম ও গৃহাদি পরিষ্কার করেন। দুর্গোৎসব-প্রভাবে বর্ষে বর্ষে গ্রাম্য লোকদ্বারাই গ্রামের শোভা সম্পাদিত হয়। অতএব দুর্গোৎসবের উদ্দেশ্য মহৎ বলিয়াই বোধ হয়।

শারদীয় মহোৎসব।

ঝাঁ ঝাঁ গুড়ু গুড়ু নৌবত বাজে,
ঝমক ঝমক ঝম ঝঞ্ঝন ঝাঁজে।
দৃমিকি দৃমিকি দাং থেই মৃদঙ্গে
ভোঁ ভোঁ ভম ভম আরব সঙ্গে
ঝুন্ ঝুন্ ঝুণু ঝুণু নূপুর গাজে,
ঝাঁগুড়ু নাকুড়ু দুন্দুভি বাজে।
কাঁশর ঘণ্টা শঙ্খ নিনাদে
মোহিত ভুবন নিমজ্জিত সাধে।
হো হো হৈ হৈ রৈ রৈ তানে,
ভেদল অম্বর ঝাঁঝল কাণে।
শারদ উৎসব মাতল বঙ্গে,
ভাসল পুরজন হর্ষ - তরঙ্গে।*

জাগহ স্বজনি পোহাল রজনি,
কনক অচলে উদিত তরণি,
কুমুদিনী ধনী মুদিত - নয়নী,
কমলিনী - কুল হসিত - বয়নী,
উঠ উঠ সখি যামিনী ভোর।

* উক্ত কয়েকটী কবিতা পজ্ঝটিকাচ্ছন্দে লিখিত, ইহাতে লঘু, গুরু, বর্ণ উচ্চারণ-ভেদ আবশ্যক।

শীতল মলয় অনিল - লহরী
খেলিল কাননে মৃদুল বিহরি,
সরসী-সলিলে নাচিল সফরী,
লতিকা - কুসুমে দুলিল চঞ্চরী*;
ভ্রমর পশিল কমল - কোর†।

মল্লিকা মালতী করবী বকুল,
টগোর শেফালী জাতি যূথি ফুল,
চম্পক রমণ গুলাব অতুল,
পথিক নিকর করিল আকুল
হৃদয় - মোহন - সুরভি - দানে।

বিপিন - বিহারী - বিহগ - কূজনে
জুড়াল শ্রবণ সুধা - বরষণে,
প্রিয় সখী ঊষা সহ আলাপনে
সাজিল প্রকৃতি কুসুম - ভূষণে;
ভুবন ভরিল ললিত গানে।

জাগহ স্বজনি পোহাল রজনি,
উদয় - অচলে হের দিনমণি,
হের গো হরষে জলজ - বয়নী
সারদা গিরিজা গনেশ-জননী;
ভাসিল ভারত সুখের নীরে।

শুন শুন অই বাজিছে বাজনা,
পুলকে সঘনে করিছে ঘোষণা,
এতদিন পরে উমেশ - বাসনা
হৈমবতী সতী মৃগেন্দ্র-বাহনা
গিরীন্দ্র - ভবন আইল ফিরে।

ভাসিছে মেনকা নয়ন-আসারে
নিরখি নিরখি নিরখি উমারে,
বহুদিন পরে পাইয়া শিবারে
কপোল চুম্বিয়া কহিছে তাহারে—
"আয় আয় বাছা আয় রে কোলে।

* ভ্রমরী।
† কোল।

"কত দিন পরে ও বিধু-বদন
নেহারি হইল সফল নয়ন,
ডাক মা 'মা' ব'লে জুড়াক শ্রবণ,
শুনারে শুনারে মধুর বচন;
ডাক রে বারেক মধুর বোলে।

"আমি মা তোমার দুখিনী জননী
শুন গো মা উমে নয়নের মণি,
হ'য়ে চিরদিন পাষাণ-ঘরণী
সাধে পরাঙ্মুখ দিবস রজনি;
তাই কি মা ব'লে নাহিক মনে?

"তোমার বিরহে পরাণ বিকল,
ঝর ঝর ঝরে নয়নের জল;
হৃদয়-মৃণাল-বিকচ-কমল!
হার পরশে শরীর শীতল,
বঞ্চিত অভাগী এ হেন ধনে।

সাধ বাছা, এ পোড়া হৃদয়ে
জে নিরখি অপর আলয়ে
সুখে তারা জীবন যাপয়ে
হিতা জামাতা লইয়া উভয়ে;
সে সুখ হ'বে কি আমার ভালে?

"বছর ফিরিতে যুগের সমান
ভাবিয়া ভাবিয়া হইনু পাষাণ,
তাই কি দুদিন কর অবস্থান,
কোলে পিঠে করি জুড়াই পরাণ;
এমন দেখিনি মা, কোন কালে।"

নীরবিল রাণী ভাসিল নয়ন
অনলে হইল সলিল মিলন,
এদিকে সানন্দ ভারত-ভবন,
নাচিছে গাইছে যত পুরজন,
এমন সাধের দিন না হ'বে।

শ্বেত নীল রাঙা কমল তুলিয়া
গাঁথে থরে থরে কুসুম-মালিয়া,
অরুণ-প্রতিম জবা-ফুল দিয়া
অপরাজিতার মালিকা গাঁথিয়া
করে আয়োজন পূজার সবে।

শোভিছে দুয়ার সহকার-দলে
মঙ্গল কলস, কদলী যুগলে,
গন্ধরস-ধূম উঠিছে প্রবলে,
আনন্দ উৎসবে মাতিল সকলে,
দেয় হুলুধ্বনি কুলের নারী।

স্বজনে স্বগণে মধুর মিলনে,
উছলে তরঙ্গ জীবন-জীবনে,
আজি কি আনন্দ ভারত-ভবনে,
'জয় জয়াবতী' সকল বদনে,
বহিছে রভসে জাহ্নবী-বারি।

ভবানী তারিণী দনুজ-দলনী,
মহামায়া আদ্যা জগৎ-জননী,
গিরিশী অতসী-কুসুম-বরণী,
বিরাজে অপর্ণা শমন-শমনী,
দরশনে ঘুচে যাতনা ঘোর।

জাগহ স্বজনি পোহাল যামিনী
গায়ক গায়িছে ললিত রাগিণী,
নিরখ ভবনে মহিষ-মর্দ্দিনী
নগেন্দ্র-নন্দিনী ভূতেশ-ভাবিনী;
দুখের রজনি হইল ভোর।

বামাগণের রচনা।

মনের প্রতি উপদেশ।

কি কর বসিয়ে মন, কি কর বসিয়ে মন,
ভবজালে তুমি আর হও না বন্ধন।
যাতে পার হবে মন, যাতে পার হবে মন,
এই বেলা কর সার নিত্য নিরঞ্জন।
দেখ এই ত্রিসংসার, দেখ এই ত্রিসংসার,
নয়ন মুদিলে হবে সব অন্ধকার।
দেখ হইয়ে সত্বর, দেখ হইয়ে সত্বর,
[illegible]সে পাবে দয়াময় জগৎ ঈশ্বর।
[illegible]ই বন্ধুগণ, দেখ ভাই বন্ধুগণ,
[illegible]দিলে কেহ না হবে আপন।
[illegible] বুঝ মন, তবু নাহি বুঝ মন,
[illegible]শি ভবজালে হইয়ে বন্ধন।
[illegible]র মায়ায়, মিছে সংসার মায়ায়,
[illegible]রে ওরে মন উন্মত্তের প্রায়।
[illegible] ওরে মন, শুন বলি ওরে মন,
[illegible]র দিকে তুমি করো না গমন।
[illegible] ওরে মন, শুন শুন ওরে মন,
ঈশ্বরে ভুলিয়া তুমি আছ কি কারণ।
কেন ওরে মূঢ় মন, কেন ওরে মূঢ় মন,
সতত যাইছ তুমি সুখের সদন।
তুমি জান না কি মন, তুমি জান না কি মন,
তোমায় যাইতে হ'বে সমন ভবন।
চেষ্টা কর তুমি মন, চেষ্টা কর তুমি মন,
হৃদয়ে ধরিতে সেই বিপদ-ভঞ্জন।
বিনা সেই শ্রীচরণ, বিনা সেই শ্রীচরণ,
বিফল দুর্লভ এই মানব জনম।

শ্রীমতী হেমন্তনন্দিনী।

☞ স্থানাভাব প্রযুক্ত অন্যান্য রচনা এবার মুদ্রিত হইল না।

স্বর্গীয় বাবু প্যারীচরণ সরকার।

ছয় মাস না যাইতে যাইতেই বঙ্গমহিলা পিতৃহীন হইল। যিনি বঙ্গমহিলার প্রধান প্রতিপোষক ছিলেন, যাঁহার উৎসাহে ও যত্নে আমরা বঙ্গমহিলাকে সাধারণ সমক্ষে উপনীত করিলাম, তিনি দুঃখিনীকে অনাথিনী করিয়া গেলেন। বঙ্গদেশের একটী অমূল্য রত্ন অপহৃত হইল। বঙ্গসমাজ প্যারীচরণের শোকে আকুল। দীন দরিদ্র লোকেরা তাঁহার অপার দয়ার কথা স্মরণ করিয়া সকৃতজ্ঞচিত্তে কাঁদিতেছে! তাঁহার আত্মীয় বন্ধু স্বজনবর্গে তাঁহার উদার স্বভাব, অমায়িকতা, উপচীকির্ষাদি সদ্গুণ স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছে! বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ তাহাদিগের পরম শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক ও প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু হারাইয়া কাঁদিতেছে! বঙ্গমহিলাগণ! তোমাদিগের একটী প্রধান সহায় ও প্রকৃত মিত্র হারাইলে। যাঁহার শোকে আজ বঙ্গীয় সমাজ অধীর হইয়াছে, যিনি আমাদিগের একজন প্রধান সংস্কারক ছিলেন, এবং স্ত্রীলোকের উন্নতি ও শিক্ষাসম্বন্ধে নানা প্রকার প্রতিবন্ধক সত্বেও যিনি স্বকীয় সংকল্পসাধনে কদাচ পরাঙ্মুখ হইতেন না, তিনি আমাদিগকে নিরুপায় করিয়া অল্প দিনের মধ্যে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

এই শোচনীয় ঘটনার অব্যবহিত পরেই শোকাকুলিত হৃদয়ে লিখিতে আমাদিগের হাত সরিতেছে না। কিন্তু কর্ত্তব্যানুরোধে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত লিখিতে আমরা বাধ্য হইলাম।

বাবু প্যারীচরণ সরকার ইং ১৮২৩ খৃঃ অব্দের ২৩শে জানুয়ারিতে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৺ ভৈরবচন্দ্র সরকারের তৃতীয় পুত্র ছিলেন। তাঁহার পুর্ব্বপুরুষেরা তড়াগ্রামে বাস করিতেন। পরে তাঁহার পিতামহ কলিকাতা নগরীতে উপনিবেশ করিয়াছিলেন। প্যারীবাবু ১৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতৃহীন হয়েন। ইতিপূর্ব্বে তিনি ডেভিড্ হেয়ার সাহেব কৃত বাঙ্গালা-পাঠশালায় উক্ত মহাত্মার তত্ত্বাবধারণে শিক্ষালাভ করিয়া তাঁহার বিশেষ

পাণ্ডিত্য দর্শন করিয়া সাতিশয় চমৎকৃত হয়। কেবল যে পাণ্ডিত্য নিবন্ধন তাঁহাকে তাহারা সম্মান করিত এরূপ নহে। তাঁহার অমায়িকতা, উদার স্বভাব এবং বিশুদ্ধ চরিত্র দর্শন করিয়া তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার মৃত্যুসম্বাদ প্রাপ্তিমাত্রেই কালেজস্থ কি অধ্যাপক কি ছাত্র সকলেই তাঁহার জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিল; এবং তাঁহার সম্মানার্থ প্রেসিডেন্সি কালেজ হিন্দু ও হেয়ারস্কুল সেই দিবস বন্ধ করা হয়। ছাত্রেরা তাঁহার স্মরণ-চিহ্ন স্থাপন করিবার জন্য একটী সভা করিয়া একদিনে প্রায় ৬০০ টাকা চাঁদা উঠাইয়াছিল।

ইদানীং তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত কৃশ দেখা যাইত এবং বোধ হয় তাঁহার বহুমূত্ররোগের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ইহা পূর্ব্বে বিশেষ রূপে জানিতে পারেন নাই। মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহার হস্তে ঐ বহুমূত্র নিবন্ধন একটী ক্ষত হয়, এবং তজ্জনিত দৌর্ব্বল্য অতিক্রম করিতে না পারায়, রোগ ক্রমে সাংঘাতিক হইয়া উঠে। তাঁহার জীবন রক্ষার নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইল। এই রূপে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইয়া গত ১৫ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তিনি পরলোক গমন করেন। আক্ষেপের বিষয় এই যে, তাঁহার বৃদ্ধা জননী অদ্যাপিও জীবিতা আছেন। নানা শোক-সমাকুলা জীবমাত্রাবশেষা জননীর শোকানল পুনরুদ্দীপন করিয়া মরিতে হইল, ও মৃত্যুকালে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম জ্যেষ্ঠপুত্রের সহিত (যিনি এক্ষণে বিলাতে অধ্যয়ন করিতেছেন) সাক্ষাৎ হইল না, এই দুই চিন্তা মৃত মহাত্মাকে কতই মনোবেদনা প্রদান করিয়াছিল।

প্যারীচরণ বাবু অস্মদ্দেশের বহুবিধ উপকার সাধন করিয়াছেন। বালকদিগের শিক্ষা সৌকর্য্যার্থে তিনি যে কয়েকখানি ইংরাজি ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই। কেবল যে ইংরাজি সাহিত্যে তিনি পারদর্শী ছিলেন এমত নহে, মাতৃ ভাষায়ও তাঁহার

বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি কয়েক বৎসর এডুকেশেন গেজেট নামক বাঙ্গালা পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়া, উহার বিশেষ উন্নতি প্রদর্শন করেন। পরে যখন গবর্ণমেণ্ট তাঁহার লেখার স্বাধীনত্ব লোপ করিতে চেষ্টা পাইলেন, তখন তিনি ঐ পত্রিকার স্বত্ব তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া উহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বহুদিবস অবধি বঙ্গদেশে সুরারস্রোত ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া তিনি অতিশয় দুঃখিত ছিলেন, এবং উহার নিবারণার্থ প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তিনি সুরা-নিবারণী নামক এক সভা স্থাপন করেন, এবং তৎসংক্রান্ত ইংরাজি ভাষায় 'ওয়েল উইসার' নামক ও বঙ্গভাষায় 'হিতসাধক' নামক দুইখানি পত্রিকা প্রচার দ্বারা নব্য কৃতবিদ্যমণ্ডলীর বিশেষ উপকার সাধন করেন।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে সুরা সম্বন্ধে "মদ্যপান-বৃক্ষ" (Tree of Intemperence) নামে একখানি অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন; দুঃখের বিষয়, উহার দ্বিতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

এতদ্ভিন্ন তিনি অনেকগুলি সদনুষ্ঠানের নিদান। বস্তুতঃ দেশের কোন হিতানুষ্ঠান প্রস্তাব হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাতে সাহায্য প্রদান করিতেন। দেশীয় সদাচারের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল, এবং ক্রমশঃ জ্ঞানোদয়ের সহিত যাহাতে কুসংস্কার লোপ হয় ইহাই তাঁহার জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। বিদেশীয় ছাত্রদিগের সুবিধার নিমিত্ত তিনি হিন্দু-হষ্টেল নামক একটী ছাত্রাবাস স্থাপিত করেন। চোরবাগান-বালিকা-বিদ্যালয় তাঁহার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত, এবং তাঁহারই যত্নে উহা এক্ষণে একটী উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় হইয়া উঠিয়াছে। চোরবাগান পল্লীতে বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত তাঁহার আর একটী স্কুল ছিল, তাহাতে মধ্যবিত্ত লোকের সন্তানদিগের বিশেষ উপকার হইত। অস্মদ্দেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিবার নিমিত্ত পণ্ডিতবর শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত প্যারীবাবু যৎপরোনাস্তি ক্লেশ স্বীকার করেন, এবং ইহার নিমিত্ত অর্থব্যয় করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তিনি সকলের

পাণ্ডিত্য দর্শন করিয়া সাতিশয় চমৎকৃত হয়। কেবল যে পাণ্ডিত্য নিবন্ধন তাঁহাকে তাহারা সম্মান করিত এরূপ নহে। তাঁহার অমায়িকতা, উদার স্বভাব এবং বিশুদ্ধ চরিত্র দর্শন করিয়া তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার মৃত্যুসম্বাদ প্রাপ্তিমাত্রেই কালেজস্থ কি অধ্যাপক কি ছাত্র সকলেই তাঁহার জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিল; এবং তাঁহার সম্মানার্থ প্রেসিডেন্সি কালেজ হিন্দু ও হেয়ারস্কুল সেই দিবস বন্ধ করা হয়। ছাত্রেরা তাঁহার স্মরণ-চিহ্ন স্থাপন করিবার জন্য একটী সভা করিয়া একদিনে প্রায় ৬০০ টাকা চাঁদা উঠাইয়াছিল।

ইদানীং তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত কৃশ দেখা যাইত এবং বোধ হয় তাঁহার বহুমূত্ররোগের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ইহা পূর্ব্বে বিশেষ রূপে জানিতে পারেন নাই। মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহার হস্তে ঐ বহুমূত্র নিবন্ধন একটী ক্ষত হয়, এবং তজ্জনিত দৌর্ব্বল্য অতিক্রম করিতে না পারায়, রোগ ক্রমে সাংঘাতিক হইয়া উঠে। তাঁহার জীবন রক্ষার নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইল। এই রূপে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইয়া গত ১৫ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তিনি পরলোক গমন করেন। আক্ষেপের বিষয় এই যে, তাঁহার বৃদ্ধা জননী অদ্যাপিও জীবিতা আছেন। নানা শোক-সমাকুলা জীবমাত্রাবশেষা জননীর শোকানল পুনরুদ্দীপন করিয়া মরিতে হইল, ও মৃত্যুকালে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম জ্যেষ্ঠপুত্রের সহিত (যিনি এক্ষণে বিলাতে অধ্যয়ন করিতেছেন) সাক্ষাৎ হইল না, এই দুই চিন্তা মৃত মহাত্মাকে কতই মনোবেদনা প্রদান করিয়াছিল।

প্যারীচরণ বাবু অস্মদ্দেশের বহুবিধ উপকার সাধন করিয়াছেন। বালকদিগের শিক্ষা সৌকর্য্যার্থে তিনি যে কয়েকখানি ইংরাজি ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই। কেবল যে ইংরাজি সাহিত্যে তিনি পারদর্শী ছিলেন এমত নহে, মাতৃ ভাষায়ও তাঁহার

বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি কয়েক বৎসর এডুকেশেন গেজেট নামক বাঙ্গালা পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়া, উহার বিশেষ উন্নতি প্রদর্শন করেন। পরে যখন গবর্ণমেণ্ট তাঁহার লেখার স্বাধীনত্ব লোপ করিতে চেষ্টা পাইলেন, তখন তিনি ঐ পত্রিকার স্বত্ব তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া উহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বহুদিবস অবধি বঙ্গদেশে সুরারস্রোত ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া তিনি অতিশয় দুঃখিত ছিলেন, এবং উহার নিবারণার্থ প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তিনি সুরা-নিবারণী নামক এক সভা স্থাপন করেন, এবং তৎসংক্রান্ত ইংরাজি ভাষায় 'ওয়েল উইসার' নামক ও বঙ্গভাষায় 'হিতসাধক' নামক দুইখানি পত্রিকা প্রচার দ্বারা নব্য কৃতবিদ্যমণ্ডলীর বিশেষ উপকার সাধন করেন।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে সুরা সম্বন্ধে "মদ্যপান-বৃক্ষ" (Tree of Intemperence) নামে একখানি অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রণয়ন করিয়া যান। দুঃখের বিষয়, উহার দ্বিতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

এতদ্ভিন্ন তিনি অনেকগুলি সদনুষ্ঠানের নিদান। বস্তুতঃ দেশের কোন হিতানুষ্ঠান প্রস্তাব হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাতে সাহায্য প্রদান করিতেন। দেশীয় সদাচারের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল, এবং ক্রমশঃ জ্ঞানোদয়ের সহিত যাহাতে কুসংস্কার লোপ হয় ইহাই তাঁহার জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। বিদেশীয় ছাত্রদিগের সুবিধার নিমিত্ত তিনি হিন্দু-হষ্টেল নামক একটী ছাত্রাবাস স্থাপিত করেন। চোরবাগান-বালিকা-বিদ্যালয় তাঁহার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত, এবং তাঁহারই যত্নে উহা এক্ষণে একটী উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় হইয়া উঠিয়াছে। চোরবাগান পল্লীতে বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত তাঁহার আর একটী স্কুল ছিল, তাহাতে মধ্যবিত্ত লোকের সন্তানদিগের বিশেষ উপকার হইত। অস্মদ্দেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিবার নিমিত্ত পণ্ডিতবর শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত প্যারীবাবু যৎপরোনাস্তি ক্লেশ স্বীকার করেন, এবং ইহার নিমিত্ত অর্থব্যয় করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তিনি সকলের

প্রতি প্রীতি করিতেন, তাঁহার হৃদয় যেন প্রেমে ও প্রীতিতে গঠিত ছিল। নভোমণ্ডলস্থিত মেঘসমূহ যেমন সূর্য্যের কিরণ সম্পাতে নানা সময়ে নানা বর্ণ ধারণ করে, সেইরূপ তাঁহার প্রীতি নানা রূপ ধারণ করিয়া মানবজাতির প্রতি প্রধাবিত হইত। মাতার প্রতি অবিচলিত ভক্তি, পত্নী ও সুহৃদ্‌বর্গের প্রতি অনুরাগরঞ্জিত প্রেম, আত্মজ, অনুজ ও ছাত্রদিগের প্রতি কল্যাণচিন্তোৎকণ্ঠাপরিপূর্ণ স্নেহ, এবং দীন দরিদ্রের প্রতি অসামান্য দয়া, এই সকল প্রকার ভাবই তাঁহার হৃদয়ে সমান রূপে বিরাজ করিত। প্রীতি যদি বস্তুতঃই ঈশ্বরের স্বরূপ হয়, যদি প্রীতির নিঃস্বার্থ নির্মুক্ত নিরুপম ভাব অন্তরে পোষণ করিলে মনুষ্য যথার্থই দেবলোক সম্ভজনীয় হয়, তবে যে তিনি সর্ব্ব সাধারণের ভক্তিভাজন ও শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাঁহার মাতৃভক্তি কীদৃশী ছিল ইহার প্রমাণ দিতে হইলে এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, যে তিনি প্রতিদিন মাতার পাদোদক পান না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। পরের দুঃখ মোচন করা তাঁহার জীবনের একটী প্রধান ব্রত ছিল। অনাথ দেখিলেই সাহায্য করিতেন, নিরাশ্রয় দেখিলেই আশ্রয় দিতেন। তাঁহার বদান্যতা লোক দেখান ছিল না। তিনি যশোলাভেচ্ছায় সৎকার্য্য করিতেন না। বস্তুতঃ তাঁহার দক্ষিণ হস্ত যাহা দান করিত তাহা বামহস্ত জানিতে পারিত না। তিনি তাঁহার আয়ের প্রায় চতুর্থাংশ পরের সাহায্যে ব্যয় করিতেন। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যা দেশের মহা দুর্ভিক্ষ সময়ে তিনি একটী অন্নছত্র করিয়া প্রতিদিন প্রায় সহস্র দুর্ভিক্ষ-পীড়িতকে স্বহস্তে অন্নদান করেন।

তিনি অতি শান্তপ্রকৃতি অমায়িক লোক ছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার সদ্ব্যবহারে সকলেই মোহিত হইয়া যাইত। তাঁহার সহাস্যবদন ও সুমিষ্ট বচন সকলকেই পরিতৃপ্ত করিত। সচ্চরিত্রের যে কয়েকটী উপাদান, তাহা তাঁহাতে সম্যকরূপে বর্ত্তমান ছিল। তাঁহাকে নিঃস্বার্থপরতা, সরলতা, উদারতা ইত্যাদি গুণরাজির

আধার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ধর্ম্মবিষয়ে তিনি অধিক আড়ম্বর করিতেন না। তিনি একটী ঈশ্বরনিষ্ঠ, প্রকৃত ধর্ম্মাত্মা পুরুষ ছিলেন। "তস্মিন্ প্রীতি স্তৎপ্রিয় কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব," (পরমেশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন, ইহাই তাঁহার উপাসনা), এই মহাবাক্য তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন।

বাস্তবিক, প্যারীবাবু আমাদিগের সমাজের একটী অসামান্য লোক ছিলেন। লোকমাত্রেতেই কিছু না কিছু দোষ দেখা যায়, কিন্তু তাঁহাতে কোন দোষই ছিল না—তিনি সর্ব্বগুণান্বিত ছিলেন। তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অসাধারণ বুদ্ধি ও বাক্যাতীত স্মরণ শক্তি মনে হইলে একেবারে বিস্মিত হইতে হয়। তাদৃশ মহোদয়ের বালবৎ সরলতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। প্রকৃত দেশহিতৈষিতা, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, অসীম দয়া ও লোকোত্তর বদান্যতা, মনীষিতা, অলৌকিক মাতৃভক্তি, যথোচিত সন্তান বাৎসল্য, অকৃত্রিম দাম্পত্যপ্রণয়, স্থির সৌহার্দ্দ, প্রিয়ভাষিতা প্রভৃতি নানাবিধ সদ্‌গুণ বিভূষিত হইয়া প্যারীবাবু বঙ্গভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহার গুণ বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। বোধ হয় বিধাতা একাধারে সকল গুণ দেখিবার নিমিত্ত তাঁহাকে সৃজন করিয়াছিলেন। অনন্তধামে তিনি অনন্তকাল সুখভোগ করেন, এই আমাদিগের প্রার্থনা।

বিলাপ-লহরী।

আজি কেন শোকাকুলা ভারত-জননী;
কার তরে আঁখি-নীরে, বজ্রপাত ধরি শিরে,
ভাসিছে কাতরে সতী কমল-নয়নী?
যুগের তপস্যা-ফলে, অতুল পুণ্যের বলে,
লভিলা অমূল্য-নিধি দুর্লভ-ধরণি;
হায় তাহা কে হরিল পাইয়া রজনি!

শোকাতুরা নিরাধারা জনম-দুখিনী ;—
প্রিয় পুত্র পরম্পরা, হারায়ে জীবন্তে মরা,
গতশোক না ভুলিতে মাতা অভাগিনী,
দুরন্ত নূতনে দহে, নয়নে জুয়ার বহে,
ক্ষত-হৃদি-বিদারণে মরি পাগলিনী ;
হায় বিধি ! কত জ্বালা সবে অনাথিনী !

ভারত মাতার যত তনয়-রতন,—
নরসিংহ গুণাকর, যশে পূর্ণ-শশধর,
মহামান্য নিরুপম ধরণি-ভূষণ,
হায় একে একে সবে, আঁধার করিয়া ভবে,
উজ্জ্বল করিল মরি ত্রিদশ-ভুবন ;
তুমিও সে পথে দেব, পিয়ারী-চরণ ?

নরকুল-মহোদ্ভব, দয়ার সাগর !
তোমার বিয়োগে বঙ্গ, উৎসবে হইয়া ভঙ্গ,
হাহাকার রবে হায়, ভেদিল অম্বর।
সারদে শুভদে গৌরি, কি পাপে কৃতান্ত-সোরী,
শুভ দিনে হেন বাদ সাধিল পামর,
দনুজ-দলনি ! তাই ভাবি নিরন্তর।

দীননাথ, দীনবন্ধু, গুণসিন্ধু ভবে
কে ছিল তোমার প্রায়, তাই কাঁদে উভরায়,
বিকল-পরাণ-বঙ্গ-পুরজন সবে ;
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ, দীনহীন কি সমৃদ্ধ,
ত্রিভুবন বশীভূত সদ্গুণ-প্রভবে,
ধন্য হে দরিদ্র-পাল ! ঐহিক বিভবে !

সদানন্দ, অমায়িক, প্রফুল্ল-বদন !
যে হেরিল একবার, অমনি হৃদয় তার
পূরিল ভকতি-রসে — জুড়াল নয়ন ;
হায় সে মধুর বাণী, সুধা সম অনুমানি,
বারেক শ্রবণে হয় সার্থক শ্রবণ ;
কে আর শুনাবে তাহা ;—হায় রে শমন !

জননী-বৎসল দেব ! ধার্ম্মিক-প্রবর !
ভকতি-কুসুম দিয়া যে মাতারে আরাধিয়া,
যাঁর পাদোদক-পানে পূত কলেবর ;
সে বৃদ্ধারে একাকিনী করি শোকে পাগলিনী,
কোথায় গিয়াছ সাধো ইহলোকান্তর ;
এই কি তোমার ধর্ম্ম বিদ্যার-সাগর !

চন্দনপাদপাশ্রিত লতিকা-রমণী—
হায় কি দুর্দ্দশা তার, করিতেছে হাহাকার,
হারায়ে জীবিতনাথ লুটায় ধরণি ;
তরু যদি অবহেলে অবলা তথাপি মেলে
সে চরণে—সেই তার স্বরগ অবনি !
কি দোষে ত্যজিলে তারে নরশিরোমণি !

কোথায় রহিল তব বন্ধু পরিজন ?
মধুর বয়স্য-ভাবে মহানন্দে দিন যাবে,
সে সাধে সাধিল বাদ তপন-নন্দন ;
তোমার বিরহে তারা, নিরানন্দ জ্ঞানহারা,
করিছে তোমার লাগি নেত্র-বরষণ ;
তব প্রিয় পুত্রগণ বিষাদে মগন !

হে পণ্ডিতবর! তব মহিমা অপার;
শিক্ষাগুরু বৃহস্পতি, দানে তুমি অঙ্গপতি,
নিঃশব্দে সাধিলে হিত ভারত মাতার।
বঙ্গীয় মহিলাগণে, জ্ঞানালোক-বিতরণে,
নিয়ত নিরত সাধো হৃদয় তোমার;
শোকের সাগরে ভাসে রমণী-সংসার।

অক্ষয় তোমার কীর্ত্তি কলঙ্ক-বিহীন;
জন্মিয়া জগতীধামে রাখিলে হে পরিণামে
সদ্‌গুণ-আদর্শ-নাম—নিয়ত নবীন!
যত কাল জীবে বঙ্গ, বহিবে শোক-তরঙ্গ,
ভারত-জননী রবে চিন্তায় মলিন;
লহ প্রণিপাত দেব, ত্রিদিব-বাসিন্!

মহারাষ্ট্রীয় জাতি।

মধ্যভারতবর্ষের প্রায় অধিকাংশ প্রদেশেই মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিবাস। তন্মধ্যে নাগপুর একটী মহারাষ্ট্রীয়দিগের বাসস্থান। মহারাষ্ট্রীয়গণ অত্যন্ত সাহসী, বলবান ও তেজস্বী এবং দেখিতে অতি সুশ্রী, বিশেষতঃ ভদ্রবংশীয় স্ত্রীলোকেরা অতিশয় সুন্দরী। ইহাদিগের পুরুষগণ প্রায় বাঙ্গালীদিগের মত কাপড় পরে, কিন্তু এক এক বৃহৎ বৃহৎ পাগোঠা (অর্থাৎ পাগড়ী) মাথায় দেয়, ইহাদের মধ্যে যে যত ধনী তাহার তত বড় পাগড়ী। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা কাছা ও কোঁচা দিয়া কাপড় পরে, এবং সর্ব্বদা জামা পরিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যে নিতান্ত দরিদ্র, তাহারও গায়ে একটী জামা আছে। ইহাদিগকে কখন পাতলা কাপড় পরিতে দেখা যায় না, এবং ইহাদের পরিধান বস্ত্র ১৬।১৭ হাতের ন্যূন নহে। যদিও কাছা ও কোঁচা দিয়া কাপড় পরাতে ইহাদের

বড় ভাল দেখায় না বটে, কিন্তু বঙ্গমহিলাগণের ন্যায় ইহাদের পরিধান বস্ত্র লজ্জাজনক নহে। দুঃখের বিষয় এই যে, কলিকাতা-বাসিনী হিন্দুরমণীগণের ন্যায় আর কোন জাতিকে পাতলা কাপড় পরিতে দেখা যায় না। এমন কি তাহাদের মধ্যে অনেকে মোটা কাপড় পরিতে ভার বোধ করেন, এবং যদি কেহ মোটা কাপড় পরে, তাহা হইলে তাহাকে 'পাড়াগেঁয়ে পছন্দ' বলিয়া উপহাস করা হয়। অশিক্ষিতা মহিলাগণের এরূপ করাতে অধিক দোষ দেওয়া যায় না বটে, কিন্তু এখনকার শিক্ষিতা মহিলাগণের এরূপ পাতলা বস্ত্র পরিধান করা অতিশয় লজ্জার বিষয়। যাহাতে স্ত্রী, ভগিনী, কন্যা ইত্যাদি পরিবারগণের এরূপ লজ্জাজনক পরিচ্ছদের সংশোধন হয়, তদ্বিষয়ে বঙ্গীয় কৃতবিদ্য মহোদয়গণের সমধিক যত্নবান হওয়া উচিত; নতুবা ইহা কখনই সংশোধন হইবে না।

মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীগণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, ইহারা আমাদিগের ন্যায় পিঞ্জরবদ্ধা নহেন, ইহাদের বাটীর অন্তঃপুর নাই। মহারাষ্ট্রীয় রমণীগণ কি ধনী কি দরিদ্র সকলেই প্রকাশ্যরূপে পদব্রজে রাজপথে গমনাগমন করে, ইহারা শ্বশুর ভাশুর, দেবর, স্বামী প্রভৃতি পরিজনবর্গের সহিত একত্র বসিয়া আহারাদি করিয়া থাকে, ইহাতে ইহাদের কোন লজ্জা বোধ হয় না। কাহার সম্মুখে বাহির হইতে, কিম্বা কথা কহিতে ইহাদের নিষেধ নাই। এমন কি মহারাষ্ট্রীয়দিগের কোন কাজকর্ম্ম উপলক্ষে, তাহাদের পরিবারগণ স্বহস্তে সমস্ত পরিবেশনাদি করিয়া থাকে, ইহাতে ইহাদের নিন্দা নাই। বঙ্গমহিলাগণের ন্যায় মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীগণকে সর্ব্বদা ঘোম্‌টায় বদন আবৃত করিয়া বোবার ন্যায় কালযাপন করিতে হয় না। ইহাদের মধ্যে ঘোম্‌টা কিম্বা মাথায় কাপড় দেওয়া রীতি নাই, এমন কি ইহাদের সধবাদিগের মাথায় কাপড় দেওয়া দোষ। কেবল বিধবা স্ত্রীলোকেরা মাথায় কাপড় দিয়া থাকে।

হে পণ্ডিতবর! তব মহিমা অপার;
শিক্ষাগুরু বৃহস্পতি, দানে তুমি অঙ্গপতি,
নিঃশব্দে সাধিলে হিত ভারত মাতার।
বঙ্গীয় মহিলাগণে, জ্ঞানালোক-বিতরণে,
নিয়ত নিরত সাধো হৃদয় তোমার;
শোকের সাগরে ভাসে রমণী-সংসার।

অক্ষয় তোমার কীর্ত্তি কলঙ্ক-বিহীন;
জন্মিয়া জগতীধামে রাখিলে হে পরিণামে
সদ্‌গুণ-আদর্শ-নাম—নিয়ত নবীন!
যত কাল জীবে বঙ্গ, বহিবে শোক-তরঙ্গ,
ভারত-জননী রবে চিন্তায় মলিন;
লহ প্রণিপাত দেব, ত্রিদিব-বাসিন্!

মহারাষ্ট্রীয় জাতি।

মধ্যভারতবর্ষের প্রায় অধিকাংশ প্রদেশেই মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিবাস। তন্মধ্যে নাগপুর একটী মহারাষ্ট্রীয়দিগের বাসস্থান। মহারাষ্ট্রীয়গণ অত্যন্ত সাহসী, বলবান ও তেজস্বী এবং দেখিতে অতি সুশ্রী, বিশেষতঃ ভদ্রবংশীয় স্ত্রীলোকেরা অতিশয় সুন্দরী। ইহাদিগের পুরুষগণ প্রায় বাঙ্গালীদিগের মত কাপড় পরে, কিন্তু এক এক বৃহৎ বৃহৎ পাগোঠা (অর্থাৎ পাগড়ী) মাথায় দেয়, ইহাদের মধ্যে যে যত ধনী তাহার তত বড় পাগড়ী। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা কাছা ও কোঁচা দিয়া কাপড় পরে, এবং সর্ব্বদা জামা পরিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যে নিতান্ত দরিদ্র, তাহারও গায়ে একটী জামা আছে। ইহাদিগকে কখন পাতলা কাপড় পরিতে দেখা যায় না, এবং ইহাদের পরিধান বস্ত্র ১৬।১৭ হাতের ন্যূন নহে। যদিও কাছা ও কোঁচা দিয়া কাপড় পরাতে ইহাদের

বড় ভাল দেখায় না বটে, কিন্তু বঙ্গমহিলাগণের ন্যায় ইহাদের পরিধান বস্ত্র লজ্জাজনক নহে। দুঃখের বিষয় এই যে, কলিকাতা-বাসিনী হিন্দুরমণীগণের ন্যায় আর কোন জাতিকে পাতলা কাপড় পরিতে দেখা যায় না। এমন কি তাহাদের মধ্যে অনেকে মোটা কাপড় পরিতে ভার বোধ করেন, এবং যদি কেহ মোটা কাপড় পরে, তাহা হইলে তাহাকে 'পাড়াগেঁয়ে পছন্দ' বলিয়া উপহাস করা হয়। অশিক্ষিতা মহিলাগণের এরূপ করাতে অধিক দোষ দেওয়া যায় না বটে, কিন্তু এখনকার শিক্ষিতা মহিলাগণের এরূপ পাতলা বস্ত্র পরিধান করা অতিশয় লজ্জার বিষয়। যাহাতে স্ত্রী, ভগিনী, কন্যা ইত্যাদি পরিবারগণের এরূপ লজ্জাজনক পরিচ্ছদের সংশোধন হয়, তদ্বিষয়ে বঙ্গীয় কৃতবিদ্য মহোদয়গণের সমধিক যত্নবান হওয়া উচিত; নতুবা ইহা কখনই সংশোধন হইবে না।

মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীগণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, ইহারা আমাদিগের ন্যায় পিঞ্জরবদ্ধা নহেন, ইহাদের বাটীর অন্তঃপুর নাই। মহারাষ্ট্রীয় রমণীগণ কি ধনী কি দরিদ্র সকলেই প্রকাশ্যরূপে পদব্রজে রাজপথে গমনাগমন করে, ইহারা শ্বশুর ভাশুর, দেবর, স্বামী প্রভৃতি পরিজনবর্গের সহিত একত্র বসিয়া আহারাদি করিয়া থাকে, ইহাতে ইহাদের কোন লজ্জা বোধ হয় না। কাহার সম্মুখে বাহির হইতে, কিম্বা কথা কহিতে ইহাদের নিষেধ নাই। এমন কি মহারাষ্ট্রীয়দিগের কোন কাজকর্ম্ম উপলক্ষে, তাহাদের পরিবারগণ স্বহস্তে সমস্ত পরিবেশনাদি করিয়া থাকে, ইহাতে ইহাদের নিন্দা নাই। বঙ্গমহিলাগণের ন্যায় মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীগণকে সর্ব্বদা ঘোম্‌টায় বদন আবৃত করিয়া বোবার ন্যায় কালযাপন করিতে হয় না। ইহাদের মধ্যে ঘোম্‌টা কিম্বা মাথায় কাপড় দেওয়া রীতি নাই, এমন কি ইহাদের সধবাদিগের মাথায় কাপড় দেওয়া দোষ। কেবল বিধবা স্ত্রীলোকেরা মাথায় কাপড় দিয়া থাকে।

যখন তাহারা বিছার জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিত, তখন তিনি তাহাতে হাসিতেন ও তামাসা দেখিতেন। মালীরাও এইরূপে প্রায় নয়-মাসকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু হইলে পর, তাঁহাদের বংশে অহল্যাবাই ভিন্ন আর কেহই উত্তরাধিকারী ছিল না। তাঁহার গঙ্গাধরপন্ত নামে একজন মন্ত্রী ছিল। তাহার এই ইচ্ছা ছিল যে অহল্যাবাই রাণী না হইয়া, একজন পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন, এবং সেই পোষ্যপুত্র উপলক্ষ করিয়া গঙ্গাধরপন্ত নিজে রাজত্ব করে। এই অভিপ্রায়ে সে অহল্যাবাইকে পোষ্যপুত্র লওয়াইবার জন্য অনেক প্রকারে তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল, কিন্তু অহল্যাবাই তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং কোনমতেই পোষ্যপুত্র লইতে সম্মত হইলেন না। যখন মালীরাওয়ের মৃত্যু হয় তখন মাধবরাও পেশোয়া ছিলেন, এবং রাঘবাদাদা তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিল। গঙ্গাধরপন্ত অহল্যাবাইকে পোষ্যপুত্র লইতে সম্মত করিতে না পারিয়া, রাঘবাদাদাকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখে যে, অহল্যাবাই যাহাতে রাণী না হইয়া পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন তদ্বিষয়ে তিনি চেষ্টা করেন। অতএব গঙ্গাধরপন্তের পরামর্শানুসারে রাঘবা-দাদা অহল্যাবাইকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখেন যে, "তুমি একজন স্ত্রীলোক, তুমি কিরূপে রাজ্যশাসন করিবে? তোমা হইতে কখনই এ কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না, অতএব একজন পোষ্য-পুত্র লও, নতুবা রাজ্য রক্ষা করা ভার হইবে। আর তুমি যে নিজে রাজ্ঞী হইবার সংকল্প করিয়াছ, সে সংকল্প ছাড়িয়া দাও। যদি তুমি কোনমতে ইহাতে সম্মত না হও, তাহা হইলে তোমার সহিত যুদ্ধ করিয়া রাজ্য কাড়িয়া লইব।" এই পত্র পাইয়া অহল্যা-বাই কিছুমাত্র ভীতা না হইয়া, নিজে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সৈন্যদিগের নিকট গিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত উৎসাহ দিতে লাগিলেন, এবং তিনি নিজেও যুদ্ধার্থ গমন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। এবং

রাঘবাদাদার পত্রের এই উত্তর দিলেন যে, "তুমি আমাকে পোষ্যপুত্র লইতে লিখিয়াছ, তাহাতে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই, অতএব আমি তাহা কখনই করিব না। আমি নিজে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইব, এবং আমি জীবিত থাকিতে আমার রাজত্ব কাহাকেও দিব না। অতএব তুমি যদি ইহাতে সম্মত না হও, আমি যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি একজন স্ত্রীলোক হইয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করিব, অতএব আমি যদি তোমার নিকট পরাজিত হই, তাহা হইলে আমার তাহাতে কিছুই অপমান হইবে না, এবং তোমারও তাহাতে কিছুমাত্র পৌরুষ নাই, কেননা একজন স্ত্রীলোককে পরাজিত করা পৌরুষের কাজ নহে। কিন্তু তুমি যদি আমার নিকট পরাজিত হও, তাহা হইলে তোমার এ কলঙ্ক চিরদিন থাকিয়া যাইবে, কারণ একজন পুরুষ হইয়া স্ত্রীলোকের নিকট পরাজিত হওয়া অত্যন্ত অপমানের বিষয়। আর তুমি যে নিশ্চয়ই জয়ী হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই, কারণ মাহ্লাররাওয়ের সৈন্য ও সেনা-পতিগণ অকর্ম্মণ্য ও হীনবীর্য্য নহে। অতএব তোমার যখন ইচ্ছা তখন যুদ্ধ করিতে আসিবে, আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই।"

এই উত্তর পাইয়া রাঘবাদাদা যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল, এবং অন্যান্য দেশের সেনাপতিগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল, কিন্তু কেহই তাহাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইল না, এবং সকলেই উত্তর দিল যে, "আমরা তোমার সাহায্য কখনই করিব না বরং অহল্যাবাইয়ের পক্ষ হইয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করিব, কারণ অহল্যাবাই মাহ্লাররাওয়ের রাজত্বের উত্তরা-ধিকারিণী, অতএব সে যখন নিজে রাজত্ব করিতে চাহিতেছে তখন তোমার তাহাতে বাধা দিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই, এবং তুমি যে যুদ্ধ করিয়া রাজ্য কাড়িয়া লইবে এরূপ অন্যায় কর্ম্মে আমরা কখনই সাহায্য করিব না।" আবার এদিকে মাধবরাও এই সকল জানিতে পারিলেন যে, রাঘবাদাদা তাঁহার অগোচরে অহল্যা-

বাইয়ের উপর এরূপ অন্যায় কর্ত্তৃত্ব করিয়াছে। ইহাতে তিনি রাঘবাদাদাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিলেন এবং কহিলেন যে, অহল্যাবাইকে রাজ্ঞী হইতে বাধা দিবার তোমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। পরিশেষে রাঘবাদাদা আর কিছুই করিতে পারিল না; সুতরাং অহল্যাবাই পুত্রের সিংহাসনে নিজে রাজ্ঞী হইলেন।

বঙ্গবাসিনী ভগিনীগণ দেখুন, অহল্যাবাই কেমন প্রত্যুৎপন্নমতি রমণী ছিলেন। পতিপুত্রহীনা হইয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া সামান্য স্ত্রীলোকের কর্ম্ম নহে, অতএব তিনি যে একজন অসামান্য রমণী ছিলেন, ইহা দ্বারাই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। আমাদের বঙ্গীয় রমণীগণের মধ্যে কেহ এমন বিপদে পতিতা হইলে বোধ হয় এরূপ বুদ্ধি ও সাহস অবলম্বন করিয়া কখনই স্বয়ং রাজ্যলাভ করিতে পারিতেন না।

শ্রীমতী বি, মো, বসু।

প্রাকৃত ভূগোলবিজ্ঞান।

বায়ু।

ভূমণ্ডল চারিদিকে বায়ুরাশির দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহা ভূপৃষ্ঠ হইতে অন্যূন ২৫ ক্রোশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া আছে। যেরূপ মৎস্যাদি জলচর জীবসমূহ সমুদ্রে অবস্থান করে, সেইরূপ আমরা বিস্তীর্ণ বায়ুসাগরে নিমগ্ন রহিয়াছি। বায়ু না থাকিলে, কি উষাকালীন রমণীয় শোভা, কি প্রদোষকালীন মেঘসমূহের নিরুপম কান্তি, কিছুই আমরা দেখিতে পাইতাম না। বায়ু বিহনে কি সুমধুর সংগীতধ্বনি, কি পক্ষীদিগের সুমিষ্ট কলরব, কি গম্ভীর ব্রজনিনাদ কিছুই শ্রবণগোচর হইত না। বায়ু না থাকিলে মেঘ জন্মিত না, শিশিরবিন্দু শ্যামল দূর্ব্বাদলের উপর মুক্তাফলের ন্যায় শোভা পাইত না। যদি ক্ষণকালের নিমিত্ত বায়ু না থাকে, তাহা হইলে আনন্দকোলাহলপূর্ণ এই সংসার একবারে জীবশূন্য হইয়া যায়।

পরম কারুণিক পরমেশ্বর এই নিমিত্ত সকল স্থানেই বায়ু প্রচুর পরিমাণে প্রেরণ করিয়াছেন।

যদিও আমরা বায়ুর কিছুমাত্র ভার অনুভব করি না, তথাপি অন্যান্য বস্তুর ন্যায় বায়ুরও গুরুত্ব আছে। সকলেই দেখিয়াছেন, যে পিচ্‌কারী টানিলে তাহাতে জল উত্থিত হয়। বায়ুর গুরুত্বই ইহার একমাত্র কারণ। পিচ্‌কারীর বাঁট আকর্ষণ দ্বারা তাহার অভ্যন্তরের বায়ু দূরীকৃত হইলে, চতুর্দ্দিকের বায়ুর ভারবশতঃ পিচ্‌কারীর ভিতর জল উঠিয়া থাকে। এই বায়ুর ভার হেতুই শিশুসন্তান মাতার স্তন হইতে দুগ্ধ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভূপৃষ্ঠের প্রতি বর্গ ইঞ্চি প্রমাণ স্থানের উপর বায়ুরাশির পরিমাণ প্রায় ৴৭৷৷০ সের। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আমরা যে কোন প্রকার ভার বহন করিতেছি, তাহা একবারও আমরা অনুভব করি না। পূর্ব্বকালে পণ্ডিতেরা বায়ু, ক্ষিতি, জল, তেজ, ও আকাশকে মূল পদার্থ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, এই পঞ্চভূত হইতেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বিরচিত হইয়াছে। অধুনাতন পদার্থবেত্তা পণ্ডিতেরা বলেন যে ৬৬টী ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তু নির্ম্মিত। এই ৬৬টী পদার্থকে মূল পদার্থ বলা যায়। যে বস্তুকে কোন প্রকারে বিশ্লিষ্ট করিলে দুই বা তদধিক ভিন্ন ভিন্ন বিসদৃশ গুণবিশিষ্ট দ্রব্য পাওয়া যায় না, তাহাকে আমরা মূল পদার্থ বলি। কিন্তু বায়ু হইতে অম্লজন, যবক্ষারজন ইত্যাদি কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু পাওয়া যায়, অতএব উহা মূল পদার্থ নহে। বায়ু যৌগিক পদার্থও নহে। * ইহা একটী মিশ্র পদার্থ, কেননা ইহার উপাদান গুলি রাসায়নিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ নহে, একত্র মিশ্রিত হইয়া থাকে এই মাত্র। সামান্য বায়ুতে ৭৭ ভাগ যবক্ষারজন ও ২৩ ভাগ অম্লজন আছে; ইহাতে অল্প পরিমাণে অম্লাঙ্গারিক বাষ্প ও জলীয় বাষ্পও পাওয়া যায়।

* মূল পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাকে যৌগিক পদার্থ বলা যায়।

যবক্ষারজন উদ্ভিজ্জ ও প্রাণী শরীরের একটী প্রধান উপাদান। অম্লজন সামান্য বায়ুতে বিদ্যমান থাকাতে আমরা নিশ্বাস সহকারে শরীরাভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া প্রাণধারণ করি। বিশুদ্ধ অম্লজন বিনা আমরা এক নিমেষকালও জীবিত থাকিতে পারি না। অম্লজন না থাকিলে দীপাদি আলোক প্রদান করিত না, কাষ্ঠাদি হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইত না। কাষ্ঠাদিতে যে সকল মূল পদার্থ আছে তাহার মধ্যে অঙ্গারক নামক মূল পদার্থই প্রধান। অঙ্গারকের সহিত অম্লজন রাসায়নিক যোগে সংযুক্ত হইলে অগ্নি উৎপন্ন হয়। উক্ত দুই মূল পদার্থের সংযোগে আঙ্গারিক বাষ্প জন্মে। পরিষ্কৃত চূণের জল এই বাষ্পের সহিত মিশ্রিত হইলে দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ হইয়া যায়। এই শ্বেতবর্ণ পদার্থ চা-খড়ি ভিন্ন আর কিছুই নহে*। আমরা যে বায়ু গ্রহণ করি, তাহাতে যতটুকু অম্লজন আছে, তাহা রক্তস্থিত দূষ্য পদার্থ দহন করিয়া ফেলে এবং ইহাতেই আঙ্গারিক বাষ্প উৎপন্ন হয়। উহা প্রশ্বাসের সহিত বহির্গত হইয়া যায়। এই বায়বীয় পদার্থ অধিক পরিমাণে নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু মঙ্গলময় ঈশ্বরের কি অদ্ভুত কৌশল! আমরা যাহা দূষ্য বলিয়া ত্যাগ করি তাহা উদ্ভিদ্ সমূহের আহার স্বরূপ। উদ্ভিজ্জ ও বৃক্ষ সমূহ ঐ বায়বীয় পদার্থ গ্রহণ করে। সূর্য্যকিরণ হরিদ্বর্ণ পত্রে পতিত হইলে, ঐ পত্র ঐ বায়বীয় পদার্থকে অঙ্গারক ও অম্লজন এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলে। বৃক্ষসমূহ অঙ্গার ভাগ গ্রহণ করিয়া অম্লজন ভাগ বিসর্জ্জন করে, এবং এই অম্লজন বাষ্প গ্রহণ করিয়া জীবগণ জীবন ধারণ করে।

জলীয় বাষ্প বায়ুর আর একটী প্রধান উপাদান। ইহা হইতে

* পাঠিকারা ইহার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, একটী বোতলে বাতি জ্বালিয়া তাহাতে পরিষ্কার চূণের জল ঢালিলে, ঐ জল শ্বেতবর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু বাতি না জ্বালিলে, শ্বেতবর্ণ হইবে না। বাতি জ্বালিলে আঙ্গারিক বাষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। চূণের জলে একটী নল দিয়া ফুৎকার দিলে, উহা শ্বেতবর্ণ হইয়া যায়, কেননা আমরা প্রশ্বাস সহকারে আঙ্গারিক বাষ্প ত্যাগ করি।

শিশির, মেঘ, কুজ্ঝটিকাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। বায়ুর জলীয়বাষ্পভাগ অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা শীতকালে কিঞ্চিৎ অল্প, এই কারণে শীতকালে আমাদের হস্ত ওষ্ঠাদি ফাটিয়া যায়। তবে যদি বায়ুতে জলীয় বাষ্প একবারে না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের দশা কি হইত তাহা বলা যায় না।

যে সকল বায়ুর উপাদানের কথা বলা হইল, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশিষ্ট। কেহ বলিতে পারেন, যে যদি তাহাই হয়, তবে সর্ব্বাপেক্ষা গুরু পদার্থ নিম্ন দেশে থাকা উচিত। জল অপেক্ষা তৈল লঘু, এই নিমিত্ত যেরূপ তৈল জলের উপর ভাসে, সেইরূপ বায়ুর পক্ষে হয় না কেন? কিন্তু বায়বীয় পদার্থ সমূহের একটী বিশেষ গুণ আছে। উহাদিগকে একটী পাত্রে রাখিলে, তাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব যেরূপ হউক না কেন, তাহারা প্রসারিত হইয়া পাত্রের সর্ব্বাংশে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। এই পরিব্যাপ্তি গুণে বায়ুতে যে সকল বায়বীয় পদার্থ আছে তাহাদের পরিমাণ সর্ব্বত্র সমান। এই পরিব্যাপকতা গুণ না থাকিলে অধিক ভারবিশিষ্ট প্রাণনাশক আঙ্গারিক বাষ্প সকলে নিম্নে অবস্থিত হইয়া, ভূপৃষ্ঠকে এক বারে জীবশূন্য করিয়া ফেলিত *।

বামাগণের রচনা।

ভারত মাতা।

১

"কে তুমি, সুন্দরি! বিষণ্ণ বদনে,
সুচিকণ তব সুন্দর তনু
ঢাকিয়াছে হায় যেন কাদম্বিনী,
প্রভাতে উদিত নবীন ভানু।

২

কি পবিত্রজ্যোতিঃ নয়নে তোমার,
বহিছে পবিত্র নয়ন-জল,
সুপবিত্র ভাতি ভাসিছে বদনে,
পবিত্র তোমার মুখ-কমল।

* যেখানে বায়ুর সঞ্চালন হয় না তথায় এই বাষ্প জন্মিতে থাকে। প্রাচীন কূপাদি খনন কিম্বা উহা হইতে দ্রব্যাদি উত্তোলন করিবার আবশ্যক হইলে, প্রথমে আস্তে আস্তে একটী আলোক নামাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি আলোক নির্ব্বাণ হইয়া যায়, তবে কূপে নামিতে ভয়ের বিষয় আছে। এইরূপ প্রাচীন কূপে নামিয়া কত জল-মজ্জকের প্রাণনাশ হইয়াছে।

৩

"এত পবিত্রতা আননে যাহার,
হৃদয় কি তার পবিত্র নয় ?
কিসে সুপবিত্র হৃদয় এমন,
হইয়াছে বল কলুষময় ?

৪

"ভূধর নড়েনা সামান্য পবনে,
বায়ু রবি-করে প্রতপ্ত হয়,
আইলে রজনী মুদে সরোজিনী,
শশী মসীমাখা প্রাবৃটে হয়।"

৫

শুনিয়া তখন ছাড়িয়া নিশ্বাস,
বিস্ময়ে চাহিল আমার প্রতি।
নিশির শিশিরে নিষিক্ত কমল,
ঊষায় ঈষৎ চাহে যেমতি।

৬

বীণার ঝঙ্কার অপ্সরী-বদনে,
বিলাপের গীত নিন্দিতে গায়,
মৃদু কল্লোলিনী তটিনী যেমন,
কলকণ্ঠ যথা বিলাপে হায়!

৭

সকরুণে মোরে কহিল সুন্দরী,—
"কহিলে যা তুমি জানিগো সব,
কি হবে শুনিয়ে দুখের কাহিনী,
গলিবে না তায় হৃদয় তব।

৮

"গিয়াছে সে কাল ফুরায়েছে সুখ,
সে সব আদর নাহি গো আর।
হ'ল বহুদিন গেছে তারা চলি,
ছিলাম যাদের কণ্ঠের হার।"

৯

বলিতে বলিতে কমল-নয়নে,
বহিল বিমল-সলিল-ধারা।
হিমানী-নিষিক্ত অমল কমল,
সরমেতে হ'ল বদন ভরা।

১০

"কোথা গো সাবিত্রি সতীকুলমণি,
রমণি-গৌরব জানকি কোথা!
কোথাগো গান্ধারিকোথায়শাণ্ডিলি
কোথা আছ সতি হর-বনিতা ?

১১

"শুনে পতিনিন্দা দক্ষেরি দুহিতা,
ত্যজেছিলে প্রাণ যাহার বলে।
দেখগো আসিয়া সেই পতিভক্তি
কিরূপ এখন অবনীতলে।

১২

"শুনে পতি অন্ধ হায়গো গান্ধারি,
বেঁধেছিলে আঁখি জন্মেরি মত।
সে সব গৌরব সে সব আদর,
নাহি আর বঙ্গে, হয়েছে গত।

১৩

"সে কালের চেয়ে একালে যুবতী
আরো গুণবতী হয়েছে সবে।
শ্বেতাঙ্গী রমণী সভ্যতার খনি,
বঙ্গবালা তাই কেন না হবে ?

১৪

"এখন অনেক শিক্ষিতা যুবতী,
পতিপ্রতি প্রেম কেমন তাঁর ?
সামান্য দোষেতে দোষীহলেপতি,
প্রথমে কটূক্তি শেষে ——র।

১৫

"সতী অগ্রগণ্যা জনক-নন্দিনি!
হায়গো তোমারেলোকের শ্লেষে,
পতিপ্রাণা নারী জেনেওতোমায়,
পাঠালেন রাম অরণ্য-বাসে!

১৬

"তাতেও তোমার বিচলিত চিত
হয় নাই আহা স্বামীর প্রতি।
সতত বলিতে 'রাম গুণধাম
বাম হলে কেন দাসীর প্রতি ?'

১৭

"সুখে দুঃখে পড়ে, আছি এই বঙ্গে,
অন্য কোথা যেতে না চায় প্রাণ।
এখনো অজস্র বঙ্গ-বিনোদিনী
রাখিছে যতনে আমার মান।

১৮

"হায়! পতিহীনা বঙ্গের বালিকা,
বলিতে হৃদয়ে লাগে গো ব্যথা!
করে একাদশী হয়ে ব্রহ্মচারী,
এমন রমণী আছে বা কোথা ?

১৯

"বৈশাখে যখন মধ্যাহ্ন-গগনে,
উদয় হয় গো প্রখর ভানু।
একাদশী করে বঙ্গ-বিধুমুখী,
শুষ্ক বিম্বাধর মলিন তনু!

২০

"এ পবিত্র মূর্ত্তি দেবী মূর্ত্তি সম,
হৃদয়ে জাগে না বল গো কার।
বঙ্গ-বিনোদিনী, সতীত্বের খনি,
এমন রমণী আছে কি আর ?

২১

"বিরি-অনুকারী, অনেক সুন্দরী
হয়েছে এখন বঙ্গের মাঝ।
হয়ে পতিহীনা করে বেশভূষা,
ছি ছি কালামুখ না পায় লাজ ?

২২

"এত অনাদর, তবু আছি বঙ্গে,
অন্য দেশে যেতে বাসনা নাই,
অন্য দেশে নারী চিনেনা আমায়
বুট পরা মেয়ে বড় বালাই!

২৩

"ওগো বঙ্গবালা বসন্ত কোকিলা!
ডাকো সুধা রবে জুড়ায়ে কাণ,
তোমরা বঙ্গের গৌরব আধার,
রেখো রেখো রেখো আমার মান।"

হিন্দু-মহিলা।

অনিত্য সংসার।

কেন রে পাগল মানস আমার,
কেন অভিমান কিসের তরে?
কেন বা রে কর হিংসা অহঙ্কার,
কহ দেখি শুনি তাহা হে মোরে।
তুমি বা কাহার কেই বা তোমার,
কাহারি সাথে বা এসেছ তুমি,
যাইবে হে পুনঃ সাথে বা কাহার
বল দেখি সব শুনি গো আমি।
কর্ব্বুরকুলের পতি দশানন,
সবংশে পামর দরপে মরে,
দেখরে মানব তুলিয়া নয়ন,
রাজা হয়ে শেষে কি হল তারে।
কেন পরপ্রতি বিদ্বেষ তোমার,
অনিত্য মন্দির তোমার জান,
নয়ন মুদিলে সকলি আঁধার
হেরিবে নিশ্চয় আমারে শুন।

আমার আমার করিয়া পাগল
হইয়া ভ্রমিছ ভ্রমেতে বৃথা,
মনের দুখেতে নয়নের জল
ফেলিতেছ কত পাইছ ব্যথা।
কখন ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হয়ে
তৃণ সম দেখ আত্মীয় জনে,
কভু সে ঐশ্বর্য্য সকল হারায়ে
কাঁদ পথে পথে ম্লান বদনে।
কখন মিলনে হাঁসি হাঁসি মুখ
আলাপন কর সবারি সনে,
কখন বিরহে সহ কত দুখ,
তুল না হে আঁখি কাহারো পানে।
অতএব শুন মানস আমার
দম্ভ অভিমান ত্যজ এখনি,
ভাব সেই জনে যেই জন সার
জগতের নাথ--যাঁর অবনী।

শ্রীমতী ন——

সংবাদসার।

যুবরাজ গত সোমবার অপরাহ্ন ৪ টার সময় ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত দেশীয় প্রায় সমস্ত রাজা ও বড় লাট সাহেব তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারিদিগের সহিত বোম্বাইয়ের বন্দরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বোম্বাইয়ে পদার্পণ করিবা মাত্র কতকগুলি পারসি স্ত্রীলোক তাঁহাকে পুষ্পাঞ্জলি ও সুমধুর সঙ্গীত দ্বারা অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। অতিশয় ধূমধামের সহিত তাঁহাকে সহর মধ্যে লইয়া যাওয়া হয়। আমরাও আনন্দ হৃদয়ে জয়ধ্বনি করিয়া

ঈশ্বরের নিকট তাঁহার কুশল প্রার্থনা করিতেছি।

—আইডা লিউইস নাম্নী আমেরিকার একজন মহিলা কয়েকটি বীরত্বের কার্য্যের দ্বারা পৃথিবীবিখ্যাত হইয়াছেন। ইনি এক খানি জীবনতরী আরোহণ করিয়া কয়েক জন মনুষ্যের জীবন রক্ষা করিয়াছেন। এক দিন ঝড় হইতেছে এমন সময় তিনি দেখিতে পান যে, জনেক সৈনিক পুরুষ একখানি নৌকা সহ সমুদ্র মধ্যে নিমগ্ন হইতেছেন। তিনি তদ্দণ্ডে তাঁহার জীবনতরী আরোহণ করিয়া নিমিষের মধ্যে জলমগ্ন ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হন, এবং তাহাকে রক্ষা করেন। আর এক দিন ভয়ঙ্কর ঝড় হইতেছে এমন সময় একখানি নৌকা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি দেখেন যে উহাতে দুই জন মনুষ্য আছেন এবং তাঁহারা অবিলম্বে সমুদ্রের গর্ভে নিহিত হইবেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হন এবং আর কয়েক মিনিট পর গেলে তিনি আর তাঁহাদিগকে বাঁচাইতে পারিতেন না।

১৮৬৯ অব্দে তিনি আর একটি বীরত্বের কার্য্য করেন। এই কার্য্যে তাঁহার নাম পৃথিবীবিখ্যাত হইয়া পড়ে। দুই জন সৈনিক পুরুষ এক খানি নৌকা আরোহণ করিয়া সমুদ্রের মধ্যে গমন করেন। একজন বালক হাইল ধরিয়া থাকে। কিছুক্ষণ পরে প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হয়। নৌকা জলমগ্ন এবং বালকটি তদ্দণ্ডে অন্তর্দ্ধেশ হয়। সৈনিক পুরুষ দুই জন নৌকা ধরিয়া জলের মধ্যে হাবিডুবি খাইতে থাকেন। আমাদের বীরাঙ্গনা ইহা দেখিতে পান। সে দিন তিনি পীড়িত ছিলেন, কিন্তু তবু থাকিতে পারিলেন না। জুতা কি টুপি না লইয়া তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় জীবন-তরীতে আরোহণ করেন এবং প্রবল বাত্যার মধ্য দিয়া তাহার তরী দ্রুতবেগে গমন করিতে থাকে। তাঁহার নিজের বিপদ হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল, কারণ এমন ঝটিকায় কোন তরীই নিরাপদে সমুদ্রপথে যাইতে পারে না, বিশেষ তাঁহার শরীর অপটু। কিন্তু তিনি ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর

করিয়া তরী চালাইতে লাগিলেন। যখন তিনি মগ্নপ্রায় তরণীর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন মনুষ্য দুইজন প্রায় জীবনশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি তাঁহাদিগকে নিজ তরণীর মধ্যে উঠাইলেন এবং পুনরায় প্রচণ্ড ঝটিকার মধ্য দিয়া নির্ব্বিঘ্নে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই মহিলা আরও দুই তিন জন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়াছেন। এমন রমণী পৃথিবীর মধ্যে সকলের পূজ্য।

—লুসাই গারো প্রভৃতি অঞ্চলের পাহাড়ে এক প্রকার বাঁশ উৎপন্ন হয়, তাহার ভিতর অতি স্বাদু ও দেবদুর্ল্লভ পানীয় জল থাকে। উহার আস্বাদ সুমিষ্ট সরবতের ন্যায়। ঐ জল যেমন হজমি তেমনি বলকারক। অসভ্য লুসাইগণের আহার-প্রণালী অতি কদর্য্য। ইহারা একরূপ আম মাংস বা ঈষৎ-দগ্ধ মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। অন্ন আহার করে, কিন্তু ঐ অন্ন ভালরূপে সিদ্ধ হয় না। একটা বাঁশের চোঙার ভিতর কিয়ৎ পরিমাণ চাউল পূরিয়া একবার অগ্নিতে তাতাইয়া লয়। সেই অপক্ক অন্নই উহাদের উপাদেয় বস্তু। এরূপ কদর্য্য আহার করিয়া কিয়ৎ পরিমাণ বংশবারি পান করিলেই শরীর স্বচ্ছন্দ হয়।

—ইংলণ্ডে এক নূতন মুদ্রা যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে, ইহাতে কাগজ স্থাপন, ভাঁজা এনভেলপে মোড়া এবং তাহার উপর শিরোনাম পর্য্যন্ত ছাপা হইবে। ঘণ্টায় এইরূপ পাঁচ হাজার খণ্ড কাগজ ছাপা হইবে।

—সেণ্টপিটর্সবর্গে একটী রমণী-সমাজ হইয়াছে। কয়েকটী রুশীয় রমণী বহুব্যয়-সাধ্য রেশমী পোষাক প্রভৃতির ব্যবহার পরিত্যাগ করিবার জন্য যত্নবতী হইয়াছেন। তাঁহারা ঐ উদ্বৃত্ত অর্থের দ্বারা পিতৃমাতৃ হীন গরিব শিশুদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইবেন। আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা দেখুন।

—মহোপাধ্যায় ম্যাক্স মূলার সাহেব ঋগ্বেদ সংস্করণ প্রকাশ করিয়া ভারতবর্ষীয় সাহিত্য সংসারের যে উপকার করিলেন, তাহার পুরস্কার স্বরূপ ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি মারকুইস্ অব্ সালিসবরি সাহেব তাঁহাকে ২০ হাজার টাকা অর্পণ করিয়াছেন।

(প্রিন্স অব্ ওএলেস্)

মহামহিমার্ণব যুবরাজের প্রতিমূর্ত্তি।

যুবরাজ (প্রিন্স অব্ ওয়েলস্)।

আজ ভারতবর্ষের কি সৌভাগ্য! যুবরাজকে ক্রোড়ে পাইয়া দুঃখিনী ভারতমাতার শোকসন্তপ্ত হৃদয় এতদিনে শীতল হইল। ইংলণ্ডেশ্বরীর জ্যেষ্ঠপুত্র ভারতবর্ষে শুভাগমন করিয়াছেন; আগামি ২৩ শে ডিসেম্বর কলিকাতায় উপস্থিত হইবেন!

ইতিপূর্ব্বে ইংলণ্ডের কোন যুবরাজই কদাপি এখানে আসেন নাই। অধুনা তাঁহারা অনেকেই ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে ও আমেরিকাদি প্রদেশে পর্য্যটন করিয়া থাকেন, কিন্তু হতভাগ্য ভারতরাজ্যের প্রতি কেহই কখন দৃষ্টিপাত করেন নাই। সৌভাগ্যক্রমে ইনি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে স্মরণ করিয়াছেন। ইহাঁর নাম এল্‌বার্ট এড্‌ওয়ার্ড। ইনি শ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রথম পুত্র, এবং প্রিন্স অব ওয়েলস্ নামে বিখ্যাত। ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষ প্রথম এড্‌ওয়ার্ড যখন ওয়েলস্ প্রদেশ জয় করেন, তৎকালে তাঁহার রাণী সেই রাজ্যে একটী তনয় প্রসব করেন। রাজা নূতন প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত রাজকুমারকে প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ অর্থাৎ ওয়েল্‌সের রাজকুমার উপাধি প্রদান করেন। ইনিও পরে রাজা হইলে স্বকীয় প্রথম পুত্রকে এই উপাধি দ্বারা পরিশোভিত করেন। সেই অবধি ইংলণ্ডাধিপতিদিগের জ্যেষ্ঠ তনয়গণ প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ নামে বিখ্যাত।

ইনি রাজতনয়, ইহাঁর মাতা রাণী, কিন্তু ইহাঁর পিতা রাজা ছিলেন না। ইংরাজী ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে রাজা চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যুর পর, তাঁহার ভ্রাতৃকন্যা শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের অধীশ্বরী হয়েন। তখন তিনি অবিবাহিতা। পরে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মনি প্রদেশের প্রিন্স এলবার্ট নামে এক রাজকুমার তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি রাণীর স্বামী হইলেন বটে কিন্তু রাজার কোন ক্ষমতা পাইলেন না; রাজ্যের সমস্ত ভার তাঁহার পত্নীর উপরে রহিল।

মহারাণীর চারি পুত্র ও পাঁচ কন্যা। প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্তান নহেন। ইহাঁর পূর্ব্বে রাণী এক কন্যা প্রসব করেন। তিনি প্রুসিয়ার রাজকুমারকে বিবাহ করেন এবং কালক্রমে সেই রাজ্যের অধীশ্বরী হইবেন।

প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ৯ই নবেম্বরে বকিংহাম প্যালেসে জন্মগ্রহণ করেন, এক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম ৩৩ বৎসর। ভারতবর্ষীয় রাজতনয়গণ যেমন চাটুকারবর্গপরিবৃত হইয়া আলস্যে ও বৃথা আমোদে দিনপাত করেন, ইউরোপের রাজকুমারদের সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতি শৈশবকালে যুবরাজের বিদ্যাশিক্ষার জন্য এক শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হয়। কথিত আছে যে, পাঠাভ্যাসে এক দিবস অন্যমনস্ক হওয়াতে শিক্ষয়িত্রী কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া রাজকুমারকে ভৎর্সনা করেন। রাজকুমার উত্তর করিলেন, "আমি ইংলণ্ডের যুবরাজ, বড় হইলে রাজা হইব; আমার পাঠাভ্যাসে প্রয়োজন কি? আর না করিলেই বা কে আমার কি করিতে পারে।" শিক্ষয়িত্রী ইহা শুনিয়া সাতিশয় দুঃখিত হৃদয়ে ইহাঁর পিতা প্রিন্স এলবার্টকে ডাকিয়া তাঁহাকে সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত করাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ এক বেত্র আনাইয়া তাহা শিক্ষয়িত্রীর হস্তে দিলেন এবং কুমারকে প্রহার করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। কুমার সেই অবধি শিক্ষয়িত্রীকে সাতিশয় ভয় করিতেন ও কদাচ পাঠে অমনোযোগী হইতেন না।

বাল্যকালাবধি ইনি ভ্রমণপ্রিয়। অতি শৈশবাবস্থায় জননীর সহিত ইংলণ্ড ও স্কট্লেণ্ডের নানাস্থান পর্য্যটন করেন। মহারাণী প্রণীত পুস্তকে ইহাঁর নামোল্লেখ সর্ব্বদাই দেখা যায়। যখন সপ্তমবর্ষীয়মাত্র বালক, তখনও নির্ভয়ে পর্ব্বতাদির দুর্গম্য স্থানে ইনি স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিতেন। সমুদ্রপথে যাতায়াত করিলে নূতন যাত্রীদিগের প্রায়ই যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। এমন কি, প্রায় সকলেই চৈতন্যরহিত হইয়া পড়িয়া থাকে। কিন্তু রাজকুমারকে সে যন্ত্রণা কখনই সহ্য করিতে হয় নাই। তিনি শৈশবকাল

হইতেই অবলীলাক্রমে ও স্বচ্ছন্দে সাগরপথে যাতায়াত করিতেন। রাজকুমার বাল্যকালে নিতান্ত শান্ত বা শিষ্ট ছিলেন না। কথিত আছে যে, এক দিবস একটী দরিদ্র বালক সমুদ্রতটে এক পাত্রে কতকগুলি কপর্দ্দক আহরণ করিয়া রাখিয়াছিল, ইতিমধ্যে প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ আসিয়া তাহার বহুকষ্টে সঞ্চিত ধন এক পদাঘাত দ্বারা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বালকটী ক্রোধান্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ কুমারকে আক্রমণ করিল এবং মুষ্ট্যাঘাত দ্বারা নিমেষমধ্যে তাঁহাকে পরাভব করিল। এই বিষয় মহারাণীর কর্ণগোচর হইলে তিনি তাবৎ তথ্যানুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, বালকটীর কিছুমাত্র অপরাধ নাই, কুমারই প্রথমে তাহার প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করেন। মহারাণী বালককে দণ্ডপ্রদান দূরে থাকুক, পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলেন।

যুবরাজ বাল্যকালে বার্চ, গিব্স, ফিশর, টরনর প্রভৃতি কয়েক জন পণ্ডিতের নিকট বিদ্যাভ্যাস করেন। পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। তথা হইতে কেম্ব্রিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া সেখানে তিন চারি বৎসর কাল অবস্থান করিয়া পঠদ্দশা সমাপ্ত করেন। ভারতবর্ষীয় রাজকুমারগণ প্রায় সকলেই বৃথা আলস্যে ও বিলাসিতায় কালযাপন করেন। ইউরোপে সেরূপ দেখা যায় না, তথাকার রাজকুমারদিগকেও সামান্য বালকের ন্যায় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে হয়।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইনি আলেক্জান্দ্রা নাম্নী দিনমার রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। এক্ষণে তাঁহার তিন পুত্র এবং তিন কন্যা। বিবাহের বৎসরেই কুমার আট্লাণ্টিক মহাসাগর উল্লঙ্ঘন করিয়া আমেরিকার উত্তর খণ্ড পরিভ্রমণে প্রবৃত্ত হয়েন। ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া পরবর্ষে ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে আফ্রিকায় গমন করেন, এবং পৃথিবীর সমুদয় খণ্ড অবলোকন করিয়া এক্ষণে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গত আশ্বিন মাসের বিজয়াদশমীর দিবস যুবরাজ ইংলণ্ড

হইতে শুভযাত্রা করেন এবং ইউরোপের কয়েকটী প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া ২৩শে কার্ত্তিক বোম্বাই নগরে পদার্পণ করিয়াছেন। সেখানে সপ্তাহকাল অবস্থানের পর, সিংহল ও মাদ্রাজ দর্শন করিয়া পৌষ মাসের নবম দিবসে কলিকাতায় আসিবেন। পরে এখানে সপ্তাহকাল অবস্থানান্তর বেহার উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, মধ্যভারতবর্ষাদি ভ্রমণ করিয়া মার্চ মাসে ইংলণ্ড যাত্রা করিবেন।

ইংরাজী ১৮৭২ শালে, যুবরাজ এক ভয়ানক ও উৎকট পীড়াক্রান্ত হয়েন; এমন কি তাঁহার জীবন রক্ষা বিষয়ে অনেকেরই সংশয় জন্মিয়াছিল। ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে আবালবৃদ্ধ সকলেই কম্পিতহৃদয়ে তাঁহার আরোগ্যার্থ জগদীশ্বরের নিকট প্রত্যহ প্রার্থনা করিতেন। ইঁহার জনক এই রোগে প্রাণত্যাগ করেন, এজন্য সকলেই একেবারে চিন্তাকুল হইয়া শোকসাগরে মগ্ন হয়েন। ঈশ্বর প্রসাদে যখন সুস্থ হইলেন, এবং এই সংবাদ দেশ বিদেশে জনগণের কর্ণগোচর হইল, তখন আনন্দের আর সীমা রহিল না। চতুর্দ্দিকে উৎসবধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

ইনি এক্ষণে রাজকুমার; একদিন সমস্ত ভারতবর্ষের সম্রাট হইবেন। পুরাকালে ক্ষত্রিয় রাজগণের যে প্রকার বিভব ও ঐশ্বর্য্য ছিল, মুসলমান দিল্লীশ্বরদিগের যে প্রকার অতুল আধিপত্য ছিল, রাজকুমারের এক দিবস তাহা অপেক্ষাও অধিক প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্য হইবে। পৃথিবীর সকল ভাগেই ইংরাজদিগের সাম্রাজ্য আছে। আমেরিকায় কানেডা প্রভৃতি প্রদেশ, আফ্রিকায় কেপ্‌কলনি, আসিয়াতে ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়া, এবং ইউরোপে মল্‌তা, জিব্রাল্টার প্রভৃতি স্থান ইংরাজরাজ্য অন্তর্গত। ইংলণ্ডবাসিগণ গৌরবচ্ছলে দর্প করিয়া থাকেন যে, ইংরাজরাজ্যে সূর্য্য একেবারে অস্ত যান না। ভারতবর্ষ নিশাচ্ছন্ন হইলে কেপ্‌কলনিতে সূর্য্য বিরাজ করিতে থাকেন; ক্রমে তাহাও রজনী পরিবৃত হইলে, ইংলণ্ড তৎপরে কানেডা ইত্যাকারে সমস্ত রাজ্যে কোন না কোন খণ্ড সর্ব্বদাই

সূর্য্যালোকে দীপিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক এ দর্প অলীক নহে। এ প্রকার সুবিস্তীর্ণ ও বৃহৎ রাজ্য অদ্যাবধি কোন জাতি ভোগ করিতে পারেন নাই। প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ এক দিবস এই সমস্ত অসীম রাজ্যের অধীশ্বর হইবেন।

প্রাচীন আর্য্যজাতিদিগের মধ্যে এবং আধুনিক ব্যক্তিদিগের অনেকেরই মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে রাজদর্শনে পুণ্য সঞ্চার হয়। ইংরাজ সাম্রাজ্য স্থাপন অবধি ভারতবর্ষে কোন রাজাই আগমন করেন নাই, সুতরাং রাজদর্শনের পুণ্য অতি অল্প লোকেই লাভ করিয়াছে। এক্ষণে সে প্রতিবন্ধক মোচন হইল। কত লোকের অন্তঃকরণে কত প্রকার ভাবের উদয় হইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? বিপুল ঐশ্বর্য্যরাশি-পরিবেষ্টিত ভারতবর্ষীয় নরপতিগণ আপনাদিগের গৌরব বৃদ্ধির জন্য কতই উপায় চিন্তা করিতেছেন, ও আগ্রহ সহকারে যুবরাজের সন্নিধানে যাইয়া স্ব স্ব মনোরথ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত কতই চেষ্টা করিতেছেন। ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ সুযোগ পাইয়া স্বল্প মূল্যের দ্রব্যগুলি সহস্রগুণ অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া এক মাসের মধ্যে এক বৎসরের কার্য্য করিতেছেন। দীন দরিদ্র লোকেরা অসীম মরুভূমি-পরিবৃত পথিকের ন্যায় সতৃষ্ণনয়নে যুবরাজাগমন-মরীচিকা প্রতি অবলোকন করিতেছে। কারাবাসযন্ত্রণাঘটিত অকালবার্দ্ধক্য জর্জ্জরিত বন্দীগণ যুবরাজাগমনে আপনাদিগের সমস্ত যন্ত্রণা অবসান হইবে বিবেচনা করিয়া সোল্লাসহৃদয়ে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। ইংলণ্ডবাসিগণ কুমারের অশেষবিধ অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া জগদীশ্বরের সমীপে তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছে। ঈশ্বর প্রসাদে সকলের মনস্কামনা সিদ্ধ হইলে যুবরাজের আগমন সাধরণের শুভকর ও যথার্থ সার্থক হইবে। এক্ষণে আমরা কায়মনঃচিত্তে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি সুস্থ শরীরে ও প্রফুল্লচিত্তে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

———

ভারতে কুমার।

৬।।৬।।৬।।৬৬*

আজি মহোৎসব ভারত-ধামে,
মত্ত সবে নৃপ-নন্দন-নামে;
হর্ম্ম্য সুশোভিত পল্লব-দামে,
মঙ্গল-পাত্র বিরাজিত বামে।

বঙ্গ সমাবৃত কেতন-জালে,
দৃশ্য কিবা নব-পঙ্কজ-মালে!
দীপ-শিখাবলি আয়ত ভালে,
ভাস্কর-নিন্দিত বর্ণ বিশালে।

ঝাঁগড় রাগড় দুন্দুভি বাজে,
বর্ম্ম-সমন্বিত সৈনিক সাজে
মুক্ত-অসি-ব্রত যোধ বিরাজে;
ঝঞ্ঝনি কোটি কিরীটক গাজে।

আহব-দক্ষ তুরঙ্গম-লক্ষে,
ভূতল টূটল সাগর কম্পে;
ভেদিত অম্বর কাতর দম্ভে
তোপ-রবে বসুধা অবলম্বে।

বেণু মৃদঙ্গ ররাব সুতানে
আকুল বঙ্গ সুমঙ্গল গানে;
"স্বস্তি" রবে দ্বিজ আশিষ দানে
ভেটিল ভূপতি শাস্ত্র-বিধানে।

* এই চিহ্নগুলি মাত্রার নিয়ম; '৬' গুরু, '।' লঘু বুঝায়। ছন্দের নাম দোধকবৃত্ত।

উঠ মা উঠ মা ভারত-জননি!
পোহা'ল তোমার দুখের রজনি,
জুড়াতে তোমার তাপিত পরাণ,
মুছাতে তোমার সজল বয়ান,
হের মহারাণী হ'য়ে দয়াবতী
ডাকিয়া তনয় কুমারে সম্প্রতি
প্রেরিলা সানন্দে তোমার ঠাঁই।

আজিকার নিশি তব সুপ্রভাত,
কুগ্রহ-সমাজ হইল নিপাত,
উদয়-অচলে সুখের মিহির
অচিরে নাশিবে হৃদয়-তিমির;
ভুবন মোহিল বিহঙ্গ গাইল
কনক-পঙ্কজ কাসারে* হাসিল,
ঊষার রূপের তুলনা নাই॥

উঠ মা উঠ মা ভারত-জননি!
লাসরিয়া শোক নিরখ অবনি,
গঙ্গা গোদাবরী পোত-সমাবৃত,
রাজবর্ত্মকুল জনতা-ব্যাপৃত,
বিবিধ বরণে বিবিধ বরণ
সমাগত আজু ভারত-ভবন;
ধরণি চমকে সে কলতানে।

হের দেখ আর কাতারে কাতার
রাজ-অনুচর—গৌরব-আকার,
সৈনিক-মণ্ডলী অরুণ বসনে
তুরঙ্গমে চলে আরোহি সঘনে,
কটিবন্ধে ঝুলে অসি খরসান,
মস্তকে সমর-মুকুট পিধান,
শ্রবণে কামান অশনি-হানে॥

* সরোবর।

ভারতে কুমার।

৬।।৬।।৬।।৬৬*

আজি মহোৎসব ভারত-ধামে,
মত্ত সবে নৃপ-নন্দন-নামে;
হর্ম্ম্য সুশোভিত পল্লব-দামে,
মঙ্গল-পাত্র বিরাজিত বামে।

বঙ্গ সমাবৃত কেতন-জালে,
দৃশ্য কিবা নব-পঙ্কজ-মালে!
দীপ-শিখাবলি আয়ত ভালে,
ভাস্কর-নিন্দিত বর্ণ বিশালে।

ঝাঁগড় রাগড় দুন্দুভি বাজে,
বর্ম্ম-সমন্বিত সৈনিক সাজে
মুক্ত-অসি-ব্রত যোধ বিরাজে;
ঝঞ্ঝনি কোটি কিরীটক গাজে।

আহব-দক্ষ তুরঙ্গম-লক্ষে,
ভূতল টূটল সাগর কম্পে;
ভেদিত অম্বর কাতর দম্ভে
তোপ-রবে বসুধা অবলম্বে।

বেণু মৃদঙ্গ ররাব সুতানে
আকুল বঙ্গ সুমঙ্গল গানে;
"স্বস্তি" রবে দ্বিজ আশিষ দানে
ভেটিল ভূপতি শাস্ত্র-বিধানে।

* এই চিহ্নগুলি মাত্রার নিয়ম; '৬' গুরু, '।' লঘু বুঝায়। ছন্দের নাম দোধকবৃত্ত।

উঠ মা উঠ মা ভারত-জননি!
পোহা'ল তোমার দুখের রজনি,
জুড়াতে তোমার তাপিত পরাণ,
মুছাতে তোমার সজল বয়ান,
হের মহারাণী হ'য়ে দয়াবতী
ডাকিয়া তনয় কুমারে সম্প্রতি
প্রেরিলা সানন্দে তোমার ঠাঁই।

আজিকার নিশি তব সুপ্রভাত,
কুগ্রহ-সমাজ হইল নিপাত,
উদয়-অচলে সুখের মিহির
অচিরে নাশিবে হৃদয়-তিমির;
ভুবন মোহিল বিহঙ্গ গাইল
কনক-পঙ্কজ কাসারে* হাসিল,
ঊষার রূপের তুলনা নাই॥

উঠ মা উঠ মা ভারত-জননি!
পাসরিয়া শোক নিরখ অবনি,
গঙ্গা গোদাবরী পোত-সমাবৃত,
রাজবর্ত্ম কুল জনতা-ব্যাপৃত,
বিবিধ বরণে বিবিধ বরণ
সমাগত আজু ভারত-ভবন;
ধরণি চমকে সে কলতানে।

হের দেখ আর কাতারে কাতার
রাজ-অনুচর—গৌরব-আকার,
সৈনিক-মণ্ডলী অরুণ বসনে
তুরঙ্গমে চলে আরোহি সঘনে,
কটিবন্ধে ঝুলে অসি খরসান,
মস্তকে সমর-মুকুট পিধান,
শ্রবণে কামান অশনি-হানে॥

* সরোবর।

বৃটন শাসন ছাইল মেদিনী,
ছুটিল তটিনী—সাগর - বাহিনী,
ভূধর কাঁপিল, বরুণ আকুল
অকূল পাথারে হারা'য়ে দুকূল,
ভয়বীচিমালা প্রবেশি নিলয়
করিল চঞ্চল গভীর হৃদয়;
চিন্তায় মলিন বরণ নীল।

সমর - দামামা বাজিল সঘনে
অচল চঞ্চল ভেরীর নিক্কণে,
"জয় মহারাণী" বৃটন - বাসিয়া
'জয়' 'জয়' রবে ভুবন পূরিয়া
দিলা পরিচয় স্বকীয় মহিমা
ধরম - পালিত উন্নত গরিমা;
ভূপান্তরে যার নাহিক তিল॥

তবু মা বুঝে না অবোধ পরাণ,
অপমান - ভয়ে সদা ম্রিয়মাণ,
আর্য্য-বংশোদ্ভব ভারতে যে জাতি
ধরিল হৃদয়ে বিজ্ঞানের ভাতি,
সুযোগ্য সুরীতি সুমতি সুধীর,
কুল - শীল - মান প্রদত্ত বিধির;
জীবন অধিক ভাবে সে ধনে।

যেই আর্য্যকুল সভ্যতার খনি,
গরবে টলিত অচল অবনি,
নর - নারীকুল সুযশ - সৌরভে
দেশ দেশান্তর পূরিত গৌরবে;
এবে সেই জাতি পূজি মাতৃভাবে
বরিল তোমায় সুশীল স্বভাবে,
হেরি তব গুণ মোহিত মনে॥

উঠ পুরজন মেলিয়া নয়ন
সভক্তি সানন্দে কর দরশন
ভাবী নরপতি নব যুবরাজ
অসীম সৌভাগ্য ভারতের আজ,
ভূপতি অতিথি করিয়া সৎকার
মঙ্গল আচারে আন হে আগার,
পা'বে না এ হেন সুখের দিন।

যাঁর করে কোটি নরের পরাণ,
বিক্রমে অতুল যথা অংশুমান্,
নগ-সম স্থির, ধরা - সম ধীর,
তরল-হৃদয় — পয়োধি - গভীর,
সকৃপ কটাক্ষ, পুণ্যের উদয়ে
লভ হে তাঁহার, ভক্তি বিনিময়ে;
অবশ্য হইবে অভাব - হীন।

উঠ মা উঠ মা ভারত-জননি!
বিগত তোমার দুখের রজনি,
ভূপতি অতিথি করহ গ্রহণ,
হৃদয় - বেদন করহ জ্ঞাপন,
নয়ন - সলিল সম্বর সম্বর
সাদরে কুমারে স্বীয় অঙ্কে ধর,
একেত প্রাচীন—সুবাদে মাসী।

বাজ রে বীণা বাজ এই বার
মজুক আনন্দে অখিল সংসার,
গিরি বা কুলীশ সাগর উচ্ছ্বাসে
বাজ রে মুরলী মনের উল্লাসে—
"ভারতের দুখে মাতা মহারাণী
"সাদরে কুমারে কহিলা এ বাণী—
"'যাও বৎস, তোষ ভারতবাসী।'"

বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ সংস্কার।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমাদিগের শারীরিক ও নৈতিক উন্নতি সাধনে আমরা যথেষ্ট মনোযোগ করি না। এক্ষণে দেখা-যাউক মনের উন্নতি বিষয়ে আমরা কীদৃশ যত্নবান আছি।

সকল মনুষ্যেরই মনোবৃত্তিগুলি সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করা কর্ত্তব্য। এইরূপে পরিচালিত হইয়া মানসিক ক্ষমতাগুলি পরস্পরের সহিত যথোচিত সম্বন্ধ প্রাপ্তি হইলে মনের যথার্থ উন্নতি হইবে। কিন্তু জ্ঞান ব্যতীত মনোবৃত্তির চালনা হইতে পারে না। সুতরাং মনুষ্যমাত্রেরই জ্ঞানোপার্জ্জন করা বিধেয়।

জ্ঞানোপার্জ্জন দ্বিবিধ প্রকারে সাধিত হইতে পারে। (১), পুস্তকাদি পাঠ। ইহা দ্বারা পুরাকালের অনেক বিষয় অবগত হইতে পারা যায় এবং গ্রন্থকর্ত্তাদিগের উত্তম চিন্তাগুলি একত্রে প্রাপ্ত হইয়া মনোবৃত্তিচালনা বিষয়ে অশেষবিধ সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা; এবং বর্ত্তমানকালের যে সকল বিষয় আমরা স্বচক্ষে দেখিতে সমর্থ হই না, তাহাও পুস্তকপাঠে সবিশেষ জানিতে পারা যায়। (২), দেশ-ভ্রমণ, ও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিদিগের সহিত কথোপকথন। এইরূপে নানা দেশের নানা বিষয় দর্শন করিয়া ও নানা জাতীয় লোকদিগের ভিন্ন ভিন্ন আচার ব্যবহারাদি অবলোকন করিয়া সেই সকল বিষয়ের সম্যক আলোচনানন্তর আমরা বহুবিধ জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পারি। এবম্প্রকার দ্বিবিধ উপায় কর্ত্তৃক আমরা আমাদিগের মনোবৃত্তির সম্যক পরিচালনা করিতে সমর্থ হই।

আমাদিগের পুরুষদিগের এই উভয়বিধ জ্ঞানোপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা আছে। তাঁহারা যথেষ্ট পরিমাণে পুস্তক পাঠ করিতে পারেন এবং দেশ ভ্রমণ করিতেও তাঁহাদিগের কোন বাধা নাই। বাল্যকাল হইতে সুচারুরূপে শিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহাদিগের বিদ্যার প্রতি অনুরাগ জন্মিতে পারে। সুতরাং বিদ্যালয় পরিত্যাগ

করিলেও তাঁহাদিগের পাঠক্রিয়া সাধিত হইতে পারে। এবং দেশ ভ্রমণ বিষয়েও তাঁহাদিগের অনেক সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদিগের বামাগণের জ্ঞানোপার্জ্জনের তাদৃশ সুবিধা দৃষ্ট হয় না। পুস্তক পাঠ ব্যতীত তাহাদিগের আর কোন উপায় নাই। তাহাদিগের ভাগ্যে দেশ ভ্রমণ দূরে থাকুক, অপর লোকদিগের সহিত বাক্যালাপ করা দূরে থাকুক, নিজ গৃহের সকল পুরুষদিগের সহিত বাক্যালাপ তাহাদিগের সমর্থাতীত। সুতরাং জ্ঞানোপার্জ্জনের সকল পথ রুদ্ধ থাকাতে তাহাদিগকে স্বাভাবিক অবস্থাতে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। ইহাতে মনোবৃত্তির উন্নতি না হইয়া ক্রমশঃ অধোগতি হইতে থাকে। এক্ষণকার বালিকাবিদ্যালয় সংখ্যা দেখিয়া অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা সুচারুরূপ শিক্ষা লাভ করিতেছে। অন্ততঃ বাহ্যিক আড়ম্বর দেখিয়া এইরূপ বোধ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু আমরা এরূপ মতের পোষকতা করিতে পারি না। কারণ দশম বর্ষ অতীত হইতে না হইতেই আমরা বালিকাদিগকে বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া লই। এইরূপ অবস্থাতে তাহারা অত্যল্প মাত্রই শিখিয়া থাকে, সুতরাং বিদ্যার প্রতি তাহাদিগের অনুরাগ জন্মিতে পারে না। অতএব বিদ্যালয় পরিত্যাগানন্তর অনেককেই বিদ্যাশিক্ষা হইতে বিরত হইতে হয়, আর পঠদ্দশাতেও স্ব স্ব পরিবারবর্গের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্তি না হওয়াতে তাহাদিগের বিদ্যাশিক্ষা সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না। যদি বালকদিগের ন্যায় বালিকারা আরও কিছুকাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে পায়, ও স্বগৃহ হইতে যথেষ্ট পাঠসাহায্য লাভ করে, তাহা হইলে আমাদিগের বালিকাগুলি কথঞ্চিৎ বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারে।

"কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ," (অর্থাৎ কন্যাকেও অতি যত্নের সহিত প্রতিপালন ও শিক্ষা দান করিবে)। এরূপ উক্তি প্রায় অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা

কার্য্যে পরিণত হইতে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলেই কন্যাকে পালন করিতেছেন কিন্তু অতি অল্প সংখ্যাই উহাদিগকে সুচারুরূপ শিক্ষা দিতেছেন। অনেকে মনে করেন যে, কন্যাকে বা ভগিনীকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলেই তাহারা বিদ্যাশিক্ষা করিবে। কিন্তু ইহাঁরা ভ্রমেও ভাবেন না যে, পিতা বা ভ্রাতার সাহায্য ব্যতীত কেবলমাত্র বিদ্যালয় হইতে উত্তম শিক্ষা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। এরূপ অযত্নের একমাত্র কারণ দৃষ্ট হয়। বোধ হয়, স্ত্রীলোকেরা অর্থোপার্জ্জন করিবে না ভাবিয়া, এই সকল ব্যক্তি স্ত্রীশিক্ষায় যথোচিত মনোযোগ করেন না। বাস্তবিক অনেকেরই এরূপ বোধ আছে যে, অর্থোপার্জ্জন ব্যতীত বিদ্যাশিক্ষার আর কোন উদ্দেশ্য নাই। সুতরাং যে বিদ্যায় অর্থ আনিতে পারে না, তাহা শিক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এইরূপ নানা চিন্তা করিয়া এই সকল লোকেরা বামাগণকে যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যা শিখিতে আদেশ করেন। ইহাতে যে কতদূর অনিষ্ট উৎপাদন হইতেছে তাহা তাহারা একবার ভাবেন না। এইরূপ অল্প বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্তই এক্ষণকার স্ত্রীলোকদিগকে কিঞ্চিৎ উদ্ধত দেখিতে পাওয়া যায়। আপনাদিগকে বিদুষী জ্ঞান করিয়া অজ্ঞ বৃদ্ধাদিগকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে আর ইচ্ছা প্রকাশ করে না। ইহাতে ইহাদিগের কিছুমাত্র দোষ নাই, অবশ্যম্ভাবী-ফলবশীভূতা হইয়া অন্যরূপ আচরণ ইহাদিগের নিকট হইতে আশা করা যাইতে পারে না। আমাদিগের পুরুষদিগেরও অনেকের এরূপ দোষ দৃষ্ট হয়, উভয়েরই আচরণ অল্পবিদ্যাপ্রসূত। সুতরাং যাহাতে এরূপ অল্পবিদ্যার বিস্তৃতি না হয় তাহা সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

সুশিক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের কর্ত্তৃক দেশের কতদূর মঙ্গলসাধন হইতে পারে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। সুপ্রসিদ্ধ নেপোলিয়ন কোন রমণীকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কোন্ উপায় দ্বারা ফ্রান্স রাজ্যের উন্নতি হইবে।" বুদ্ধিমতী রমণী ইহার এই

উত্তর দেন, "মাতাদিগকে সুশিক্ষিতা কর।" বাস্তবিক, "মাতাদিগকে সুশিক্ষিতা কর," এরূপ উক্তিতে পৃথিবীর সমস্ত মঙ্গল লুক্কায়িত আছে। শৈশবাবস্থাতে স্নেহময়ী জননী ব্যতীত আর কোন উত্তম শিক্ষয়িত্রী নাই। শিশু মাতার নিকট হইতে কি না শিখিতে পারে। অতএব মাতা যদি সুশিক্ষিতা না হয়েন, তাহা হইলে সন্তানের কুসংস্কার ভিন্ন জ্ঞানলাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপ বাল্যাবস্থায় সুশিক্ষা না পাওয়াতে পরে নানাবিধ কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। শৈশবাবস্থায় মাতাকর্ত্তৃক সদ্‌গুণ বীজ রোপিত হইলে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ফল প্রদান করিবে। সুতরাং মাতা যদি সুশিক্ষিতা না হয়েন, তাহা হইলে সন্তানকে বাল্যকালের সুবিধা একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। সকল বালক যদি গুণবতী জননী কর্ত্তৃক শিক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের বয়োবৃদ্ধিকালে তাহারা দেশের মুখোজ্জ্বল করিতে পারিবে। শিশুদিগের উপর মাতার যে এতাদৃশ ক্ষমতা আছে, তাহা অনেকে স্বীকার করিবেন না, কিন্তু ইহাঁরা বিদেশীয় রমণীগণের বিষয় পাঠ করিলে আপনাদিগের ভ্রম সহজেই দেখিতে পাইবেন। ইউরোপের মহিলাগণ সুশিক্ষিতা বলিয়া তাঁহাদিগের সন্তানসন্ততিগণ কি চমৎকার গুণশালী হইয়া থাকে। এদেশের অনেকেই এক্ষণে পত্নী কন্যা বা ভগিনীর শিক্ষাকার্য্য মিশনরি-শিক্ষয়িত্রীদিগের হস্তে সমর্পণ করেন। ইহার কারণ এই যে, সূচীকার্য্য ইহাদিগের নিকট হইতে সুচারু-রূপে শিক্ষা হইয়া থাকে। কেবলমাত্র সূচীকার্য্যই যদি স্ত্রীশিক্ষা হয়, তাহা হইলে ইহাঁরা যথার্থই কন্যাদিগকে সুশিক্ষিতা করিতেছেন। বাস্তবিক সূচীকার্য্য হইতে মনের কিছুই উন্নতি হয় না, আদর্শ দেখিয়া অনুকরণ করাতে কতদূর মনোবৃত্তিগুলির চালনা হওয়া সম্ভব, তাহা আমরা সম্যক্ বুঝিতে পারি না। অর্থোপার্জ্জনের পক্ষে কার্পেট্ বুনান প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি প্রয়োজনীয় হইতে পারে। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য যে অর্থোপার্জ্জন তাহা আমরা কোন প্রকারে বুঝি না। সমস্ত দিবস সূচীকার্য্যে

নিযুক্ত না হইয়া আমাদিগের বামাগণ পুস্তক পাঠে যদি অবসর-কাল অতিবাহিত করেন, তাহা হইলে তাঁহারা অনেক উপকার লাভ করিতে পারেন।

মিশনরি হস্তে শিক্ষা প্রাপ্তির আর এক অপকার হইবার সম্ভাবনা। তাঁহারা সাধারণ শিক্ষাবিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ করেন না। খৃষ্টধর্ম্মবিষয়ে তাঁহাদিগের নিতান্ত যত্ন দৃষ্ট হয়। কোমলমতি বা অজ্ঞ বালিকাদিগের পক্ষে খৃষ্টধর্ম্ম শিক্ষা সহজ ব্যাপার নহে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য না বুঝিয়া অন্ধ হইয়া কোন ধর্ম্মের অনুধাবন করিলে যৎপরোনাস্তি অনিষ্ট উৎপন্ন হইতে পারে।

আমাদিগের শিক্ষাপ্রণালীর আর একটী মহৎ দোষ দেখা যায়। আমরা বামাগণের সঙ্গীতশিক্ষা বিষয়ে নিতান্ত অবহেলা করিয়া থাকি। অনেকেই কহিয়া থাকেন যে, বারাঙ্গনা ব্যতীত কাহারও সঙ্গীতশাস্ত্র অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য নহে। এরূপ মত নিতান্ত অযুক্তি-সিদ্ধ। পুরাকালে রাজমহিষীগণও সুচারু-রূপে সঙ্গীত শিক্ষা করিতেন। তখন লোকে সঙ্গীতের প্রতি এতাদৃশ অবহেলা প্রকাশ করিত না। সঙ্গীতে যে কিছুমাত্র দোষ নাই তাহা সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে জন্মাবধি কুসংস্কারবশতঃ আমরা ইহাকে দোষপূর্ণ জ্ঞান করি। দুর্ভাগ্যবশতঃ অধুনা আমাদিগের দেশীয় লোকেরা পুরুষদিগেরই সঙ্গীতশাস্ত্র অধ্যয়ন দোষকর বিবেচনা করেন, সুতরাং এমন স্থলে স্ত্রীলোকদিগের এই বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়া কতদূর দুরূহ তাহা বলা যায় না। ইউরোপ প্রভৃতি সভ্য দেশগুলিতে কি চমৎকার সঙ্গীত চর্চ্চা হইতেছে। তথায় ভদ্র-বংশীয়েরা সঙ্গীত না শিখিলে নিন্দিত হইবার সম্ভাবনা, অধিক কি ভদ্রমহিলাগণ সঙ্গীতবিদ্যায় শিক্ষিতা না হইলে জনসমাজে আহূত হয়েন না। বাস্তবিক সঙ্গীত হইতে নানাবিধ নির্দ্দোষ আমোদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। অধিক কি অনেকস্থলে সঙ্গীত কর্ত্তৃক শোকার্ত্ত জনেরও চিত্ত বিনোদ হইতে পারে।

বস্তুতঃ আমাদিগের সমাজপদ্ধতির দোষে আমাদিগের শিক্ষা-

কার্য্যের অনেক ব্যাঘাত হইতেছে। ভারতবর্ষের বাহিরে সমুদ্রপথে কোন দেশে বিদ্যানুশীলনে গমন করিলে জাতিভ্রষ্ট হইতে হইবে। সুতরাং অন্য দেশীয় লোকদিগের আচার ব্যবহারাদি দর্শন করিয়া যেরূপ জ্ঞানোপার্জ্জন করা যাইতে পারে, তাহা হইতে অনেককেই বিরত হইতে হইতেছে। পুনশ্চ স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের পরস্পর বাক্যালাপ হইতে যে সুন্দর অভিজ্ঞতা উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত হইতে হয়। দেশাচারবশবর্ত্তী হইয়া আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা পতি পুত্র ভিন্ন অপর পুরুষদিগের সহিত কথোপকথন করিতে সমর্থ হয়েন না। অন্তঃপুর মধ্যে চিরজীবন বদ্ধ থাকিয়া বহির্জগতে কি হইতেছে তাহা জানিতে পারেন না; এবং উপহাসভীত হইয়া পতি পুত্রেরও সহিত শাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হন না। এরূপ অবস্থাতে রমণীদিগের দিব্য শিক্ষা হইতেছে। কালাতিপাত করিবার কোন উপায় না দেখিয়া নিদ্রাবশে বা কুরুচিপূর্ণ নাটকাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহারা চিত্ত-বিনোদ করেন। এই সকল মন্দ পুস্তক পাঠ জন্যই এক্ষণকার বামাগণকে অধিক মুখরতর দেখা যায়। ইহা নিতান্ত শোচনীয় বলিতে হইবে যে, যাঁহাদিগের হস্তে আমরা নীতিশিক্ষা আশা করি, তাঁহারা সর্ব্বাংশে স্বকীয় কার্য্যসাধনে অনুপযুক্ত হইতেছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক পুরুষ মহাত্মারা তাঁহাদিগের পত্নী-দিগের হস্তে এইরূপ কুরুচিপূর্ণ পুস্তক দিতে লজ্জিত হয়েন না, সদুপদেশকর্ত্তৃক পত্নীদিগকে সদাচারনিষ্ঠ না করিয়া, ইহাঁরা স্বয়ং তাহাদিগের নৈতিকশিথিলতা উৎসাহিত করিতেছেন। অবশেষে আমরা অনুরোধ করিতেছি যে, যাহাতে বিশুদ্ধ শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হয়, তাহা সুশিক্ষিত সকলেই একমতে কায়মনোবাক্যে কার্য্যে পর্য্যবসিত করুন।

দুর্দ্দৈবে সুযোগ নষ্ট।

সন্তোষ আমাদিগের মধ্যে একটী দুর্লভ পদার্থ। কেহই বোধ হয় নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট নহে। উত্তরোত্তর অবস্থার উন্নতি সাধনে

সকলেই ব্যগ্র। উচ্চআশা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। উদ্দেশ্যশূন্য মনুষ্যজীবন জড় পদার্থের ন্যায়, উন্নতিও নাই অবনতিও নাই। উচ্চআশা ব্যতীত মনুষ্য কখনই উন্নতিসোপানে পদার্পণ করিতে পারে না, এবং উহাই আবার সময়ে তাহাদিগের পতনের কারণ হয়। উচ্চঅভিলাষ বিবেচনাসহকৃত হইলে তদ্দ্বারা আমরা উন্নতিফল লাভ করিয়া থাকি, কিন্তু বিবেচনাশূন্য হইলে, উহা দ্বারা উন্নতি লাভ দূরে থাকুক, অনেক সময়ে অভাবনীয় দুরবস্থায় পতিত হইতে হয়। কর্ম্মক্ষেত্রে সবিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইলেই যে সকলে সমভাবে স্বকীয় উন্নতি সাধনে সমর্থ হয়, এমন নহে। বুদ্ধি, বিবেচনা ও ধৈর্য্যের অভাবে প্রায়ই নিরাশ হইতে হয়। আবার ইহাও কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, অবস্থাগুণে কেহ বা একটী সামান্য সুযোগ পাইয়া আশাতীত ফল লাভ করে, এবং কেহ বা উপযুক্ত সুযোগ সংঘটনেও কিছুই করিতে পারে না।

রামকান্ত নামে একজন দরিদ্র-ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সমস্ত দিন ভিক্ষা করিয়া অতিকষ্টে দিনাতিপাত করিতেন। এদিকে ব্রাহ্মণীর গঞ্জনা, ওদিকে কন্যাভার, এবং চার পাঁচটী শিশু সন্তানের ভরণপোষণ, ব্রাহ্মণ একেবারে ব্যতিব্যস্ত। রামকান্ত স্থিরচিত্তের লোক ছিলেন, এবং ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তিনি এই দারুণ সংসারাশ্রমের ক্লেশ সহ্য করিতেন। এক দিবস তিনি সমস্ত দিন ভিক্ষা করিয়া কিছুই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই এবং রিক্তহস্তে বাটী প্রত্যাগমন ক্লেশকর বিবেচনা করিয়া, নগরের প্রান্তভাগে একটী নির্জন স্থানে বসিয়া উৎকণ্ঠিতহৃদয়ে ক্রন্দন করিতেছিলেন। মহাদেব যিনি স্বয়ং ভিক্ষুক, এই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের কাতরতায় দুঃখিত হইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং রামকান্তকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তোমাকে আর ক্রন্দন করিতে হইবে না, আমি তোমাকে এই বর দিতেছি, যে তোমরা স্ত্রী পুরুষে তিনবার যাহা যাহা ইচ্ছা করিবে তাহাই ফলিত হইবে।" রামকান্ত আহ্লাদে পুলকিত হইয়া সত্বর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ব্রাহ্মণীকে সকল বৃত্তান্ত

ব্যক্ত করিলেন। ব্রাহ্মণী গদগদচিত্তে বলিলেন, "তবে তিনটী বরই আমি প্রার্থনা করিব।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "সে কিরূপে হইতে পারে, তুমি স্ত্রীলোক কি চাহিতে কি চাহিবে, আমি দুইটী প্রার্থনা করিব, তুমি না হয় একটী করিও।"

ব্রাহ্মণী। (সব্যগ্রে) তবে আমারটী আমি চাই?

ব্রাহ্মণ। অত উতলা কেন, আমি সমস্ত দিন নিরাহারী আছি, আহারাদির পর তৃপ্ত হইয়া করা যাইবে।

ব্রাহ্মণী এই কথা শুনিয়া, তাড়াতাড়ি হাঁড়ি হইতে কিঞ্চিৎ পান্তাভাত বাড়িয়া তাহাতে একটু অম্বল দিয়া ব্রাহ্মণকে দিলেন। ব্রাহ্মণ আহার করিতে করিতে বলিলেন, "ব্রাহ্মণি আজ ইলিস মৎস্য কোথায় পাইয়াছিলে, অম্বলটী উত্তম পাক হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণী। (সখেদে) মজুমদারদের বৌ আজ চারখানি ইলিস-মাছ দিয়েছিল, তাই টক দিয়ে রেঁধেছিলেম। ছেলেদের তাই বেঁটে চেঁটে দিলেম, আর দে আর দে বলে, সব তারাই খেয়ে ফেল্লে, তোমার জন্যে তারির একটু কাই রেখেছিলেম। এমন পোড়া কপালও করে এসেছিলেম, বাছাদের পেটভোরে খেতে দিতে পারলেম না; ইচ্ছা হয়, একটা আস্ত ইলিসমাছ কেউ দেয়, ত মনের সাধে ছেলেদের খাওয়াই।

যেমন ইচ্ছা প্রকাশ, অমনি একটী বৃহৎ ইলিস মৎস্য সাম্‌নে উপস্থিত। ইহা দেখিয়া রামকান্ত রাগে বিহ্বল, "আবাগির আক্কেল দেখ দেখি, একটা বর তুই বৃথা নষ্ট করে ফেল্লি।"

ব্রাহ্মণী। (অপ্রস্তুত হইয়া) অ্যাঁ, এইতে আমার বরটী খরচ হয়ে গেল না কি?

ব্রাহ্মণ। (সরোষে) গেল না ত কি হলো। মহাদেবের বাক্য কি কখন মিথ্যা হয়। পেটের জ্বালাতেই গেলেন। যেমন কে তেমনি, ঐ আস্ত মাছটা তোকে গিলিয়ে দিতে পারি ত আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়।

যেমন বলা, অমনি মৎস্যটী ব্রাহ্মণীর মুখে গিয়ে সংলগ্ন।

ব্রাহ্মণী মাছটী ধরিয়া অনেক টানাটানি করিতে লাগিলেন, কিন্তু বহির্গত হওয়া দূরে থাকুক, মাছটী ক্রমেই তাহার মুখের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণী অচেতপ্রায় হইয়া পড়িলেন, ব্রাহ্মণ বিপদ দেখিয়া শশব্যস্তে খানিক টানাটানি করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন, "কি সর্ব্বনাশ, মাছটা এখন বেরুলে যে বাঁচি।" যেমন ইচ্ছা প্রকাশ, অমনি মাছটী নির্গত হইল। এদিকেও মহাদেবের তিনটী বর ফুরাইয়া গেল এবং রামকান্ত পূর্ব্বেও যেমন এখনও তেমন।

স্বাস্থ্য-রক্ষা।

যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া দ্বারা শরীর-পোষণকার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহার মধ্যে পরিপাক ক্রিয়াটী আমরা পূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছি, এক্ষণে রক্ত-সঞ্চালন উহার আর একটী ক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণন করিব।

রক্ত-সঞ্চালন।—হৃদয় কর্ত্তৃক বহুসংখ্যক রক্তবাহিকা-নাড়ী দ্বারা শরীরের সর্ব্বাংশে রক্তের গমনাগমনকে রক্ত-সঞ্চালন কহে। এই সঞ্চালনের প্রধান যন্ত্র হৃদয়, এবং রক্তবাহিনী-নাড়ী সমূহ এই যন্ত্রের শাখা। হৃদয় সূক্ষ্ম মাংসপেশী নির্ম্মিত একটী থলীর ন্যায়, এবং শরীরের সমস্ত রক্তের আধার; এই নিমিত্ত ইহাকে রক্তাশয়ও কহে।

যেমন কলিকাতার অন্তঃপাতি টালা বা বহুবাজারস্থিত "জলের কল" হইতে বাষ্পযন্ত্রের কৌশলে জল তাড়িত হইয়া বহুসংখ্যক নলের মধ্য দিয়া এই সহরের প্রায় সকল স্থানে চালিত হয়, সেইরূপ হৃদয়যন্ত্র হইতে উহার সঙ্কোচন শক্তি কর্ত্তৃক রক্ত প্রবাহিত হইয়া অসংখ্য নাড়ীর মধ্য দিয়া শরীরের সকল স্থানে সঞ্চালিত হয়; কিন্তু রক্ত যেরূপ শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পুষ্টি সাধন করিয়া পুনরায় সেই হৃদয়যন্ত্রে প্রত্যাগমন করে, জল সেরূপ করে না।

হৃদয় বক্ষঃস্থলের প্রায় মধ্যস্থলে স্থিত এবং দুই পার্শ্বে দুই ফুস্‌ফুসে বেষ্টিত। ইহার পশ্চাতে মেরুদণ্ড, সম্মুখে বক্ষাস্থি, এবং নিম্নে বক্ষঃ ও উদর মধ্যচ্ছেদ-মাংসপেশী। ইহা শুণ্ডাকার ত্রিকোণ-বিশিষ্ট পানের ন্যায় আকৃতি, নিম্নদেশ সরু, এবং উচ্চদেশ স্থূল। ইহার পরিমাণ সচরাচর প্রায় ৫ ইঞ্চি (বুরুল) দীর্ঘে, ৩॥ ইঞ্চি প্রস্থে, এবং ২॥ ইঞ্চি স্থূল। ইংরাজি ভাষায় ইহাকে 'হার্ট' কহে। হৃদয় শরীরের মধ্যে একটী প্রধান যন্ত্র, এবং বাহ্যিক আঘাত হইতে যথোচিত রক্ষার নিমিত্ত উহা জলবৎ রসপূর্ণ একটী দৃঢ় স্থলীর মধ্যস্থিত; এই স্থলীকে হৃদয়কোষ কহে। রক্তাশয় চারিটী কোষ্ঠে বিভক্ত। দুইটী গ্রাহক-কোষ্ঠ এবং দুইটী ক্ষেপক-কোষ্ঠ। গ্রাহক-কোষ্ঠ অর্থাৎ যাহাতে ধমনী হইতে অশুদ্ধ রক্ত গৃহীত হয় এবং ক্ষেপক-কোষ্ঠ যাহা হইতে পরিষ্কৃত রক্ত ধমনীতে ক্ষেপিত হয়। দুইটী গ্রাহক-কোষ্ঠের মধ্যে একটী দক্ষিণ-গ্রাহক-কোষ্ঠ এবং অপরটী বাম-গ্রাহক-কোষ্ঠ। এবং সেইরূপ দুইটী ক্ষেপক-কোষ্ঠের মধ্যে একটী দক্ষিণ-ক্ষেপক এবং অপরটী বাম-ক্ষেপক-কোষ্ঠ। হৃদয় দুই ভাগে বিভক্ত, দক্ষিণ ও বাম ভাগ। দক্ষিণ ভাগের উচ্চভাগে একটী গ্রাহক-কোষ্ঠ এবং নিম্ন ভাগে একটী ক্ষেপক-কোষ্ঠ, এবং বামভাগেও সেইরূপ উচ্চে একটী গ্রাহক-কোষ্ঠ এবং নিম্নে একটী ক্ষেপক-কোষ্ঠ। দক্ষিণ-গ্রাহক ও ক্ষেপক-কোষ্ঠের মধ্যে একটী দ্বার আছে এবং ঐরূপ বাম-গ্রাহক ও ক্ষেপক-কোষ্ঠের মধ্যেও একটী দ্বার আছে। এই দ্বারদ্বয় এক প্রকার পাতলা চামড়ার কপাট দ্বারা আবদ্ধ থাকে, ইহা দ্বারা রক্ত এক-বার এক কোষ্ঠ হইতে অন্য কোষ্ঠে গমন করিলে উহা প্রথম কোষ্ঠে প্রত্যাগমন করিতে পারে না। শরীরের সমস্ত অশুদ্ধ রক্ত স্থূল শিরাদ্বয় দ্বারা বাহিত হইয়া দক্ষিণ-গ্রাহক-কোষ্ঠে পতিত হয়। দক্ষিণ-গ্রাহক-কোষ্ঠ হইতে এই অশুদ্ধ রক্ত দক্ষিণ-ক্ষেপক কোষ্ঠে গমন করে। দক্ষিণ-ক্ষেপক-কোষ্ঠ হইতে এই অশুদ্ধ রক্ত ফুস্‌ফুসের ধমনী দ্বারা উভয় ফুস্‌ফুসে গমন করে। সেখানে ফুস্‌ফুস্

মধ্যে বায়ুর সংযোগ দ্বারা ঐ রক্ত পরিষ্কৃত হইয়া ফুস্‌ফুসের চারটী শিরা দ্বারা বাহিত হইয়া বাম-গ্রাহক-কোষ্ঠে গমন করে। এই কোষ্ঠ হইতে ঐ পরিষ্কৃত রক্ত বাম-ক্ষেপক-কোষ্ঠে গমন করে। এবং এই কোষ্ঠ সংলগ্ন স্থূল-ধমনী মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে চালিত হয়।

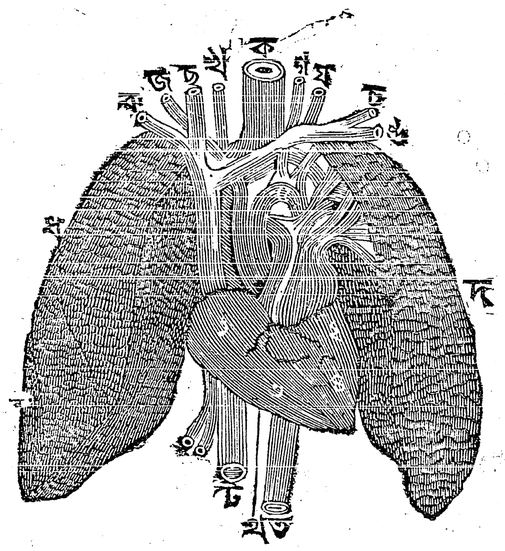

থ, হৃদয়। ১, ২, দক্ষিণ ও বাম গ্রাহক-কোষ্ঠ। ৩, ৪, দক্ষিণ ও বাম ক্ষেপক-কোষ্ঠ। দ, ধ, বাম ও দক্ষিণ ফুস্‌ফুস্‌। ৫, ত, বৃহৎ মূল ধমনী। ট, বৃহৎ নিম্ন শিরা। ঝ, ঙ, বাহুদ্বয়ের শিরা। চ, জ, বাহুদ্বয়ের ধমনী। ছ, য, মস্তকের শিরা। খ, গ, মস্তকের ধমনী। ক, শ্বাসনালী।

রক্তবাহিনী নাড়ী দুই প্রকার, ধমনী ও শিরা। যে সকল নাড়ী হৃদয় হইতে পরিষ্কৃত রক্ত বহন করে, তাহাদিগকে ধমনী কহে, এবং যে সকল নাড়ী দ্বারা অশুদ্ধ ক্লেদপূর্ণ রক্ত শরীর হইতে হৃদয়ে চালিত হয় তাহাদিগকে শিরা কহে। যে বৃহৎ-ধমনীর উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে, উহা সকল ধমনীর মূল। এই বৃহদ্ধমনী হৃদয়ের বাম-ক্ষেপক-কোষ্ঠ হইতে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠিয়া বক্রভাগে বামদিকে নত হইয়া শরীরের নিম্নদেশে গমন করে। মেরুদণ্ডের উপর দিয়া গমন করিয়া উহা কটিদেশে দুই শাখায় বিভক্ত হয়। এই শাখাদ্বয় পুনরায় বহু সংখ্যক শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া ক্রমে অতি সূক্ষ্ম আকারে পদদ্বয়ের অঙ্গুলীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত গমন করে। বৃহদ্ধমনীর বক্র মূলভাগ হইতে কতকগুলি শাখা ঊর্দ্ধে গমন করিয়া মস্তক গলা ও হস্তদ্বয়ে বিস্তৃত হয়। মেরুদণ্ডোপরিস্থিত মধ্যভাগ হইতে কতকগুলি শাখা বহির্গত হইয়া যকৃত, পাকস্থলী, প্লীহা, মূত্রাশয় প্রভৃতি যন্ত্র সমূহে প্রবেশ করে। ধমনীর রক্ত উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ, পুষ্টিকর এবং অম্লজান বায়ু সংযুক্ত। ধমনীর প্রত্যেক শাখা অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রশাখায় শেষ হয় এবং এই সকল প্রশাখা এত সূক্ষ্ম যে উহা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহাদিগকে কৈশিকা কহে। এই কৈশিকা দ্বারা রক্তের পুষ্টিকর ভাগ শোষিত হইলে, উহার অবশিষ্ট পরিত্যক্ত অংশ শিরা নাড়ীতে প্রবেশ করে। শিরা সকল প্রথমে এই কৈশিকার ন্যায় অসংখ্য সূক্ষ্ম শাখায় এই কৈশিকা হইতে উৎপত্তি হইয়া ক্রমে স্থূল আকারে হৃদয়ের দিকে গমন করে। পরে এই সকল শাখা দুইটী প্রধান শিরায় মিলিত হয়। এই দুই শিরার একটী উচ্চ-স্থূলঅর্থাৎ মস্তক হস্তদ্বয় ও বক্ষঃস্থল হইতে, এবং অপরটী নিম্ন-স্থূল অর্থাৎ উদর পাদাদি নিম্ন প্রদেশ হইতে রক্ত গ্রহণ করিয়া হৃদয়ের দক্ষিণ-গ্রাহক-কোষ্ঠে প্রবেশ করে। শিরার রক্ত অশুদ্ধ এবং উহাতে অঙ্গারক বায়ুর আধিক্য দেখা যায়। ইহা ঈষৎ নীলবর্ণ। শিরা ও ধমনী প্রায় পাশাপাশি হইয়া শরীরের সকল স্থানে ব্যাপ্ত আছে, কিন্তু উভয়ের রক্তের স্রোত ঠিক বিপরীত। ধমনীর রক্ত হৃদয় হইতে অন্য দিকে গমন করে এবং শিরার রক্ত অন্য দিক হইতে হৃদয়ের দিকে গমন করে। হৃদয় মাংসপেশীনির্ম্মিত, এই জন্য উহা সঙ্কীর্ণ ও বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে। দক্ষিণ-গ্রাহক-কোষ্ঠ শরীর হইতে এবং বাম-গ্রাহক-কোষ্ঠ ফুস্‌ফুস্‌ হইতে রক্ত গ্রহণ সময়ে বিস্তীর্ণ হয়। ইহারা রক্তে পূর্ণ হইলে পরে সঙ্কীর্ণ হইয়া

ঐ রক্ত-ক্ষেপক-কোষ্ঠে ত্যাগ করে। আবার ক্ষেপক-কোষ্ঠদ্বয় পূর্ণ হইয়া বিস্তীর্ণ হইলে পশ্চাৎ সঙ্কীর্ণ হইয়া, দক্ষিণ-ক্ষেপক-কোষ্ঠ ফুস্‌ফুস-শিরাতে এবং বাম ক্ষেপক-কোষ্ঠ বৃহদ্ধমনীতে রক্ত ত্যাগ করে। এইরূপ পুনঃ সঙ্কোচন ও বিস্তীর্ণ দ্বারা হৃদয় সর্ব্বদা চঞ্চল থাকে এবং রক্তের স্রোত তরঙ্গের ন্যায় ধমনীর মধ্যে প্রবাহিত হয়। বক্ষঃস্থলের বাম ভাগের এক স্থানে যাহা ধুকধুক্ করে, সে এই হৃদয়ের আঘাত মাত্র। ধমনীস্পর্শ দ্বারা অন্তর্বাহিত স্রোতের যে তরঙ্গ আঘাত আমরা বোধ করি তাহাকেই সাধারণতঃ নাড়ী কহে। চিকিৎসকেরা হস্তস্থিত ধমনীর নাড়ী স্পর্শ করিয়া রোগ নির্ণয় করেন। রক্ত সঞ্চালনের বিশেষ দ্রুততা হইলেই হৃদয়েরও চাঞ্চল্য বৃদ্ধি হয়। শ্রম, রাগ, বয়স, রোগাদি নানা অবস্থা ভেদই এই চাঞ্চল্যের কারণ। নবশিশুদিগের নাড়ী অতিশয় বেগবতী, এক মিনিটে প্রায় ১৩০ হইতে ১৪০ বার পড়ে। বয়ঃবৃদ্ধির সহিত এই বেগ ক্রমে কমিয়া আইসে। আমাদিগের পূর্ণ যৌবনাবস্থাতে এক মিনিটে ৭০ হইতে ৮০ বার পড়ে। বৃদ্ধাবস্থায় উহা আরও কম হইয়া ৫০ হইতে ৬৫ বার পড়ে। স্ত্রীলোকের নাড়ী পুরুষের অপেক্ষা দ্রুতগামী, পুরুষের যদি এক মিনিটে ৭০ হয়, তবে সমবয়স্ক স্ত্রীলোকের নাড়ী ৮০ হইবে। উপবেশন বা শয়ন অপেক্ষা দণ্ডায়মান অবস্থায় নাড়ীর বেগ অধিক হয়। ডাক্তারেরা রোগ নির্ণয়কালীন ঘড়ী দেখিয়া নাড়ীর এই বেগ নির্ণয় করেন।

বামাগণের রচনা।

কবি অভাবে কবিতা।

গজগামিনী, মৃগনয়নী, মনোমোহিনী, ললনা।
এলোকেশে, হীনবেশে, করিতেছে, ভাবনা॥
যেন পদ্মিনী, হলে যামিনী, বিনে দ্যুমণি, মলিনা।
কুমুদিনী, বিষাদিনী, অস্তগতে চন্দ্রমা॥

যেন বসন্ত, হইলে অন্ত, বিনে সে কান্ত, মেদিনী।
নিশিযোগে, দুখভোগে, চক্রবাক-রঞ্জিনী॥
সমীরাহত, পাদপযত, ধরণীগত, যে কালে।
তদাশ্রিতা, লতা যথা, শীর্ণকায় অকালে॥
যূথরহিতা, কুররী যথা, বিষাদযুতা, বিরহে।
ক্ষণপ্রভা, হীনপ্রভা, যদি মেঘে না রহে॥
সেরূপ বালা, হয়ে আকুলা, বিরহজ্বালা, ভোগিছে।
একাকিনী, বসি ধনি, শোকানলে দহিছে॥
বসি বিরলে, বিরহে জ্বলে, নয়নজলে, ভাসিছে।
পদনখে, ধরা লিখে, কি জানি কি ভাবিছে॥
একা বসিয়ে, দুখে দহিয়ে, হাপিয়ে২, কাঁদিছে।
গালে হাত, প্রাণনাথ, চিন্তা সদা করিছে।
অঙ্গভূষণ, ক'রে মোচন, জীর্ণ বসন, পরেছে;
চন্দ্রহার, স্বর্ণহার, বাজু বালা খুলেছে॥
লালের ঘটা, অরুণ ছটা, সিঁদুর ফোটা, মুচেছে।
রুক্ষকেশ, রুক্ষবেশ, শাখাপাটি ভেঙ্গেছে॥
নাহি এখন, বেশ ভূষণ, সব ভূষণ ত্যজেছে।
নাথ বিনে, সাদা মনে, কালো দাগ লেগেছে॥
হল হতাশ, মন উদাস, প্রলয় শ্বাস, বহিছে।
বিদ্যুচ্ছটা, হাস্য ঘটা, অন্তর্ধান হয়েছে॥
ছিল সংসার, সুখের সার, দুখের ভার, এখনে।
বিনোদিনী, অনাথিনী, সুখ পাবে কেমনে?
শোক-জড়িতা, পতি-রহিতা, সতী লুণ্ঠিতা, ভূসনে।
জানুগতা, ক'রে মাতা, কাঁদে নত বদনে॥
দিয়ে যৌবন, মন জীবন, রামা যে ধন কিনিল।
সর্ব্বনাশী, মৃত্যু আসি, সে রতন হরিল॥
যেন ফণিনী, হারায়ে মণি, তেমনি ধনী হইল;
সদা মন, উচাটন, বিধি বাদ সাধিল॥

মানস সরে, বিহার ক'রে, মরাল বরে উড়িল।
যেন শ্যাম, গুণধাম, ব্রজধাম ত্যজিল।
যতন ক'রে, সুখাম্বু ভরে, মানস সরে রাখিল।
শোকতাপে, অশ্রুরূপে, উথলিয়ে পড়িল॥
সুখ, সলিল, সব গলিল, হৃদি-কমল শুকাল॥
বিলাসিনী, বিনোদিনী, দুখানলে দহিল॥
ছিল দিনেশ, সম প্রাণেশ, হৃদয়াকাশ, শোভিয়ে।
অস্ত দেখি, কমলাখি, সঙ্কোচিত কাঁদিয়ে॥
কবি বিহনে, কবিতা ধনে, কেবা যতনে রাখিবে।
বিরহিণী, বিষাদিনী, কেন বা না কাঁদিবে॥
মনোমোহিনী, কবিতা-ধনী, উন্মাদিনী, হইবে।
অনাথিনী, উন্মাদিনী, পথে পথে ফিরিবে॥

শ্রীললিতাসুন্দরী দেবী,
তারপাশা।

সংবাদসার।

রাজকুমার বম্বাই হইতে ৩০শে নবেম্বর সিংহলে উপস্থিত হয়েন। সেখানে প্রায় এক সপ্তাহকাল কলম্ব, কান্তি প্রভৃতি নগর পরিদর্শন করিয়া ৮ই ডিসেম্বরে সিরাপিস জাহাজে আরোহণ করিয়া টিউটিকোরিনে যাত্রা করেন। এক্ষণে তিনি মাদ্রাজ দর্শন করিতেছেন। এবং ২৩শে ডিসেম্বর কলিকাতায় আগমন করিবেন। তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত সহর সুশোভিত হইতেছে।

স্বর্গীয় বাবু প্যারীচরণ সরকারের স্থলে মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু দিগম্বর মিত্র মহাশয় চোরবাগান বালিকা বিদ্যালয়ের পেট্রন্ হইয়াছেন।

বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ সংস্কার।

আমরা পূর্ব্বে আমাদিগের শারীরিক নৈতিক ও মানসিক শিক্ষা সম্বন্ধে অশেষবিধ দোষ দেখাইয়াছি। এক্ষণে আমরা হিন্দুসমাজের ভিন্ন ভিন্ন আচার ব্যবহার ও পারিবারিক সম্বন্ধ বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বর্ণবিভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বিষয় পর্য্যায়ক্রমে বলিব।

আমাদিগের দেশে হিন্দুজাতির মধ্যে বর্ণবিভাগ বহুকাল হইতে শুনা যাইতেছে, যথা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। মনুসংহিতাতে ইহার সবিশেষ উল্লেখ থাকাতে ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, মনুর সময়ের পূর্ব্বেও হিন্দুজাতি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এবং আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রায় একমত হইয়া বলিয়াছেন যে, খৃষ্টশতাব্দীর অন্ততঃ নয় শত বৎসর পূর্ব্বে মনু জীবিত ছিলেন। সুতরাং বর্ণবিভাগ অন্যূন ২,৮০০ বৎসর ব্যাপিয়া ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। অনেকেই মনে করিতে পারেন, যে মঙ্গলকরী না হইলে এ প্রথা এতাবৎকাল জীবিত থাকিত না। অনিষ্টকারী অনেক বিষয়ও বহুকালস্থায়ী হইতে পারে ইহা সবিশেষ অবগত হওয়াতে আমরা এই প্রথার দীর্ঘজীবনে কিছুমাত্র চমৎকৃত হই না। বাস্তবিক এই প্রথা যে অনেক প্রকারে অমঙ্গলকারী তাহা আমরা পশ্চাতে প্রমাণ করিতেছি।

এই বর্ণ-বিভাগের আদি কি, তাহা কোন প্রকারে স্থির করা যায় না। এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকে এইরূপ উল্লেখ হইয়াছে;—"মানবজাতির বৃদ্ধির নিমিত্ত ব্রহ্মা নিজ মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণকে সৃজন করিলেন। ইহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা বেদাধ্যয়ন করিবে; ক্ষত্রিয়েরা রক্ষা করিবে; বৈশ্যেরা অর্থোপার্জ্জন করিবে এবং শূদ্রেরা কায়িক-পরি-

শ্রম করিবে।” এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, মনুর মতে ব্রাহ্মণ-প্রভৃতির সৃষ্টি ব্রহ্মা হইতে হইয়াছে। অন্য মতাবলম্বী পণ্ডিতেরা বলেন যে, ব্রাহ্মণেরা প্রথমে ভারতবর্ষে আগমন করে, তৎপরে ক্ষত্রিয়গণ আসিয়া উত্তরপশ্চিম অংশ অধিকার করে, এবং শূদ্র ও বৈশ্যেরা পূর্ব্বাবধি ভারতবর্ষে বাস করিত। তৃতীয় মতাবলম্বী লোকেরা বলেন যে, পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কেবলমাত্র অসভ্যজাতি বাস করিত, তৎপরে শূদ্রেরা আসিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া রাজ্য আরম্ভ করে। ক্রমে ক্রমে বৈশ্য ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ আসিল, এবং শূদ্রদিগকে পরাভূত করিয়া বৈশ্যেরা শূদ্রদিগের উপরিশ্রেণীতে ভুক্ত হইল; এইরূপে ক্ষত্রিয়েরা বৈশ্যদিগের উপর এবং ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়দিগের উপর পরিগণিত হইল। মনুর মত আমরা কোন প্রকারে অবলম্বন করিতে পারি না। অপর দুই মতেরও যথেষ্ট পোষকতা করা যায় না। কারণ কোনস্থলেই এরূপ দৃষ্ট হয় না যে, ব্রাহ্মণপ্রভৃতিরা অপর দেশ হইতে আগমন করিয়া ভারতবর্ষ জয় করিয়াছে। আর ইহাও বিচিত্র বলিতে হইবে যে, ব্রাহ্মণেরা আদিমবাসী-দিগকে পরাজিত করিয়া আপনারা কেবলমাত্র ধর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত থাকিবেন। যাঁহারা এককালে রণবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে অল্পকাল পরেই যুদ্ধব্যাপার একবারে পরিত্যাগ করি-বেন, ইহা কোন অংশে প্রতীতি হয় না।

বর্ণবিভাগ সম্বন্ধে আমরা এইরূপ অনুমান করি। সকল সমাজের প্রথম অবস্থাতে অভাব অত্যল্পমাত্রেই দেখা যায়। সুতরাং সেই অবস্থাতে সকল লোকে স্বজন বন্ধু লইয়া একত্রে বাস করে। এবং এক পরিবারের আভ্যন্তরিক জনসমূহ মিলিত হইয়া সেই পরিবারের অভাব মোচনার্থ যত্নবান থাকে। সুতরাং তাৎকালিক প্রয়ো-জনীয় প্রাপ্তির নিমিত্ত তাহাদিগকে কার্য্য বিভাগ করিতে হয় না। কিন্তু কিছুকাল অতীত হইলে অভাবের বৃদ্ধি হইতে থাকে; এবং এই অবস্থাতে প্রতি পরিবার প্রত্যেকের আবশ্যকীয় পদার্থ উৎ-

পাদন করিতে না পারাতে অনেকগুলি পরিবার একত্র হইয়া কার্য্যবিভাগ আরম্ভ করে। কেহ বা কৃষিকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। অপর কেহ দেশ রক্ষণে নিযুক্ত থাকিল। এইরূপ কার্য্যের বিভিন্নতা হইয়া কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি হইল। তৎপরে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও ভয় প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, ইহা বুঝিয়া যাহা-দিগের হস্তে ঈশ্বরোপাসনার ভার ছিল, তাহাদিগকে ভক্তি ও ভয় করিতে লাগিল। এইরূপে ব্রাহ্মণবর্ণের প্রাধান্য স্বীকৃত হইল। পুনশ্চ যোদ্ধাদিগের নিকট অবনত থাকা কর্ত্তব্য বোধ করিয়া ক্ষত্রিয়দিগকে (অর্থাৎ যোদ্ধাদিগকে) ব্রাহ্মণদিগের নিম্নে পরিগণিত করিল। কৃষিকর্ম্ম না হইলে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে, সুতরাং কৃষিকর্ম্ম নিতান্ত প্রয়োজনীয় এইরূপ চিন্তা করিয়া বৈশ্যদিগকে ক্ষত্রিয়দিগের পরে গণিতে হইল। অবশেষে শূদ্র-দিগের হস্তে ইতর কার্য্যগুলি ন্যস্ত হওয়াতে তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হইল। পূর্ব্বে কার্য্যসুবিধার নিমিত্ত এই চারি শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে এই বিভাগের ফল এরূপ হইয়া উঠিল যে, ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের পুত্র বৈশ্য, ও শূদ্রের পুত্র শূদ্র বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিল।

কার্য্যসৌকর্য্যার্থে যাঁহারা এরূপ বিভাগ করিয়াছিলেন, তাঁহা-দিগের কিছুমাত্র দোষ ছিল না। বস্তুতঃ সকল সমাজের প্রথম অবস্থাতে এরূপ বিভাগ না করিলে সমাজের উন্নতি সাধন হইতে পারে না। এই নিমিত্ত গ্রীস্ প্রভৃতি সকল দেশের প্রথম অব-স্থাতে এরূপ বিভাগ দেখা যায়। কিন্তু তাহারা আমাদিগের ন্যায় এ বিভাগ চিরকালের নিমিত্ত করেন নাই। আমরা বর্ত্ত-মান উপকার দেখিয়া ইহাকে সর্ব্বকালিক করিয়াছি। ইহা প্রথমে সমাজের উন্নতি বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল, কিন্তু পশ্চাতে সমাজকে সীমাবদ্ধ করিয়া নানাবিধ অনিষ্টোৎপাদন করিয়াছে।

যাহা হউক বর্ণবিভাগ যে প্রকারে উত্থিত হউক না কেন, হিন্দু-জাতিরা মনুকে অবলম্বন করিয়া এতাবৎ কাল চলিয়া আসিতেছে।

অর্থাৎ যথার্থ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরা মনুর মতই অবলম্বন করিয়াছেন। সুতরাং মনুতে যে প্রকার আচার ব্যবহার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাই হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। মনুসংহিতাতে ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বেশ্বর করিয়াছে, এবং তাঁহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশীল করিয়াছে। অপর বর্ণেরা তাঁহাদিগের দাসস্বরূপ। সুতরাং তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। এইরূপ সর্ব্বক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া তাঁহারা যে কেবল আপনাদিগের উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? বাস্তবিক ব্রাহ্মণেরা যে আপনাদিগের মঙ্গলসাধনে এতাবৎকাল যত্নবান ছিলেন, তাহা আধুনিক আচার পদ্ধতি দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়।

শূদ্রদিগের বিষয় যে সকল নিয়ম মনুতে লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে সকল লোকেরই মনে ক্রোধ ও ঘৃণার উদ্রেক হইতে পারে। শূদ্রেরা ব্রাহ্মণদিগের দাস হইবার নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এইরূপ উক্তি মনুতে দেখিতে পাওয়া যায়। শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ প্রভৃতিদিগের ন্যায় বেদাধ্যয়ন করিতে পারিবে না। অধিক কি, তাহারা কোন প্রকার লেখাপড়া করিবার উপযুক্ত নহে। শূদ্রের স্বাধীনতা থাকিবে না। কারণ মনুর অষ্টম অধ্যায়ের ৪১৩ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে যে, "শূদ্র ক্রীত হউক বা নাই হউক তাহাকে ব্রাহ্মণের ইতর কার্য্য পর্য্যন্ত করিতে হইবে, কারণ ব্রহ্মা তাহাকে ব্রাহ্মণের দাস করিয়া সৃজন করিয়াছেন।" শূদ্র ধনোপার্জ্জন করিতে পারিবে না। মনুর দশম অধ্যায়ের ২২৯ শ্লোকে দৃষ্ট হয়, "ক্ষমতাসত্বেও শূদ্র কোন অংশে ধন উপার্জ্জন করিতে পারিবে না, কারণ শূদ্র ধন উপার্জ্জন করিলে ব্রাহ্মণের মনে ক্লেশ হইতে পারে।" এবং অষ্টম অধ্যায়ের ৪১৭ শ্লোক মতে, ব্রাহ্মণ শূদ্রের অমতে ধন সম্পত্তি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারে। পুনশ্চ, দোষ করিলে শূদ্রদিগের অধিক পরিমাণ শাস্তি হইবে। ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় কি বৈশ্য, শূদ্রের প্রতি অন্যায় আচরণ করিলে কিছুই হইবে না। কিন্তু শূদ্র যদি উপরিশ্রেণীস্থ কোন ব্যক্তির

নিকট দোষী হয়, তাহা হইলে তাহার আর ক্লেশের পরিসীমা নাই, তাহাকে নানাপ্রকার কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। অধিক কি, ধর্ম্মকর্ম্ম বা পরকাল বিষয়েও ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদিগের উপর অত্যাচার করিতে পারিবেন। শূদ্রেরা যদি বেদাধ্যায়ন শ্রবণ করে, তাহা হইলে তাহাদিগের কর্ণবিবর গলিত মমের দ্বারা বদ্ধ করিয়া দিবে; তাহারা যদি বেদ অধ্যয়ন করে, তাহা হইলে তাহাদিগের গলদেশে তপ্ত তৈল ঢালিয়া দিবে; এবং শূদ্র যদি বেদ কণ্ঠস্থ করে, তাহা হইলে তাহাকে প্রাণে বিনাশ করিবে। শূদ্র ব্রাহ্মণের নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবে না। মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৮০ ও ৮১ শ্লোকদ্বয়ে এইরূপ লিখিত আছে,—"কোন ব্রাহ্মণ যেন শূদ্রকে পরামর্শ না দেন। পরকালের নিমিত্ত কিম্বা পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত উপদেশ দিলে ব্রাহ্মণকে শূদ্রের সহিত অসমবর্ত্ত নামক নরকে গমন করিতে হইবে।" শূদ্রদিগের অবস্থা বিষয়ে অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই, এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাহাদিগকে ইতরপ্রাণীদিগের ন্যায় বিবেচনা করা হইত।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, অপরদেশেও এরূপ বিভাগ দৃষ্ট হয়। কিন্তু সে পদ-বিভাগ আমাদিগের ন্যায় বর্ণ-বিভাগ নহে। বর্ণবিভাগ এবং পদবিভাগ সমান জ্ঞান করা যাইতে পারে না, উভয়ের বিশেষ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। অপরদেশে এক পদের লোক অপর পদে আরোহণ করিতে পারে, কিন্তু আমাদিগের দেশে শূদ্র কখন বৈশ্য হইবে না, বা বৈশ্য ব্রাহ্মণ হইবে না। অন্যদেশে নিম্নপদস্থ লোক উপরিপদস্থ লোকের সহিত বিবাহ করিতে পারে কিন্তু আমাদিগের দেশে শূদ্র ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করিতে সক্ষম নহে। ইউরোপ প্রভৃতি দেশে তন্তুবায় উচ্চপদে আরোহণ করিতে পারে। নিম্নপদস্থ লোক ধনসম্পত্তি বা অন্য কোন গুণ কর্ত্তৃক উচ্চপদস্থ হইতে পারে। সত্য বটে, এরূপ হওয়া সচরাচর ঘটিয়া থাকে না এবং অনায়াসে সাধ্যও নহে।

কিন্তু এরূপ হইবার কোন প্রতিবন্ধক নাই। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে এরূপ কখনই হইতে পারে না। শূদ্র আজন্মকাল শূদ্রই থাকিবে, তাহার পদোন্নতির সম্ভাবনা নাই। সুতরাং উপর্য্যুক্ত হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, আমাদিগের দেশের বর্ণভেদ ও ইউরোপ প্রভৃতি দেশের পদবিভাগ, এ উভয়ের কোন অংশে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না।

এক্ষণে দেখা যাউক হিন্দু-জাতির উন্নতি বিষয়ে বর্ণ-বিভাগ হইতে কিরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে। ওয়ার্ড নামে একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, চীনদেশীয় জুতা যেরূপ তত্রত্য লোকদিগকে খঞ্জ করিতেছে, তদ্রূপ বর্ণ-বিভাগ হিন্দুদিগকে একেবারে খঞ্জ করিয়াছে। এ কথার যাথার্থ্য বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। আমাদিগের প্রথম অবস্থাতে আমরা প্রায় অসভ্য ছিলাম। সুতরাং তখন এরূপ বিভাগ করাতে কিছুই অনিষ্টোৎপত্তি হয় নাই। কিন্তু যখন আমরা সমাজবদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতে লাগিলাম, তখন এরূপ বিভাগ উপকার না করিয়া অপকার করিতে লাগিল, কারণ ইহা কর্ত্তৃক আমরা রুদ্ধপথ হইলাম। প্রতি বর্ণ অপরের উন্নতি বিষয়ে প্রতিবন্ধক স্বরূপ হওয়াতে সাধারণের উন্নতি হইল না। বিদ্বান ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা সর্ব্ব প্রধান হইবে ইহাতে কেহই আপত্তি করিবে না। কিন্তু ইহাদিগের পুত্র পৌত্রাদি মূর্খ হইয়াও যে সর্ব্বোচ্চপদস্থিত হইবে, ইহা নিতান্ত অযুক্তিকর। বাস্তবিক এরূপ করিলে সকল বিষয়ে বিশৃঙ্খলা হইবার সম্ভাবনা। তাহা হইলে পশ্চাতে সদ্‌গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে উচ্চপদ হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইবে। পুনশ্চ একবর্ণে সকল সম্মান বদ্ধ থাকিলে অপর বর্ণের লোকদিগের উন্নতির সম্ভাবনা থাকিবে না। তাহারা এরূপ মনে করিতে পারে যে, যখন দেখা যাইতেছে যে সৎকর্ম্ম করিলেও আমরা আহূত হইব না, তখন সৎকর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই। বাস্তবিক মানবজাতি পুরস্কারের বা প্রশংসার বশবর্ত্তী হইয়া মহানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহারা যখন দেখিবে যে তাহাদিগের সৎক্রিয়াগুলি তাহাদিগকে জনসমাজে আহূত করিতে পারিতেছে না, তখন তাহারা সৎকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবেন। এইরূপ অবস্থায় সমাজের উন্নতি আশা করা যাইতে পারে না। অপরদিকে ইহাও দেখা যাইতেছে যে, সর্ব্বোচ্চ বর্ণ অন্য বর্ণদিগকে আপনাদিগের সমান হইতে পারিবে না জানিয়া স্ব স্ব উন্নতি বিষয়ে শিথিল-প্রযত্ন হইবে। নিম্নবর্ণেরা তাঁহাদিগের বিষয় সবিশেষ অবগত হইতে পারিবে না বলিয়া তাঁহারা যথেচ্ছাচারী হইতে পারেন। তাঁহারা প্রবঞ্চনা কর্ত্তৃক আপনাদিগের সম্মান রক্ষা করিতে পারিবেন। অধিক কি, যে সকল সদ্গুণের নিমিত্ত তাঁহারা প্রথমে উচ্চপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, তাহাও তাহাদিগের নিকট দুষ্প্রাপ্য হইবে। শাস্ত্রে লিখিয়াছে যে ব্রাহ্মণব্যতীত কেহই বেদাধ্যয়ন করিবে না। যখন এ নিয়ম সৃষ্টি হয় তখন বেদ ভিন্ন অন্য কোন পুস্তক ছিল না। সুতরাং এই নিয়ম কর্ত্তৃক এইরূপ বুঝিতে হইবে যে ব্রাহ্মণব্যতীত কেহই অধ্যয়ন করিতে পারিবে না। ইহাতে বিদ্যাশিক্ষা সাধারণের পক্ষে দুরূহ হইল। এবং এক বর্ণ ভিন্ন অপর বর্ণদিগকে অজ্ঞ হইতে হইবে। বস্তুতঃ এরূপে অল্প সংখ্যার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া সম্যক জ্ঞানানুশীলন ও জ্ঞানবৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিল না। এজন্য আমাদিগের বিদ্যা বিষয়ে পূর্ব্বে যে অবস্থা ছিল এক্ষণেও প্রায় সেইরূপই আছে, উন্নতি না হইয়া বরং অধোগতি হইয়াছে।

পুনরায় ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করিবে এরূপ নিয়ম হওয়াতে অপর সকল বর্ণেরা হীনবীর্য্য হইল। এজন্য ভারতবর্ষের অধিকাংশ ব্যক্তিকে যুদ্ধ বিষয়ে অপটু দেখা যায়। পুরাকাল হইতে অন্য শ্রেণীস্থ লোকেরা যুদ্ধ হইতে নিবারিত হওয়াতে তাহারা যুদ্ধ বিষয়ে কখন মনোযোগ করেন না। রক্ষার নিমিত্ত অন্যের উপর নির্ভর করিয়া আত্মরক্ষা করিতে একেবারে অসমর্থ হইলেন। এবং এরূপ প্রথা হইতে যে কেবল এক্ষণকার অমঙ্গল সাধন হইতেছে এমন নহে, পুরাকালেও

ইহার ফল ভুগিতে হইয়াছে। তখনও অতি অল্প সংখ্যা লোক মধ্যে যুদ্ধ করিবার নিয়ম প্রচলিত থাকাতে সেনাদল অধিক পরিমাণে হইবার সম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং ভারতবর্ষের বাহির হইতে শত্রুদল আসিয়া ইহার নানাপ্রদেশ অনায়াসে আক্রমণ করিতে পারিত। বাস্তবিক অনেকবার এরূপ শত্রু আসিয়া ভারতবর্ষে উপদ্রব করিয়াছে। এজন্য ভারতবর্ষ চিরকাল পরাধীন হইয়া আসিতেছে।

এদিকে শিল্পকার্য্যপ্রভৃতি ব্যবসাগুলি কতকগুলি ব্যক্তির মধ্যে বদ্ধ থাকাতে এ সকলেরও উন্নতি সম্যকরূপে হইতে পারিত না। পিতা যেরূপ শিল্পকার্য্য করিতেন পুত্রকেও অবিকল সেইরূপ করিতে হইবে, সুতরাং নূতন নূতন আবিষ্কার হইবার সম্ভাবনা অত্যল্পমাত্রই রহিল। এজন্য ভারতবর্ষের শিল্পকার্য্য পূর্ব্বেও যেরূপ ছিল এক্ষণেও সেইরূপ আছে, কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। এইরূপে বিশেষ বিশেষ বিদ্যা বিশেষ বিশেষ শ্রেণীস্থ লোকের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হওয়াতে সে সকল বিদ্যার ইচ্ছানুরূপ সমুন্নতি হইল না। যদি ইউরোপের ন্যায় আমাদিগের দেশে সকল শাস্ত্র বা সকল বিদ্যা সকলের অধিকার করিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে আমাদিগের অধোগতি হইত না। বৈদ্যশাস্ত্র কতকগুলি লোকের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া ইহার যথেষ্ট বৃদ্ধি হইল না। ইহা একভাবে চিরকাল চলিয়া আসিতেছে বরং পূর্ব্বের অপেক্ষা মন্দ হইয়াছে। বৈদ্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এক্ষণে কয় জন বৈদ্য দেখা যায়? প্রায় নাই বলিলেই হয়। পূর্ব্বে চিত্র, খোদকারি প্রভৃতি বিদ্যায় অতি অল্প লোকই নিযুক্ত থাকিতে পারিত। এজন্য অস্মদ্দেশে ঐ সকল বিদ্যা অতি জঘন্য অবস্থায় রহিয়াছে। যদি ঐ সকল বিদ্যা সকলেরই ক্ষমতাধীন হইত, তাহা হইলে উহাদিগের কি চমৎকার উন্নতি হইত। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, বিশেষ বিদ্যা বিশেষ শ্রেণীর লোক মধ্যে বদ্ধ থাকাতে কোন বিষয়ে প্রকৃত উন্নতি সাধন হয় নাই। সুখের বিষয় এই যে, এক্ষণে সকল লোকে সকল কর্ম্মে

প্রবৃত্ত হইতেছে, এবং পূর্ব্বের ন্যায় বর্ণবিভাগ থাকিয়াও পুরাকালের অহিতকারী নিয়মাবলী ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যদিও শূদ্রেরা এক্ষণে ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, তথাপি তাহারা শেষোক্তদিগের অনেক ক্ষমতা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে কাহারও পাঠ করিবার ক্ষমতা ছিল না, এক্ষণে সকলেরই তাহা আছে। এক্ষণে যাহার যে কর্ম্ম স্বেচ্ছা সে তাহাতেই প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহাতে কোন বাধা দৃষ্ট হয় না। এইরূপ সংস্কার পূর্ব্ব হইতে থাকিলে দেশের অনেক মঙ্গল সাধন হইত সন্দেহ নাই।

সরোজিনী।

সরসী-সম্ভবে সতি অয়ি সরোজিনি,
সুকুমারি! ধর শোভা ভুবন-মোহিনী!
ঊষা তব সহচরী,
গত যবে বিভাবরী,
কুসুম-কুন্তলা বামা—অরুণের দূতী
সাদরে জাগান তোমা প্রদানি বিধুতি।

বৈতালিক কুহুকণ্ঠ গায় পঞ্চস্বরে
সমীরণ শান্তভাবে দুলায় চামরে।
রূপসী সরসী ধনী
ভাবিয়া অতুল মণি
হৃদয়ে ধরয়ে তব মোহন মুরতি;
অমনি ঢলিয়া পড় ভাবে রসবতি!

নিশির-শিশির-বিন্দু মুকুতার পাঁতি,
ললাট-রঞ্জিত-রাগে সমুজ্জ্বল-ভাতি!
কাঞ্চন-মণ্ডিত দেহ
লাবণ্য-রতন-গেহ
মৃদুলতা বলয়িত বরাঙ্গ তোমার;
তব ধামে বিরিঞ্চির বাসনা অপার!

ভেদিয়া বারিধি-গর্ভ দেব অংশুমালী,
রতন মুকুট শিরে মহা বীর্য্যশালী,
কনক - উদয়াচলে
দেখা দিলে জীবদলে,
অমনি হরষে মেল আঁখি - শতদল;
কলাপে কলাপী যথা নীরদ-বিহ্বল।

নিভৃতে সৌরভ - ধন হরিয়া পবন
ঘোষয়ে মহিমা তব পুরিয়া কানন;
তেয়াগি কেশর - কুঞ্জ
ঝাঁকে ঝাঁকে অলি-পুঞ্জ
আসব - আশয়ে ধায় তব মঞ্জু বনে
গুঞ্জরে মধুর গাথা মঞ্জুল শ্রবণে।

নবীনা প্রবীণা কত সরসীর ভিতে
সমাগত ঊষাকালে সানন্দিত চিতে,
নিরখিয়া তুয়া শোভা
যোগিজন মনোলোভা
বেণীর ভূষণ করে কেহ বা যতনে,
অর্পয়ে কেহ বা তোমা অভীষ্ট-চরণে।

কি বিচিত্র কমলিনি, যে ভানুর করে
সন্তাপিত বসুমতী - প্রাণিপুঞ্জ - নরে,
সরস কোমল দলে
আমোদিয়া পরিমলে,
ধর তুমি সে রবিরে পরম প্রণয়ে,
না জানি সে প্রজাপতি কেমন মিলয়ে?

নিশি-বিরহিণি অয়ি সরোজ-ভাবিনি,
রথাঙ্গ - ললনা সম তুমিও দুখিনী?
অপাঙ্গ টালিয়া কেন
ঘন ঘন হের হেন
বিয়োগিনী কুমুদিনী মুদিত - নয়নী;
জান না সম্মুখে তব করাল রজনি?

ভানুমতী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দিল্লীশ্বর আকবর যখন বঙ্গদেশ অধিকার করিতে মানস করেন, তখন মানসিংহকে সেনাপতিপদে বরণ করিয়া বহুসংখ্যক সৈন্য-সমভিব্যাহারে তথায় প্রেরণ করেন। এই মানসিংহ জয়পুরের রাজা; অম্বর নগরী তাঁহার রাজধানী। ঐ নগরী একটী উচ্চ পর্ব্বত-শিখরে অবস্থিত। পর্ব্বতের মূলদেশে মহাদেবের একটী মন্দির আছে। এইরূপ কথিত আছে যে, বিদেশে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া পূজাসহকারে বিশ্বেশ্বরকে প্রসন্ন করিলে তিনি মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন।

মানসিংহ বঙ্গদেশে আগমন করিবার পূর্ব্বে উদয়পুরের রাজপুত্র কুমার অযোধ্যাসিংহ জয়পুরে উপস্থিত ছিলেন। অযোধ্যাসিংহের বয়ঃক্রম প্রায় দ্বাবিংশতি বৎসর। ইঁহার পিতা আপন অমাত্য রামদয়ালের কন্যার সহিত ইহাঁর বিবাহের সম্বন্ধ করেন। কিন্তু কুমার দুর্ভাগ্যবশতঃ লোকপরম্পরায় শ্রবণ করেন যে অমাত্যের কন্যা অতি কুৎসিতা। এ জন্য তিনি এই বিবাহে নিতান্ত অসম্মতি প্রকাশ করেন। মহারাজ স্বকীয় তনয়ে এ প্রকার অবাধ্যতার চিহ্ন দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া কুমারকে ডাকাইয়া আনিলেন। কুমার যখন পিতৃসন্নিধানে আসিলেন তখন তথায় রামদয়াল ও অপরাপর পারিষদগণ উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ কহিলেন—

"অযোধ্যাসিংহ, আমি কি জন্য তোমাকে আসিতে বলিয়াছিলাম তাহা কি জান?"

যুবরাজ কহিলেন, "আজ্ঞে না।"

তাঁহার পিতা বলিলেন, "আমি পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছিলাম যে মন্ত্রী রামদয়ালের কন্যার সহিত তোমার বিবাহ সংকল্প করিয়াছি। এক্ষণে অন্যান্য সমুদয় আয়োজন প্রস্তুত হইয়াছে। অদ্য হইতে অষ্টম দিবসে তোমার বিবাহ হইবে।"

কুমার বিষণ্ণ বদনে উত্তর করিলেন, "মহারাজ এ দাসের কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে।"

"কি?"

"এ বিষয়ে অধীনকে ক্ষমা করিতে হইবে।" উদয়পুরপতির নয়নদ্বয় ক্রোধানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, বলিলেন, "তুমি কি বিবাহ করিতে অসম্মত?" কুমার কহিলেন, "মহারাজ যদি অনুমতি করেন তাহা হইলে আমি অবিবাহিতাবস্থায় আরও কয়েক বৎসর যাপন করিতে মানস করি।"

রাজা আর থাকিতে পারিলেন না। অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া পুত্রকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন—

"কুমার এ রাজ্যে দুই রাজা এককালে আধিপত্য করিতে পারে না। আমার আজ্ঞা তুমি উল্লঙ্ঘন করিয়াছ; অতএব তুমি, উদয়পুর শীঘ্র পরিত্যাগ কর।"

অযোধ্যাসিংহ দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু তিনিও ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন। পিতাকে কোন উত্তর না করিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কেবল একমাত্র ভৃত্যসহকারে সেই দিবসেই উদয়পুর রাজ্য পরিত্যাগ করেন।

রামদয়াল ক্ষুণ্ণমনে নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং গৃহস্থ সকলকেই রাজাজ্ঞা অবগত করাইলেন। তাঁহার কন্যা ভানুমতীর সহিত অযোধ্যাসিংহের পরিণয় সম্বন্ধ হয়। অযোধ্যাসিংহ লোক মুখে শুনিয়াছিলেন যে ভানুমতী শ্রীহীনা। কিন্তু বস্তুতঃ ভানুমতী

রাজস্থান-দুর্ল্লভ-সুন্দরী। উমাকান্ত নামে রাজকুমারের এক জন পরম সুহৃৎ এই ভানুমতীকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত উন্মত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু যখন শুনিলেন যে অযোধ্যাসিংহের সহিত ভানুমতীর বিবাহ কথা হইতেছে, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজকুমারের মন ভঙ্গ করিবার আশয়ে, তিনি সদত ভানুমতীর নিন্দা তাঁহার নিকট করিতেন। ভানুমতী অতিশয় কুৎসিতা এবং রাজকুমারের যোগ্যপাত্রী নহে, এইরূপ প্রকাশ করিতেন, সুতরাং কুমার বন্ধুর বাক্য বিশ্বাস করিয়া ভানুমতীকে বিবাহ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন।

যে দিবস কুমার অযোধ্যাসিংহ উদয়পুর পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন, তৎপরদিন প্রাতঃকালে অমাত্যতনয়াও নিরুদ্দেশ হয়েন। মন্ত্রীবর ক্ষিপ্তের ন্যায় ইতস্ততঃ চতুর্দ্দিকে চরপ্রেরণ করতঃ তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইল। সুপ্রভা নামে কন্যার এক পরিচারিকা ছিল। তাহাকেও তৎকালে রামদয়ালের ভবনে দৃষ্ট হইল না; অনুমান হইল যে সেও মন্ত্রীকন্যা সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজা মানসিংহ এক দিবস কতিপয় অনুচর লইয়া অম্বরের সন্নিকটস্থ প্রদেশে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন যে এক বৃক্ষতলে একটী যুবক বিশ্রাম করিতেছেন। পার্শ্বে এক সজ্জীভূত অশ্ব বদ্ধ রহিয়াছে। সম্মুখে একটী প্রশস্ত খাত। সহসা খাতের অপর পারে এক বরাহ দৃষ্ট হইল। মহারাজ ব্যাকুল হইয়া শরসন্ধান করিতে না করিতেই বরাহটী দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। রাজা একান্ত অধৈর্য্য হইলেন। খাতটী জলে পরিপূর্ণ এবং তাহার স্রোতও এত বেগবতী, যে সন্তরণ করিয়া অপর পারে যাওয়া সুকঠিন। রাজা নিরাশ্বাস হইয়া তাঁহার প্রিয়সহচর নাথমল্লকে কহিলেন, "ঐ বরাহকে যে বধ করিয়া আমার নিকট আনিতে পারিবে, সে যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাই পূর্ণ

করিব।" অনুচরবর্গের মধ্যে কেহই ঐ খাত পার হইতে সাহস করিল না। অকস্মাৎ বৃক্ষতলস্থিত সেই যুবা গাত্রোত্থান করিয়া অশ্বের বন্ধন-মোচন করতঃ তৎপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া এক লম্ফে খাত উল্লঙ্ঘন করিলেন ও নিমেষমধ্যে দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন।

সকলেই বিস্মিত হইয়া একদৃষ্টে সেই দিক অবলোকন করিতে লাগিলেন। এই দুর্গম জনহীন গহন-কাননে একাকী এ যুবা কে বিশ্রাম করিতেছিলেন, এই চিন্তায় সকলে মগ্ন হইলেন। আকৃতি দেখিলেই স্পষ্ট অনুভব হয় যে, ইনি একজন সামান্য ব্যক্তি নহেন। এক্ষণে তাঁহার এইরূপ পৌরুষ দেখিয়া কতই তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হইল। মহারাজ কহিলেন—

"সখে নাথমল্ল, কিছু অনুমান করিতে পার?" নাথমল্ল উত্তর করিলেন, "মহারাজ ইনি যে এক জন বীরপুরুষ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

মহারাজ হাসিয়া উঠিলেন। "তুমিই যথার্থ বিজ্ঞ; যে সশস্ত্র অশ্বারোহী ব্যক্তি এ প্রকারে অবলীলাক্রমে ও নির্ভয়ে এরূপ কার্য্য করিতে পারে সে যে একজন বীরপুরুষ, ইহা অনুমান করা সামান্য বিজ্ঞতার কর্ম্ম নহে!"

সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল। রাজরহস্যে নির্জীব পদার্থেরাও হাস্য করে,—পারিষদবর্গ কোন ছার। নাথমল্ল কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া নীরব হইলেন।

মানসিংহ পুনরায় কহিলেন, "উষ্ণীষ দেখিয়া বোধ হয়, এ ব্যক্তি জয়পুরবাসী নহে। অথচ রাজস্থান ইহাঁর জন্মভূমি সন্দেহ নাই।"

অনুচরগণের মধ্যে এক জন বলিল, "মহারাজ বোধ হয় ইনি উদয়পুরনিবাসী।"

মহারাজ। "কি প্রকারে জানিলে?"

"আপনার স্মরণ আছে কি না বলিতে পারি না; কিন্তু সে বৎসর যখন মহারাজ উদয়পুররাজ্যে গমন করেন, আমার বোধ হয় তথাকার রাজ-দরবারে আমি ইহাঁকে দেখিয়াছিলাম।"

নাথমল্ল হাসিয়া কহিলেন, "মহারাজ ইনি আমা অপেক্ষা বিজ্ঞ।

মানসিংহ। "কি প্রকার?"

নাথমল্ল। "উদয়পুরের সহিত আমাদের এক্ষণে যে প্রকার সদ্ভাব, তাহাতে তথাকার বীরপুরুষের জয়পুরে আসা বিলক্ষণ সম্ভব বটে!"

দিল্লীশ্বর মুসুলমান-সম্রাটের সহিত আর্য্যবংশীয় জয়পুররাজ-ভগিনীর পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হওয়াই এই অসদ্ভাবের কারণ।

সহসা তটিনীর অপর পার হইতে মর্ম্মভেদী একটী আর্ত্তনাদ উঠিল। শব্দটি মৃদুল; কিন্তু স্পষ্টই অনুভব হইল যে অতি দূরে যেন কোন ব্যক্তি প্রাণ ভয়ে যথাসাধ্য চীৎকার করিতেছে; কেবল দূর প্রযুক্তই মৃদু বোধ হইতেছে।

মহারাজের মুখ কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইল; কহিলেন, "বোধ হয় হতভাগ্য যুবা বন্যবরাহ অথবা অন্যকোন দুর্দ্দান্ত পশু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে।"

ভরতসিংহ নামে একজন পারিষদ উত্তর করিল, "মহারাজ যুবকটী যে প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অসমসাহসী দৃষ্ট হইল, সে যে কাপুরুষের ন্যায় প্রাণভয়ে রোদন করিবে ইহা সম্ভব বোধ হয় না।"

সকলেই ইত্যাকার নানাবিধ আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে ক্ষণকাল পরে খাতের অপর পারে সেই পুরুষটী পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু একাকী নহেন। তিনি পদব্রজে এক মৃত বরাহ লতাকল্পিতরজ্জু দ্বারা আকর্ষণ করিতেছেন, ও তাঁহার অশ্বপৃষ্ঠে অপর দুইটী যুবা আরোহণ করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে আসিতেছেন।

পার হইবার অন্য উপায় না দেখিয়া যুবা উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "তোমারা যদি সকলে একত্র হইয়া সত্বরে এক উড়ূপ নির্ম্মাণ করিতে পার, তাহা হইলেই আমরা অপর পারে যাইতে পারি।"

মানসিংহ তৎক্ষণাৎ তাহাই প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা করিলেন, এবং অনতিকাল পরেই অশ্ব ও বরাহ সমেত তিন জনেই নদীর এ পারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ক্রমশঃ—

স্বাস্থ্য-রক্ষা।

নিশ্বাস। ফুস্‌ফুস এই অত্যাবশ্যক শারীরিক পোষণ কার্য্যের যন্ত্র। ফুস্‌ফুস বক্ষোগহ্বর মধ্যে হৃদয়ের উভয় পার্শ্বে স্থিত। ফুস্‌ফুস দুইটী, একটী দক্ষিণ ও অপরটী বাম ফুস্‌ফুস। দক্ষিণটী বাম হইতে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। মুখের নিম্নভাগ হইতে শ্বাস-নালী গলার মধ্যদিয়া বক্ষঃস্থলে গমন করে। এই নালী কণ্ঠে উপস্থিত হইয়া দুই শাখায় বিভক্ত হয়, একটী দক্ষিণ ও অপরটী বাম ফুস্‌ফুসে গমন করিয়া বহুসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়। এই শ্বাসনালী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাস্থির গ্রন্থি দ্বারা নির্ম্মিত। শ্বাসনালীর এই সকল অসংখ্য সূক্ষ্ম শাখা প্রশাখার অগ্রভাগে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ুকোষ সংযোগে ফুসফুস গঠিত। নিশ্বাস দ্বারা বায়ু শ্বাসনালী দিয়া উভয় ফুসফুসে যইয়া বায়ুকোষ সকল পূর্ণ করে। এই বায়ুকোষের মধ্যে ও বাহিরে অসংখ্য কৈশিকা ব্যাপ্ত আছে, এবং এই সকল কৈশিকার গাত্রভেদ করিয়া বায়ুর অম্লযান ভাগ রক্তের সহিত মিলিত হয় এবং রক্তস্থ দূষিত পদার্থ সকল প্রশ্বাস দ্বারা বহির্গত হয়। এই অম্লযানবায়ুর সংলগ্নে রক্ত উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ হয়। অশুদ্ধ রক্তের সহিত যে অঙ্গারকবায়ু সংযুক্ত থাকে তাহা প্রশ্বাস দ্বারা নির্গত হইয়া যায়। নিশ্বাস কার্য্য বক্ষঃস্থ মাংসপেশীর সঙ্কোচন শক্তির দ্বারা নির্বাহিত হয়। শ্বাসদ্বারা বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করিলে বক্ষঃস্থ পাঁজর সকল স্ফীত হয় এবং প্রশ্বাস কালীন বায়ু নির্গত হইলে ঐ সকল পাঁজর নত হয়।

শরীরের দূষিত পদার্থ যে কেবল ফুস্‌ফুস দ্বারাই বিনির্গত হয় এমন নহে। মল মূত্র ঘর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারাও উহা বহিষ্কৃত হয়। পাক-যন্ত্র, প্লীহা, ক্লোম ও অন্ত্র হইতে অশুদ্ধ রক্ত একেবারে হৃদয়ে না যাইয়া ঐ সকল যন্ত্রের শিরার সহিত মিলিত একটী স্থূল শিরা দ্বারা যকৃতে প্রবেশ করে। এই রক্ত হইতে যকৃত দ্বারা পিত্ত উৎপত্তি হইয়া পাক কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। যকৃতের কোনরূপ বিকৃত অবস্থা

হইলে এই পিত্তভাগ রক্ত হইতে পৃথক না হইয়া উহা রক্তেই থাকিয়া যায়, এবং ঐ রক্ত সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইলে গাত্র হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে।

ফুসফুসের কোন রূপ বিকৃত অবস্থা হইলেই কাশরোগ উপস্থিত হয়, এবং তজ্জনিত কফশ্লেষ্মাদি যাহা নির্গত হয় তাহা এই ফুসফুসের অভ্যন্তর হইতেই উৎপন্ন হয়।

রক্তমন্থন।—শরীরের ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের দ্বারা রক্তের নানা প্রকার ব্যবহার্য্য বা পরিত্যক্ত ভাগকে স্বতন্ত্র করাকে রক্তমন্থন কহে। যথা যকৃত রক্তকে মন্থন করিয়া উহার পিত্তভাগ বাহির করিয়া লয়। পাকযন্ত্র ক্লোমযন্ত্র প্রভৃতি, পাকরস ক্লোমরসাদি উৎপন্ন করে। মূত্রাশয় ও চর্ম্ম, মূত্র ও ঘর্ম্মের দ্বারা রক্তের কতকগুলি পরিত্যক্ত অংশ শরীর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। যে কোন রস আমাদের শরীরের মধ্যে উৎপন্ন হয়, তাহা রক্তমন্থন হইয়া প্রস্তুত হয়।

অতএব পূর্ব্বোল্লিখিত পাঁচ প্রকার কার্য্যের মধ্যে, পোষণ কার্য্যটী এই কয়েক প্রকার ক্রিয়ার দ্বারা সম্পাদিত হয়, যথা, পরি-পাক, রক্তসঞ্চালন, নিশ্বাস, রক্তমন্থন, ইত্যাদি।

পুনরুৎপত্তি।—সন্তানোৎপত্তি ক্রিয়াটী জীবমাত্রেতেই দৃষ্ট হয়। জীবের প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে কতকগুলি স্ত্রীলিঙ্গ এবং কতক-গুলি পুংলিঙ্গবিশিষ্ট এবং এই উভয় স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগে সন্তানোৎপত্তি হয়। তরুণ বয়স্কা বালিকাদিগের পক্ষে এ প্রবন্ধটী কঠিন হইবার সম্ভাবনায় ইহা পরিত্যাগ করা হইল।

চলন।—এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিবার নাম চলন। এই ক্রিয়াটী কেবল জীবের আছে, উদ্ভিজ্জের নাই। মাংসপেশী ও অস্থি দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। মাংসপেশীর সঙ্কো-চন ও বিস্তীর্ণ শক্তি দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদিত হয়। হস্ত ও পদ সঞ্চালনের নিমিত্ত দুই প্রকার মাংসপেশী উহাতে সংলগ্ন আছে। একদিকের মাংসপেশী সঙ্কোচন হইলে অপরদিকের

মাংসপেশী শিথিল হইয়া থাকে। পদের পশ্চাতের মাংসপেশী সংকোচন হইলে পা গুটাইয়া যায় ও সম্মুখের মাংসপেশী শিথিল হয়, এবং পরক্ষণেই সম্মুখের মাংসপেশী সঙ্কোচন হইয়া পা সোজা হয় ও পশ্চাতের মাংসপেশী শিথিল হয়। এইরূপ পুনঃ সংকোচন ও বিস্তীর্ণ দ্বারা চলন কার্য্য সম্পাদিত হয়।

চেতন।—মস্তকের মধ্যে মস্তিষ্ক নামে যে পদার্থ আছে, তাহা হইতেই মনের সকল প্রকার প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়। মস্তিষ্কের সহিত সংশ্লিষ্ট স্নায়ুরজ্জু এবং উহার শাখা স্নায়ু সকল এই চেতনের যন্ত্র। এই সকল শাখা শরীরের ইন্দ্রিয় সকলের সহিত মস্তিষ্কের সংযোগ রাখিয়া, ইন্দ্রিয়দিগের বোধ জন্মাইয়া দেয়।

ইন্দ্রিয় পাঁচ প্রকার, যথা, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শ।

দর্শনেন্দ্রিয়।—চক্ষু আমাদিগের দেহের মধ্যে অতি আশ্চর্য্য যন্ত্র। ইহার ন্যায় অপূর্ব্ব দৃষ্টি যন্ত্র আমাদিগের বুদ্ধিতে কল্পনা করাও অসাধ্য। পণ্ডিতেরা এই চক্ষুকে আদর্শ করিয়া দুরবীক্ষণ অণুবীক্ষণাদি দৃষ্টিযন্ত্র সকল নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মস্তিষ্ক হইতে দর্শনস্নায়ু উত্থিত হয় এবং দ্বিভাগ হইয়া চক্ষুদ্বয়ে প্রবেশ করে। এই স্নায়ু চক্ষের পশ্চাৎভাগে বিস্তৃত আছে। কোন বস্তুর ছায়া চক্ষের তারার মধ্য দিয়া এই বিস্তৃত স্নায়ুতে পতিত হইলেই আমাদিগের দর্শনজ্ঞান জন্মে এবং আমরা সেই বস্তুকে দেখিতে পাই।

শ্রবণেন্দ্রিয়।—কর্ণ এই ইন্দ্রিয়ের যন্ত্র। কর্ণ তিন অংশে বিভক্ত হইয়াছে, বহিরংশ, মধ্যাংশ এবং অন্তরাংশ। কর্ণের ছিদ্র শম্বুকের ন্যায় ঘূর্ণিত। শব্দের দ্বারা বায়ু আন্দোলিত হইয়া কর্ণের বহিঃদ্বারে প্রবেশ করিয়া অতি বেগে মধ্যদেশে গমন করে। তথায় একখানি অতি পাতলা চামড়ায় ধাক্কা দিয়া ঐ বায়ু ক্রমে অন্তরাংশে প্রবেশ করে। এই স্থানে মস্তিষ্ক হইতে নির্গত শব্দবাহক স্নায়ুর সহিত এই বায়ুর সংযোগে শব্দ জ্ঞান হয়।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়।—ইহার যন্ত্র নাসিকা। নাসিকারন্ধ্রের ত্বক অতি কোমল এবং রসযুক্ত। মস্তিষ্ক হইতে ঘ্রাণস্নায়ু উৎপত্তি হইয়া এই ত্বকে বিস্তৃত আছে। গন্ধদ্রব্য হইতে অতি সূক্ষ্ম অলক্ষ্য পরমাণু নির্গত হইয়া বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে। এই পরমাণু ঘ্রাণস্নায়ুর সহিত সংলগ্ন হইলেই ঘ্রাণ বোধের উৎপত্তি হয়।

আস্বাদন।—ইহার যন্ত্র জিহ্বা। খাদ্যদ্রব্যের স্বাদবোধশক্তি মুখের অন্যান্য অংশেও কিয়ৎপরিমাণে আছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু জিহ্বাতেই বিশেষরূপে আছে। জিহ্বার উপরিভাগে যে সকল সূক্ষ্ম লোম সদৃশ ঈষৎ উচ্চ পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যে স্বাদস্নায়ুর শাখা আসিয়া জিহ্বায় বিস্তৃত আছে এবং ইহারাই আস্বাদনবোধ জন্মাইয়া দেয়।

স্পর্শেন্দ্রিয়।—শরীরের অচ্ছাদন যে চর্ম্ম বা ত্বক তাহার সকল স্থানেই স্নায়ুরজ্জুর শাখা প্রশাখা স্নায়ু অতি সূক্ষ্ম হইয়া বিস্তৃত আছে এবং ইহারাই স্পর্শবোধ জন্মাইয়া দেয়। ত্বক কঠিন বা স্থূল হইলে স্পর্শ বোধ কম হয়, যথা পায়ের গোড়ালি। স্পর্শ বোধ সর্ব্বাঙ্গেই হয় কিন্তু অঙ্গুলির অগ্রভাগে বিশেষরূপে বোধ হয়।

বাক্য।—নানা স্বরে নানা প্রকার শব্দ উচ্চারণ করিয়া মনের ভাব অবিকল ব্যক্ত করাকে বাক্য কহে। ইহা আমাদিগের শরীরের একটী আশ্চর্য্য ক্রিয়া। ইহা কেবল মনুষ্যেরই আছে, আর অন্য কোন প্রাণীর নাই। ইতর প্রাণীরা বিশেষ বিশেষ শব্দের দ্বারা মনের ভাব কথঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতে পারে বটে, কিন্তু মনুষ্যের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে না। শ্বাসনালীর সর্ব্বোপরি অংশকেই বাগ্‌যন্ত্র কহে, কিন্তু ইহা স্বতন্ত্র গঠনবিশিষ্ট। ইহা তিন প্রকার উপাস্থি দ্বারা এবং কতকগুলি রজ্জুর ন্যায় মাংসপেশী দ্বারা গঠিত। উপাস্থিগুলি কেহ ফলকাকৃতি, কেহ ধুস্তুরপুষ্পাকৃতি এবং কেহ অঙ্গুরীয়াকৃতি। ইহার মধ্যে ফলকাকৃতি উপাস্থি বৃহৎ এবং গলদেশে উহার উচ্চভাগ দৃষ্ট হয়। ইহাকেই ভাষা কথায় টুঁটী বলে। বয়োবৃদ্ধির সহিত এই উচ্চভাগের বৃদ্ধি হয়

এবং তদনুসারে স্বরেরও তারতম্য হইয়া থাকে। বাল্যকালে এই উচ্চভাগ অল্প প্রকাশিত থাকাতে স্বর কোমল থাকে। স্ত্রী কি পুরুষ উভয়েরই বয়ঃপ্রাপ্তির পর এই উচ্চভাগ অধিক প্রকাশিত হয় এবং স্বরও কর্কশ হইয়া পড়ে। ধূম্রুরপুষ্পাকৃতি উপাস্থিদ্বয়ের সহিত স্বররজ্জু সকল সংযোজিত আছে এবং ঐ সকল রজ্জু শিথিল বা টান হইলে স্বরের তারতম্য হয়। এই সকল রজ্জুর অবস্থানুযায়ী স্বর হয় বটে, কিন্তু শব্দ বিশেষের উচ্চারণার্থে ওষ্ঠ, দন্ত, জিহ্বা ও তালু প্রভৃতির সাহায্য আবশ্যক করে। যথা স্বরবর্ণ প্রায় কণ্ঠস্থিত বাগ্‌যন্ত্রের দ্বারা অনায়াসে উচ্চারিত হয় কিন্তু হলবর্ণের উচ্চারণ তদ্রূপ নহে। ইহারা ওষ্ঠ, তালু, দন্ত ও জিহ্বার সাহায্য ভিন্ন উচ্চারিত হয় না।

বামাগণের রচনা।

শরৎশশী দর্শনে সখীর প্রতি।

সখিরে—অই যে শরৎশশী, শোভে নীল গগনে;
বিমল শীতল কর, বরষয়ে সুধাকর,
মোহিত মানবগণ হেরি যাহা নয়নে;
কেন রে দহিছে দেহ কব লো তা কেমনে।

সখিরে—অই বিধুবিলাসিনী, গরবিণী কুমুদিনী,
সরসীর কোলে বসি, হাসে ঘন সে রূপসী,
হেরিছে পতিরে সতী প্রফুল্লিত আননে,
তবে কেন এ পরাণ দহে বিষ-দহনে?

সখিরে—আমার ত হৃদাকাশে, সে পূর্ণশশী প্রকাশে,
মম আঁখি কুমুদিনী, তবে কেন বিষাদিনী,
কেন লো প্রাণস্বজনি, দুঃখ নীরে ভাসিছে,
প্রিয়-মুখ-শশী-হৃদে কেন মলা পশিছে?

সখিরে—ঐ শঠ অঞ্জনাপতি, ধীরি ধীরি বহিছে,
পরিমলে পূর্ণ সতী, বিকসিতা কুমুদ্বতী,
লম্পট সে সদাগতি, দেখ বাস হরিছে,
ক্রোধে অভিমানে সতী, থর থর কাঁপিছে।

সখিরে—ঐ দেখ নিশিগন্ধা, সমীরণে দুলিল।
শরতে সুধাংশু শোভে, সরোজিনী মনঃক্ষোভে,
মম হৃদিপদ্মসম, ওই দেখ মুদিল,
নিশার তুষার-ছলে, আঁখিজলে ভাসিল।

সখিরে—মম সখী সরোজিনী, আজু হ'তে হইবে।
আমার কাতরমতি, নিরখিয়া তারাপতি,
তেমতি তুমিও যদি, প্রাতে পতি হেরিবে।
কিন্তু অভাগিনী পতি, আর নাহি পাইবে।

সখিরে—আমার সে সুখরবি, অস্তমিত চারু ছবি,
হৃদয় উদয়াচলে, আর কিরে উদিবে?
বিতরি সোহাগকর, উদিবে না দিনকর,
সে বিরহে হৃদিপদ্ম চির মুদি রহিবে।

কলিকাতা। হিন্দু মহিলা।

সংবাদ সার।

যুবরাজের কলিকাতা দর্শন।

২৩শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ৪॥ টার সময় 'সিরাপিস' জাহাজে আরোহণ করিয়া যুবরাজ কলিকাতায় উপস্থিত হয়েন। প্রিন্সেপ ঘাটের নিকটবর্ত্তি সমস্ত জাহাজ নানাবিধ বর্ণের পতাকায় সুশোভিত হইয়াছিল। এদিকে রাস্তা ঘাট, ও ময়দান জনতায় পরিপূর্ণ। কি ধনী কি দরিদ্র, প্রায় সকলেই যুবরাজের দর্শনকামনায় সমাগত হইয়াছিল। ঘাটের মধ্যে দেশীয় রাজগণ এবং সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও বাঙ্গালী মহাশয়েরা যুবরাজের অভ্যর্থনার নিমিত্ত উপস্থিত ছিলেন। যুবরাজের জাহাজ ঘাটের নিকটবর্ত্তী হইলে অন্যান্য জাহাজ হইতে তোপধ্বনি হইতে লাগিল, এবং তিনি ঘাটে পদার্পণ করিলে দুর্গ হইতে ২১ টী তোপ হইল। যুবরাজ ঘাটের উপর আসিলে নগরের সভ্যগণ একখানি অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলেন এবং যুবরাজও তাহার প্রত্যুত্তর দিলেন।

তৎপরে গবর্ণরজেনেরল বাহাদুর দেশীয় রাজগণ এবং কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ইংরাজদিগকে লইয়া যুবরাজের নিকট তাঁহাদের পরিচয় প্রদান করিলেন। পরে কতকগুলি পদাতিক ও আরোহি সৈন্য দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া যুবরাজ গবর্ণরজেনেরলের সহিত এক খানি চারঘোড়ার গাড়ীতে গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদাভিমুখে আগমন করিলেন। পরদিবস প্রাতঃকাল হইতে যুবরাজ কতকগুলি দেশীয় রাজগণের সহিত আলাপ করেন। পরে সন্ধ্যার সময় শকটারোহণে নগরের আলোক সৌন্দর্য্য দেখিতে বহির্গত হয়েন। অপরাহ্ণের পূর্ব্ব হইতেই নগর কোলাহলময় হইল। জনতার এক শেষ হইয়াছিল। যুবরাজের গন্তব্য পথের উভয়পার্শ্ব এবং নিকটবর্ত্তী অট্টালিকা সমূহ অত্যুজ্জ্বল দীপমালায় ও বাষ্পালোকে অতি সুন্দররূপে আলোকিত হইয়াছিল। যুবরাজ সদলে বড়লাট সাহেবের সহিত বহির্গত হইয়া চৌরঙ্গী, ধর্ম্মতলা, ওয়েলিংটনরাস্তা, কালেজরাস্তা, এবং কলুটোলারাস্তা হইয়া চিতপুর রাস্তাদিয়া লালদিগির পূর্ব্বদিকের রাস্তা হইয়া, প্রায় রাত ৮ টার সময় পুনর্ব্বার গবর্ণমেণ্ট হাউসে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। এই আলোকময় রাস্তার চার অংশে চারটী অতি বৃহদাকার গেট নির্ম্মাণ হইয়াছিল এবং এই গেট সকল আলোকমালায় মণ্ডিত হওয়াতে অতি অপূর্ব্বশোভা হইয়াছিল। ঐ রাত্রে যুবরাজ কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ইংরাজের সহিত মিলিত হইয়া গবর্ণমেণ্ট হাউসে একত্রে আহার করিয়াছিলেন। পরদিবস শনিবার প্রাতঃকালে যুবরাজ সেণ্ট্ পলের গির্জ্জায় ভজনা করিয়া বৈকালে গঙ্গার ধারের রাস্তাদিয়া শকট আরোহণে বারাকপুরের বাগানে যাত্রা করেন।

রবিবার সেইখানেই থাকেন, পরদিবস প্রাতে জলপথে চন্দননগর দর্শন করিয়া কলিকাতার চাঁদপালের ঘাটে উত্তীর্ণ হয়েন। সেই দিবস অবশিষ্ট রাজগণের সহিত আলাপ করেন এবং জেনেরল-হাঁসপাতল দর্শন করিয়া নূতন পশুবাটিকা হইয়া অপরাহ্ণে ছোটলাটসাহেবের বেল্‌ভিডিয়র বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন। পরে রাত্রিকালে গবর্ণমেণ্ট হাউসে ইংরাজদিগের নাচ দর্শন করেন। মঙ্গলবার যুবরাজ কতিপয় দেশীয় রাজগণের বাসস্থানে যাইয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বৈকালে লেভি করিয়া সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও বাঙ্গালিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরে রাত্রি দশটার সময় বাঙ্গালিদিগের বেলগেছিয়া বাগানের অভ্যর্থনায় গমন করেন। এদিবসেও বড় সাহেবের বাটী হইতে বাগানপর্য্যন্ত প্রায় ২ ক্রোশ

রাস্তা উত্তমরূপে আলোকিত হইয়াছিল এবং জনতায় রাস্তা এবং পার্শ্বস্থ বাটী সমূহ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। উদ্যানটী অতি পরিপাটী রূপে সুশোভিত এবং আলোকিত করা হইয়াছিল। সভার নিমিত্ত একটী বৃহৎ অপূর্ব্বশোভিত আটচালা নির্ম্মিত হইয়াছিল। যুবরাজ আসন পরিগ্রহ করিলে পণ্ডিতবর ভরতশিরোমণি মহাশয় অর্ঘ্য প্রদান এবং বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, পরে সমবেতযন্ত্রবাদ্য, ন্যাস, সেতার বাদ্য, ইত্যাদি, কণ্ঠসঙ্গীত, বাইনাচ প্রভৃতি হইয়াছিল। মতিঝিলের উপর ময়ূরপঙ্ক্ষীর গান অতি সুন্দর হইয়াছিল। পরে ভোজ ও নানাপ্রকার আতোষবাজি হইয়া সভা ভঙ্গ হইল। পরদিবস বুধবার যুবরাজ গড়ের মাটে ঘোড়-দৌড় দেখিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট রাজগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই দিবস পূর্ব্ববাঙ্গালার রেলওয়ে হইয়া গোয়ালন্দে শূকর শিকার করিতে যাইবার কথা ছিল কিন্তু অসুস্থতা প্রযুক্ত যাইতে পারেন নাই।

বৃহস্পতিবার যুবরাজ সিরাপিস জাহাজে যাইয়া বড় ও ছোট লাট সাহেবের সহিত জলযোগ করেন। শুক্রবার বৈকালে মেডিকেল কালেজ ও শিয়ালদহ কাবেল-মেডিকেল স্কুল দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এই দিবস ফ্রিমেসন দলের প্রতিনিধিগণ একটী চমৎকার পাত্রে একখানি অভিনন্দনপত্র যুবরাজকে প্রদান করেন। সেই দিবস রাত্রিকালে ইংরাজদিগের কর্ত্তৃক টাউন্‌হলের নাচ দর্শন করেন। শনিবার প্রাতঃকালে "ভারত নক্ষত্র" উপাধি প্রদানার্থে এক বৃহৎ দরবার হইয়াছিল। এই দরবার মাঠের মধ্যস্থলে একটী প্রকাণ্ড তাঁবুর মধ্যে হইয়াছিল, এবং ইহাতে কয়েকজন রাজা, কতিপয় সম্ভ্রান্ত ইংরাজ এবং আমাদিগের দেশস্থ মান্যবর বাবু দিগম্বর মিত্র মহাশয় এই "ভারত নক্ষত্র" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অপরাহ্ণে ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল লর্ড মেয়োর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার উৎসব হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর যুবরাজ আতোষবাজি সন্দর্শন করেন। এ সমস্ত বাজি ইংরাজ কারিকর দ্বারা নির্ম্মিত এবং অতি চমৎকার হইয়াছিল। হাউইগুলি নৈশ গগনের অধিক দূর উচ্চে উঠিয়া শত শত নীল, লোহিত, সুবর্ণ প্রভৃতি বর্ণের তারকার সৃষ্টি করাতে দৃশ্য অতি মনোহর হইয়াছিল। রবিবার রাজকুমার দুর্গের গির্জ্জায় উপাসনা কার্য্য সমাধা করেন এবং অপরাহ্ণে কোম্পানির বাগান দেখিতে যান।

পর দিবস ৩রা জানুয়ারি সোমবার যুবরাজকে "ডি, এল্"

উপাধি প্রদানার্থ সেনেট্ হাউসে একটী মহতী সভা হয়। যুবরাজ বেলা চারিটার সময় ঐ সভায় উপস্থিত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উক্ত উপাধি গ্রহণ করেন।

এই সভায় আসিবার পূর্ব্বে যুবরাজ কতিপয় বন্ধু ও সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় মহিলার সহিত রায় জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে বাঙ্গালী স্ত্রীলোক দেখিবার আশয়ে গমন করিয়াছিলেন। তিনি উক্ত বাবুর পত্নী কন্যা ও অপর কয়েকটী আত্মীয় স্ত্রীলোক দেখিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। বঙ্গ কুলবধূর কুলমান ও লজ্জা ইতিহাস বিখ্যাত; ইহাদিগকে অপর জাতির পুরুষদিগের দেখা দূরে থাকুক, স্বজাতি বা স্বগৃহের অন্য পুরুষদিগেরও দেখিবার সম্ভাবনা নাই। ইহারা অন্তঃপুর মধ্যে অবগুণ্ঠনাচ্ছাদিত হইয়া কালযাপন করে। অতএব এই দুর্লভ-স্ত্রী-রত্ন দেখিতে যুবরাজ যে সাতিশয় কৌতূহল প্রকাশ করিবেন এবং দেখিয়া বলিবেন, "আমি ভারতবর্ষে আসিয়া অবধিএমন সুন্দর দৃশ্য আর কিছুই দেখি নাই," ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যুবরাজ-দর্শন-লাভ বিনিময়ে উক্ত সীমন্তিনীগণ কিরূপে তাঁহাদিগের এত দিনের গৌরবান্বিত কুললজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া যুবরাজের সহিত আলাপ করিলেন!!! এতদ্দেশীয় মহিলাগণের পরমসুহৃৎ ও হিতৈষিণী মিস্‌মেরি কার্পেণ্টারের সহিত একমত হইয়া আমরা বলিতে পারি যে, আমাদিগের মহিলাগণের জনসমাজে বহির্গত হইবার এখনও সময় হয় নাই।

এই দিবস অপরাহ্ণ হইতে গবর্ণমেণ্ট হাউস অবধি হাবড়া ষ্টেষন পর্য্যন্ত গঙ্গাধারের রাস্তায় লোক জমিতে লাগিল। এই রাস্তা এবং গঙ্গার পোলটী অতিসুন্দররূপে শোভিত ও আলোকিত করা হইয়াছিল। যুবরাজ রাত্রি ১০ টার সময় হাবড়ার রেল-গাড়িতে উঠিয়া পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিয়াছেন।

বঙ্গমহিলা।

বঙ্গমহিলার সৌন্দর্য্য বা গঠনাদি ব্যাখ্যা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে, কারণ বাহ্য সৌন্দর্য্যে আমাদের আস্থা নাই। তবে বোধ হয় জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বিদেশীয়েরা বঙ্গমহিলার সৌন্দর্য্যবিষয়ে কিরূপ মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন। এরূপ প্রশ্ন ইতিহাসের প্রশ্ন সন্দেহ নাই, অতএব প্রারম্ভে ইহার উত্তর করা উচিত হইতেছে।

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের লোকসংখ্যাবিবরণে বিভরিজ্ সাহেব এইরূপ অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন;—"বোধ হয় বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, নিতান্ত ইতর স্থল ভিন্ন বঙ্গমহিলা বিলক্ষণ রূপশালিনী। বিশেষ এই যে, বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের যে সকল অধীন দেশ আছে তন্মধ্যে বেহারের কায়স্থকন্যারা অপূর্ব্ব রূপবতী বলিতে পারা যায়।" মিস্ কার্পেণ্টর একস্থলে কহিয়াছেন যে, লাবণ্যবিষয়ে বঙ্গস্ত্রীদিগকে ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট বোধ হয় না, বরং ভাবিয়া দেখিলে ইহাই বোধ হয় যে, নিরবচ্ছিন্ন শ্বেতবর্ণ অপেক্ষা গৌরবর্ণ বর্ণের মনোহারিতা আছে। ইতিহাসলেখক এলফিন্‌ষ্টোন্ একস্থলে কহিয়াছেন যে, রূপ বিষয়ে দেশীয় স্ত্রীরা অনুৎকৃষ্ট নহে। ফলতঃ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, বঙ্গস্ত্রীরা রূপ বিষয়ে বিদেশীয়দিগের অনভিমত নহেন। একজন ইংরাজলেখক একস্থলে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালী পুরুষ ও বাঙ্গালীর অন্তঃপুর তুলনা করিয়া দেখিলে বর্ণ ও সৌন্দর্য্য বিষয়ে বিলক্ষণ প্রভেদ দেখা যায়।

ইউরোপের সহিত আজিকালি সকল বিষয়েই আমাদের বিশেষ সম্পর্ক ঘটিয়াছে। সুতরাং কোন বিষয়ে কোন কথা বলিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ইউরোপের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়া থাকে। অতএব যদি বঙ্গস্ত্রীকে ইউরোপীয় মহিলার সহিত এইস্থলে একবার তুলনা করা যায়, তবে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইতিহাস

উপাধি প্রদানার্থ সেনেট্ হাউসে একটী মহতী সভা হয়। যুবরাজ বেলা চারিটার সময় ঐ সভায় উপস্থিত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উক্ত উপাধি গ্রহণ করেন।

এই সভায় আসিবার পূর্ব্বে যুবরাজ কতিপয় বন্ধু ও সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় মহিলার সহিত রায় জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে বাঙ্গালী স্ত্রীলোক দেখিবার আশয়ে গমন করিয়াছিলেন। তিনি উক্ত বাবুর পত্নী কন্যা ও অপর কয়েকটী আত্মীয় স্ত্রীলোক দেখিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। বঙ্গ কুলবধূর কুলমান ও লজ্জা ইতিহাস বিখ্যাত; ইহাদিগকে অপর জাতির পুরুষদিগের দেখা দূরে থাকুক, স্বজাতি বা স্বগৃহের অন্য পুরুষদিগেরও দেখিবার সম্ভাবনা নাই। ইহারা অন্তঃপুর মধ্যে অবগুণ্ঠনাচ্ছাদিত হইয়া কালযাপন করে। অতএব এই দুর্লভ-স্ত্রী-রত্ন দেখিতে যুবরাজ যে সাতিশয় কৌতূহল প্রকাশ করিবেন এবং দেখিয়া বলিবেন, "আমি ভারতবর্ষে আসিয়া অবধিএমন সুন্দর দৃশ্য আর কিছুই দেখি নাই," ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যুবরাজ-দর্শন-লাভ বিনিময়ে উক্ত সীমন্তিনীগণ কিরূপে তাঁহাদিগের এত দিনের গৌরবান্বিত কুললজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া যুবরাজের সহিত আলাপ করিলেন !!! এতদ্দেশীয় মহিলাগণের পরমসুহৃৎ ও হিতৈষিণী মিস্‌মেরি কার্পেণ্টারের সহিত একমত হইয়া আমরা বলিতে পারি যে, আমাদিগের মহিলাগণের জনসমাজে বহির্গত হইবার এখনও সময় হয় নাই।

এই দিবস অপরাহ্ণ হইতে গবর্ণমেণ্ট হাউস অবধি হাবড়া ষ্টেষন পর্য্যন্ত গঙ্গাধারের রাস্তায় লোক জমিতে লাগিল। এই রাস্তা এবং গঙ্গার পোলটী অতিসুন্দররূপে শোভিত ও আলোকিত করা হইয়াছিল। যুবরাজ রাত্রি ১০ টার সময় হাবড়ার রেলগাড়িতে উঠিয়া পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিয়াছেন।

বঙ্গমহিলা।

বঙ্গমহিলার সৌন্দর্য্য বা গঠনাদি ব্যাখ্যা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে, কারণ বাহ্য সৌন্দর্য্যে আমাদের আস্থা নাই। তবে বোধ হয় জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বিদেশীয়েরা বঙ্গমহিলার সৌন্দর্য্যবিষয়ে কিরূপ মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন। এরূপ প্রশ্ন ইতিহাসের প্রশ্ন সন্দেহ নাই, অতএব প্রারম্ভে ইহার উত্তর করা উচিত হইতেছে।

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের লোকসংখ্যাবিবরণে বিভরিজ্ সাহেব এইরূপ অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন;—"বোধ হয় বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, নিতান্ত ইতর স্থল ভিন্ন বঙ্গমহিলা বিলক্ষণ রূপশালিনী। বিশেষ এই যে, বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের যে সকল অধীন দেশ আছে তন্মধ্যে বেহারের কায়স্থকন্যারা অপূর্ব্ব রূপবতী বলিতে পারা যায়।" মিস্ কার্পেণ্টর একস্থলে কহিয়াছেন যে, লাবণ্যবিষয়ে বঙ্গস্ত্রীদিগকে ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট বোধ হয় না, বরং ভাবিয়া দেখিলে ইহাই বোধ হয় যে, নিরবচ্ছিন্ন শ্বেতবর্ণ অপেক্ষা গৌরবর্ণ বর্ণের মনোহারিতা আছে। ইতিহাসলেখক এলফিন্‌ষ্টোন্ একস্থলে কহিয়াছেন যে, রূপ বিষয়ে দেশীয় স্ত্রীরা অনুৎকৃষ্ট নহে। ফলতঃ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, বঙ্গস্ত্রীরা রূপ বিষয়ে বিদেশীয়দিগের অনভিমত নহেন। একজন ইংরাজলেখক একস্থলে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালী পুরুষ ও বাঙ্গালীর অন্তঃপুর তুলনা করিয়া দেখিলে বর্ণ ও সৌন্দর্য্য বিষয়ে বিলক্ষণ প্রভেদ দেখা যায়।

ইউরোপের সহিত আজিকালি সকল বিষয়েই আমাদের বিশেষ সম্পর্ক ঘটিয়াছে। সুতরাং কোন বিষয়ে কোন কথা বলিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ইউরোপের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়া থাকে। অতএব যদি বঙ্গস্ত্রীকে ইউরোপীয় মহিলার সহিত এইস্থলে একবার তুলনা করা যায়, তবে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইতিহাস

আলোচনা করিয়া দেখিলে বঙ্গস্ত্রীর সহিত ইউরোপীয় বনিতার কোন বিষয়েই তুলনা হইতে পারে না। তবে প্রাচীন গ্রীক-বনিতার সহিত বঙ্গবনিতার বিশেষ সাদৃশ্য আছে বলিতে পারা যায়। গ্রীস দেশের স্ত্রীরা আমাদের দেশীয় স্ত্রীদিগের ন্যায় অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিত। প্রাচীন গ্রীকেরা বীরত্বের প্রতি সমধিক সম্মান ও ভীরুতাকে যথেষ্ট অবমাননা করিত। সুতরাং তাহারা ভীরুস্বভাব স্ত্রীজাতিকে যে পুরুষের অপেক্ষা হীন বোধ করিবে, তাহার বিচিত্র কি। একজন ইংরাজ ইতিহাসলেখক বলেন যে, গ্রীকেরা স্ত্রীলোকদিগকে যদি কিছু সমাদর করিত, তবে তাঁহারা তাহাদিগকে স্ত্রীলোক ভাবিয়া ওরূপ করিত না। স্ত্রীলোকে বীরপুরুষ প্রসব করে, এই নিমিত্তই তাহারা স্ত্রীলোকের প্রতি যাহাকিছু শ্রদ্ধা করিত। স্ত্রীসঙ্গ তাহারা আর্য্যদিগের ন্যায় একবারেই ঘৃণা করিত বলিয়া বোধ হয়। মনু যেরূপ একস্থলে কহিয়াছেন যে, যে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় স্ত্রীসঙ্গ করিয়া থাকে সে ব্রাহ্মণত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্বের অবমাননা করে। গ্রীকদিগের ইতিহাসেও সেইরূপ ভূরি বচন দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে উন্নত আর্য্যেরা যেরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, প্রাচীন গ্রীসের পুরুষেরাও অবিকল সেইরূপ করিত। অতএব গ্রীক বনিতারা যে বঙ্গীয় বা ভারতীয় স্ত্রীদিগের ন্যায় অবরোধে আবদ্ধ হইয়া থাকিত, সে বিষয়ে আর বিস্মিত হইবার বিষয় নাই। ইংরাজবধূরা স্বামীর সহিত সমান সম্মান অপেক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু গ্রীকবধূরা বঙ্গীয় বা ভারতীয় বধূদিগের ন্যায় অপনাদিগকে স্বামীদিগের অপেক্ষা সাতিশয় নীচ বলিয়া বোধ করিত। তাহারা শেষোক্তদিগের ন্যায় সাতিশয় ভীরুস্বভাব ছিল। বঙ্গস্ত্রীরা পুরুষদিগের শুশ্রূষার নিমিত্ত যেরূপ অন্তঃপুরের ক্রিয়া-কলাপ নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, গ্রীকস্ত্রীরাও অবিকল সেইরূপ করিত। পাকক্রিয়া, শয্যাবিন্যাস, পরিবেশন ও শিশুসেবা প্রভৃতি যে সকল ব্যাপার বঙ্গীয়দিগের অন্তঃপুরে দেখিতে পাওয়া

যায়, গ্রীকস্ত্রীরা তাহার অপেক্ষা অল্প করিত না। উহারা যে কোনকালেও অন্তঃপুরের বাহির হইতে পারিত, ইতিহাসে এরূপ প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। পারস্যদিগের সহিত যে একটা ভয়ঙ্কর সমরে গ্রীকদিগের ভূরিক্ষয় হয়, একজন ইতিহাসলেখক বলেন যে, ঐ সময়ে গ্রীকবনিতাদিগের অবস্থা স্মরণ করিলে সাতিশয় শোক বোধ হয়। বনিতারা স্বামী ও পুত্রের সংবাদ জানিবার নিমিত্ত অন্তঃপুর হইতে দলে দলে বাহির হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু বহির্দ্বার পার হইয়া রাজপথে আসিতে পারিল না, তাহারা বেগে এক একবার অন্তঃপুরের বাহির হইয়া আসিতে লাগিল, আবার চৈতন্য হইবামাত্র অন্তঃপুরে পুনঃপ্রবেশ করিল।

আমাদের অন্তঃপুর অপেক্ষা আমাদের বৈঠকখানা সুসজ্জিত হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামে অনেকস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্তঃপুর সাতিশয় জঘন্য অথচ বৈঠকখানার গৃহদ্বার বিলক্ষণ পরিষ্কৃত ও বিলক্ষণ পরিসৃত। গ্রীকদেশেও অবিকল এইরূপ ছিল। এমন কি প্রসিদ্ধ বক্তা ডিমস্থিনিস্‌ও এইরূপ ব্যবহার অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। তিনি একস্থলে সক্রোধে কহিয়াছেন যে, "গ্রীসের কি আর সে কাল আছে, তখন বৈঠকখানার প্রতিই লোকের মনোযোগ ছিল, এখন বিপরীত হইয়াছে। এখন বৈঠকখানার অপেক্ষা অন্তঃপুরের প্রতি অধিক মনোযোগ হইয়াছে অতএব গ্রীস্‌ যে উচ্ছিন্ন যাইবে তাহার আর অধিক বিলম্ব নাই।"

ফলতঃ আমাদের অন্তঃপুর ও স্ত্রীদিগের সহিত প্রাচীন গ্রীসের অন্তঃপুর ও স্ত্রীদিগের বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল এক বিষয়ে কিছুই সাদৃশ্য হয় না। গ্রীকস্ত্রীদিগের বীরচরিত-প্রিয়তা কোন কোন স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ প্রিয়তা অভ্যাসের সামগ্রী সন্দেহ নাই, কিন্তু বঙ্গস্ত্রীদিগের ওরূপ অভ্যাস সম্ভব হইতে পারে না। কারণ যাহাদের স্বামীরা বীরত্বের মুখ দেখিতে পায় না, তাহাদের পত্নীরা কিরূপে বীরপ্রিয়া হইবে।

জর্ম্মাণদিগের সহিত বঙ্গীয় বধূদের এক বিষয়ে বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গীয়েরা স্বামীকে দেবতার ন্যায় ভয় করিয়া থাকেন, জর্ম্মাণেরাও ঐরূপ করেন। তবে কথা এই যে, জর্ম্মাণদিগকে বিশেষ প্রশংসা করা উচিত। কারণ বঙ্গীয়েরা কোন কোন স্থলে ভয়ে ভক্তি করিয়া থাকেন, কেননা সমাজ উহাদিগকে ঐরূপ ভয় প্রদর্শন করিতেছে। জর্ম্মাণবধূদিগের ঐরূপ সামাজিক ভয় দেখিতে পাওয়া যায় না, কেননা স্বামীর সহিত বিরোধ হইলে উহারা পুরুষান্তরের পাণিপীড়ন করিতে পারে, বঙ্গীয়াদিগের ওরূপ সুবিধা নাই। অতএব জর্ম্মাণস্ত্রীরা যদি স্বামীদিগের বশীভূত হয়, তাহা হইলে ঐরূপ বশীভাবের আন্তরিকতা পক্ষে সন্দেহ হইতে পারেনা। সুতরাং জর্ম্মাণস্ত্রীদিগকে বিশেষ প্রশংসা করিতে হইবে।

ইংরাজদিগের সহিত স্ত্রীবিষয়ে আমাদের তুলনাই হইতে পারে না। কারণ ইতিহাসলেখকেরা ইংরাজবধূদিগকে সাতিশয় অশান্ত কহিয়া থাকেন। ভিন্নজাতি ইংরাজকন্যা বিবাহ করিয়া কখনই শান্তিভোগ করিতে পারেন নাই। শুনিতে পাওয়া যায় ইংরাজেরাও অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরাজলেখকদের মধ্যে এডিসন্‌কে সর্ব্বাপেক্ষা শান্ত বলিয়া বোধ হয়; তিনি প্রাণান্তেও কোন বিষয়ে স্বদেশীয়ের কুৎসা করিতে চান না। কিন্তু তিনিও ইংরাজস্ত্রীদিগের সম্বন্ধে ইঙ্গিতে যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, আমরা সে সকল সাতিশয় প্রতিকূল বলিয়া মনে করি। এডিসন্ একস্থলে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, অধিকাংশ স্ত্রীলোকই শূকর প্রভৃতির অংশে জন্মগ্রহণ করে। তিনি অবশ্য এই সকল প্রতিকূল সংবাদ ইংরাজবধূদিগের অবস্থা হইতেই সঙ্কলন করিয়াছেন। আমরা অন্যান্য গ্রন্থকারের নাম করিতে চাহিনা। কেবল সেক্‌সপীয়রের উল্লেখ করিয়া উপসংহার করিতে পারি। সেক্‌সপীয়র স্ত্রীচরিত্র নানাপ্রকার বর্ণনা করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে দুশ্চারিণী বিশেষতঃ কলহপ্রিয়া স্ত্রীদিগের চরিত্র সাতিশয় উৎসাহ সহকারে

বর্ণনা করিয়াছেন। ফলতঃ ইংরাজলোকদিগের ভাব দেখিলে ইংরাজবধূদিগকে সাতিশয় গর্ব্বিণী ও আত্মসুখিনী বলিয়াই বোধ হয়।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ফরাসী স্ত্রীদিগের সহিত বঙ্গমহিলার চরিত্র বিষয়ে বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পওয়া যায়। আমাদের মতে বঙ্গমহিলার বিদ্বেষীরাই এরূপ কথা বলিয়া থাকে। ফরসীস্ত্রীদিগের ন্যায় দুশ্চারিণী ও বিলাসিনী পৃথিবীতে অল্প স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব তাহাদের সহিত বঙ্গসতীর চরিত্র বিষয়ে সাদৃশ্য স্থাপন করিতে যাওয়া নিতান্ত অসঙ্গত বলিতে হইবে।

যাহা হউক আমরা আর সাদৃশ্য লইয়া পাঠককে অধিক বিরক্ত করিব না। দেশের প্রাচীন গ্রন্থ সকলে বঙ্গস্ত্রীর বিষয় যদি কিছু বর্ণিত হইয়া থাকে, তবে তাহাই আমাদের এক্ষণে আলোচ্য হইতেছে। পুরাণাদিতে বঙ্গদেশের যৎসামান্য উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, বঙ্গস্ত্রীর বিষয়ে কখন কোন উল্লেখ দেখিয়াছি কি না স্মরণ করিতে পারি না। বরং বঙ্গবাসী বীরগণের উল্লেখ অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি বঙ্গীয় সতীদিগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের স্মরণ হয় যে, একস্থলে কোন এক জন সংস্কৃত কবির গ্রন্থে বঙ্গীয় বারাঙ্গনার প্রশংসা শুনিয়াছি। গ্রন্থকার কি জন্য যে এরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। বঙ্গীয় স্ত্রীলোকের আচার ব্যবহার কোনস্থলেই বর্ণিত দেখা যায় না। বঙ্গীয় স্ত্রীলোক যে সম্বোধন করিয়া কাহাকে কোন কথা বলিতেছে, আমারা এরূপ বর্ণনাও দেখিতে পাই না। তবে বঙ্গীয় স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিয়া কোন ব্যক্তি কোন কথা বলিতেছে, আমারা এরূপ বর্ণনা দুই এক স্থলে দেখিতে পাইয়াছি।

"তরুণং সর্ষপশাকং নবোদনং পিচ্ছিলানিচ দধীনি।
অল্পব্যয়েন সুন্দরি গ্রাম্যজনো মিষ্টমশ্নাতি॥"

অর্থাৎ "কচি কচি সরিষার শাক, নূতন চাউলের অন্ন, পিছল পিছল

দধি একত্র আহার করিলে অতি মধুর হয়, হে সুন্দরি গ্রাম্যলোকে অল্পব্যয়ে এইরূপ মধুর আহার করিয়া থাকে।”

এস্থলে যে সুন্দরীকে সম্বোধন করা হইয়াছে, তিনি অবশ্য বঙ্গদেশেরই সুন্দরী হইবেন। কেননা কচি কচি সরিষার শাক, নূতন চাউলের অন্ন, ও পিছল পিছল দই, বঙ্গদেশ ভিন্ন আর কোথাও একত্র সম্ভব হয় না। এরূপ বর্ণনায় বক্তার রুচির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু সুন্দরীর কিছুই পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে সঙ্কেতে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, সুন্দরীকে ঐরূপ শাকান্ন রন্ধন করিবার নিমিত্ত উপদেশ করা হইয়াছে। বাস্তবিক কবিকঙ্কণ প্রভৃতির গ্রন্থ সমালোচন করিয়া দেখিলে, রন্ধনকার্য্যে প্রাচীন বঙ্গীয়াদিগের বিলক্ষণ পারকতা দৃষ্ট হয়। অথবা কবিকঙ্কণের গ্রন্থে বঙ্গীয়াদিগের যাহা কিছু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল তাহাদের রন্ধনাদি গৃহব্যাপার সম্বন্ধেই কল্পিত বলিয়া বোধ হয়। কবিকঙ্কণের সময়ে রন্ধন ব্যাপারই বঙ্গীয়াদিগের একমাত্র প্রশস্ত ব্যবসায় ছিল বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার রচনা দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে তৎকালের রাজ-রাণীরাও রন্ধনকার্য্যে পারকতা প্রদর্শন করিতে পারিলে গৌরব বোধ করিত। কবিকঙ্কণ ভবানীকেও রাঁধাইয়াছেন, আবার সদাগরশ্রেষ্ঠ শ্রীমন্তের কামিনীদিগকেও রাঁধাইয়াছেন। তিনি স্ত্রীলোক দেখিলেই প্রথমতঃ একবার তাহার হস্তে হাঁড়ী ও বেড়ী সমর্পণ করিয়াছেন। কোন স্ত্রীলোকের গুণ ব্যাখ্যা করিতে হইলে নানা কবি নানাপ্রকারে উহা বর্ণন করিয়া থাকেন, কিন্তু ভাল করিয়া রাঁধিতে না পারিলে কবিকঙ্কণ কোন স্ত্রীকেই গুণবতী বলিতে চান না।

ক্রমশঃ—

কালের শৃঙ্গ বাদন।

১

“যতনের শৃঙ্গ বাজ ঘোর রবে,
চেতুক, জাগুক, জগতজন;
ছাড় হুহুঙ্কার, কাঁপাও আকাশ,
সে হুঙ্কার নাদ বহুক্ বাতাস;
নীরবে থে'ক না হয়ো না হতাশ,
ছাড় হুহুঙ্কার, কাঁপাও আকাশ,
চেতুক, জাগুক, জগতজন।”

২

এত বলি কাল করাল বদনে
রাখিল সে শৃঙ্গ—অতীব যতনে;
বাজিয়া উঠিল গভীর নিক্কণে,
ছুটিল নিনাদ সমীর মিলনে;
পূরিল আকাশ, কাঁপিল ভূতল,
কাঁপিয়া উঠিল হিমাদ্রি অচল;
কোটি কোটি বার প্রতিধ্বনি উঠে,
দিগদশ ব্যাপি চারিদিকে ছুটে;
চমকিত-চিত জগতবাসী!

কালের সে শৃঙ্গ অতি ভয়ঙ্কর,
অযুত কুলিশ তাহার কিঙ্কর!
সহসা প্রলয় হেন বোধ হয়,
জগত-নিবাসী আকুল-হৃদয়!
ভূধর সাগর উঠিল কাঁপিয়া,
তরু পড়ে ভূমি হৃদয়ে চাপিয়া;
তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিঘাত হয়,
আবার তরঙ্গ উঠে হয় ক্ষয়;
অফেন সাগর সফেন হইল,
তুলারাশি যেন সলিলে ভাসিল;
কেশরি-নিনাদে অপর কেশরী
উঠে লাফাইয়া হুহুঙ্কার করি,
কালশৃঙ্গ রবে গর্জ্জিল সাগর;
তা সহ সমীর ছাড়ে ভীমস্বর;
বুঝি রে প্রলয় জগতনাশী!

৩

প্রেমের আদর্শ বনের ভিতরে;—
জড়িত ব্রততী তরু-কলেবরে!
হায় রে, সে নাদে পৃথক হইল,
প্রণয়-বন্ধন ছিঁড়িয়া পড়িল!
সোহাগিনী লতা ভূতলে গড়ায়,
বিরহে পাদপ শাখা আছড়ায়,
অবশেষে সেও পড়িল ভূমে!

তরুলতা-ভূষা কুসুম নিকর
বৃন্তহীন হয়ে পড়ে ঝর ঝর;
দস্যু-গরজনে গৃহস্থ যেমন
ভয়ে জড়সড় লুকায় রতন!
স্তনপায়ী শিশু ছাড়ে স্তনপান,
ভয়েতে জননী ব্যাকুলিত-প্রাণ!
শয়িত দম্পতী সহসা জাগিল,
কুস্বপনে যেন সুনিদ্রা ভাঙ্গিল!
গ্রীবা বাঁকাইয়া দয়িত গ্রীবায়
ছিল বিহঙ্গিনী প্রেম প্রতীক্ষায়,
সহসা শুনিয়া কাল-শৃঙ্গ রব
চমকিত-চিত, করি কলরব,
বিহঙ্গ সহিত উড়িল ব্যোমে।

৪

“যতনের শৃঙ্গ বাজ ঘোর রবে,
চেতুক্, জাগুক্ জগতজন;
ছাড় হুহুঙ্কার, কাঁপাও আকাশ,
সে হুঙ্কার নাদ বহুক বাতাস,

নীরবে থে'ক না হয়ো না হতাশ,
ছাড় হুহুঙ্কার, কাঁপাও আকাশ,
চেতুক জাগুক জগতজন।"

৫

এত বলি কাল গভীর আওয়াজে
বাজাইল শৃঙ্গ সুগভীর বাজে ;—
"জয় জয় কাল! অসীম অক্ষয়,
অতুল ক্ষমতা তব বিশ্বময় ;
তুলনায় কেহ তব তুল্য নয়,
তব পরাক্রম সাধ করে জয়
কত আখণ্ডল, কত পঞ্চানন,
কত চতুর্ম্মুখ, কত নারায়ণ,
কত কত শশী, কত কত ভানু,
কত গ্রহপতি, কতই কৃশানু,
অসংখ্য জগৎ, তারা অগণন,
অসংখ্য জলধি, ভূধর, কানন ;
পশু পক্ষী কীট মানব নিচয়
তোমার প্রতাপে হতেছে বিলয়!
তোমারি প্রতাপে সকলি আবার
হতেছে সৃজিত কত শতবার ;
গড়িতে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে গড়িতে
তব সম, বল, কে আছে জগতে?
কে ধরে ক্ষমতা তোমার মত?
"জগত কিরূপ আছিল প্রথমে,
এবে বা কিরূপ তব পরাক্রমে ;
ছিল যেটি কাল, নয়নরঞ্জন,
কেন আ'জ তারে দেখিনা তেমন?
ছিল যেটি কাল অতি কদাকার,
কেন আ'জ সেটি শোভার আধার?
তব ইন্দ্রজালে এইরূপই হয়,
'চির দিন কভু সমান না রয়!'
এই মহামন্ত্র কোথা শিখেছিলে?
এই মহামন্ত্র কে তোমারে দিলে?
এ মন্ত্র লভিলে করে কি ব্রত?

৬

"প্রাচীন মিসর গৌরব-আগার ;
প্রাচীন পারস্য রতন-ভাণ্ডার ;
পুরাতন রোম, গ্রীশ বাবিলন
কি ছিল, হায় রে, এবে বা কেমন!
শুধু আছে নাম, সে ভাব কোথায়?
কেন হেন হ'ল? কার ক্ষমতায়?
তোমারি ক্ষমতা এই কথা কয়,
'চিরদিন কভু সমান না রয়!'
কালের ক্ষমতা অপ্রতিহত।
"সোণার ভারত পার্থিব অমরা
যশে গুণে ধনে পূরেছিল ধরা,
চঞ্চল কমলা অচল হইয়া
ছিলা বিরাজিত কমলে ভুষিয়া ;
অসংখ্য-রসনা ধরা সসাগরা
'সোণার ভারত ভূতল-অমরা'
এ কথা নিয়ত সঘনে গায়িত,
প্রতিধ্বনি উহা বহিয়া ধাইত ;
কাল-কল্লোলিনী তুলিয়া লহরী
ইহাই গায়িত সুছাঁদে বিবরি ;
প্রণয়িনী সহ বিহঙ্গের দল
কল-কণ্ঠে ইহা গায়িত কেবল ;
শীকর-রসিত শীতল পবন
ইহাই গায়িত ছায়িয়া গগন ;
প্রভাতে নিশীথে গোধূলি সময়ে
নব নব বেশে প্রকৃতি সাজিয়ে
গায়িত বাজায়ে যন্ত্র সপ্তস্বরা ;—
'সোণার ভারত ভূতল-অমরা ;
কে বল, ভূতলে ভারত মত?'

৭

"ভারতের কবি, প্রকৃতি-পালিত,
বাজাইয়া বীণা বিপিনে গায়িত ;
কবির কল্পনা নন্দনকানন,
কবির কল্পনা অমর-ভুবন,

স্বর্গ মন্দাকিনী সুধা-প্রবাহিণী
কবির কল্পনা, অলীক কাহিনী ;
দেব-কল্পতরু, পারিজাত ফুল,
চির-সুখময় স্বরগ অতুল—
কবির কল্পনা, নতুবা সে সবে
কে ভাবে প্রকৃত? দেখেছ কি কবে?
প্রকৃত স্বরগ যদি দেখিবারে
আশা কর, এস ভারত মাঝারে
স্থির করি দেখ নয়নের তারা ;—
'সোণার ভারত মরতে অমরা।'
পবিত্র ভূধর দেব হিমালয়
তুষার-মণ্ডিত চির শোভাময় ;
পুণ্য তোয়ময়ী জাহ্নবী তটিনী
পুণ্য তোয়ময়ী কলিন্দ-নন্দিনী
হিমাদ্রি-সম্ভূতা, ভারতের হিয়া
অমৃতের ধারে শীতল করিয়া
অবিরাম গতি ধাইছে সাগরে;
বাহু প্রসারিয়া সাগরো আদরে।
নটন-নিপুণ লহরী-নিকর
উঠিছে—পড়িছে—ধ্বনি তর তর।
কুসুমিত বন, পাদপের শ্রেণী
শাখায় শাখায় বিনাইয়া বেণী,
ডগায় ধরিয়া কুসুম-রতন,
দেখ রে চাহিয়া, শোভিছে কেমন!
বীরত্বের ভূমি ভারত-ভবন,
ভারত সন্তান বীরত্ব-জীবন ;
স্বাধীনত্ব-রবি ভারত-গগনে,
দেখ রে চাহিয়া, অযুত কিরণে ;
দশদিশি সদা করিছে উজ্জ্বল,
প্রতিভাত তাহে আকাশ ভূতল ;
আকাশের রবি কত তেজ ধরে?
শত শত রবি এ রবি-গোচরে
মানে পরাজয়, ধরার পিছনে
লুকায় সলাজে লোহিত বদনে!

প্রকৃত স্বরগ যদি দেখিবারে
আশা কর এস ভারত মাঝারে
স্থির করি দেখ নয়নের তারা ;
কে বল, ভূতলে ভারত মত?"

এই গীত গেয়ে ক্ষণেকের তরে,
নীরবেতে শৃঙ্গ রাখিয়া অধরে ;
বিরাম লভিলা অবিনাশী কাল,
পুন বাজাইলা গভীর বিশাল ;
গর্জ্জিত জলদ যথা ক্ষণতরে,
নীরবিয়া পুনঃ ডাকে ভীম স্বরে।
"সোণার ভারত হয়েছে বিলয়,
এবে রে ভারত যমের নিরয়!
অবিনাশী কাল! তোমারি শকতি,
করেছে ইহার এহেন দুর্গতি!
সে দিন যাহারে অনন্য যতনে
সাজাইয়া ছিলে অতুল রতনে,
ভুবনের সুখ একীভূত করে
রেখেছিলে যার হৃদয়-কন্দরে ;
দেব-তুলি ধরি হরষিত চিতে,
রূপরাশি যার নিয়ত আঁকিতে ;
তব কূট চক্রে সে ভারতভূমি
এবে বা কিরূপে ঘুরিতেছে ভ্রমি!
অস্থিচর্ম্মসার তব পদাঘাতে,
অধীনতা-পাশ বান্ধা দুইহাতে!
অবিরল অশ্রু ঝরিছে নয়নে,
মলিনতা মাখা অমল বদনে,
তব অস্ত্রাঘাতে অক্ষত শরীর
বিক্ষত হয়েছে—বহিছে রুধির!
যে জাতির তেজে সমগ্র ভূতল
প্রতি লহমায় হইত চঞ্চল ;
সেই জাতি এবে শবের মতন
পড়িয়া ভূতলে করিছে লুণ্ঠন।

সেই একদিন এ জাতির ছিল,
তোমারি ভ্রূভঙ্গি তাহা ঘুচাইল,
উন্নত শিরস হয়েছে নত।”

৮

এতবলি কাল, ক্ষণেকের তরে,
কি জানি, কি স্মরি ব্যাকুল অন্তরে
নীরবিয়া, শৃঙ্গ পুন বাজাইল,
এই কটি কথা আকাশ ছাইল;
“মাভৈর্মাভৈঃ, ভারত দুখিনি,
পোহাইবে তব দুখের যামিনী;
মাভৈর্মাভৈঃ, ভারতবাসি।

“কাল-চক্র ঘোরপরিবর্ত্তনীয়
রবি শশী সম চিরগতিময়।
মাভৈর্মাভৈঃ, আবার সুদিন
আসিবে ঘুরিয়া, হইবে বিলীন
ভাবৎ যন্ত্রণা বিপদ রাশি।”

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

ভানুমতী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উদয়পুরে মহা হুলস্থূল উপস্থিত। মহারাজ কুমারের উপর কুপিত হইয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসন করিয়াছেন। অমাত্যবর্গ সকলেই যৎপরোনাস্তি ক্ষুণ্ণ হইলেও কাহারও এমন সাহস হইল না যে, রাজসন্নিধানে তাঁহার নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন। প্রজাগণ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিষাদসাগরে মগ্ন হইল, কারণ যুবরাজ সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার বিনয়, দয়া, শৌর্য্য প্রভৃতি গুণেতে সকলেই মোহিত হইয়াছিল। যে দিবস কুমার নিরুদ্দেশ হয়েন, তাহার পূর্ব্বদিবস তিনি অশ্বারোহণে নগর মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে পথিমধ্যে দারুণ ব্যাধিগ্রস্তা প্রায় অশীতিবর্ষবয়স্কা একটী বৃদ্ধা স্ত্রী মুর্চ্ছাপন্না পতিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া এক যান আনয়ন করাইয়া স্বয়ং তাহাকে তদুপরি উত্তোলন করিয়া তাহার আবাস পর্য্যন্ত সমভিব্যাহারে গমন করেন। কুমার যে সাধারণের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন ইহা আশ্চর্য্য নহে।

এদিকে উমাকান্তের আহ্লাদের সীমা নাই। রাজকুমার নির্ব্বাসিত হইলেন; তাঁহার পথ নিষ্কণ্টক হইল। তিনি জানিতেন না যে মন্ত্রীসুতাও নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। ভাবিলেন ভানুমতী-লাভে তাঁহার যে একমাত্র বিঘ্ন ছিল তাহা দূরীভূত হইল।

উমাকান্ত উদয়পুররাজবংশোদ্ভূত। অযোধ্যাসিংহের প্রপিতামহের দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠের বংশে যুবরাজের জন্ম; কনিষ্ঠের বংশে উমাকান্ত জন্মগ্রহণ করেন। অযোধ্যাসিংহের পিতার অনেক বয়স পর্য্যন্ত সন্তান হয় নাই। এজন্য তিনি উমাকান্তকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে মানস করেন। কিন্তু ইহার কিছুকাল পরেই রাজমহিষী এক তনয় প্রসব করেন। সুতরাং উমাকান্তের রাজসিংহাসনাধিরোহণের আশাও নির্ম্মূল হইল।

যুবরাজ অপেক্ষা উমাকান্ত ৭ বৎসর জ্যেষ্ঠ। শৈশবকালে মাতৃমুখে শ্রবণ করেন যে কুমার না জন্মগ্রহণ করিলে তিনিই পরে রাজা হইতেন। স্বভাবটি নিতান্ত সরল ছিল না; একারণ তিনি শৈশবাবধিই কুমারকে বিষদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু বাহ্যিক কোন বিদ্রূপভাব প্রকাশ করিতেন না। বরং সর্ব্বদাই কুমারের প্রতি স্নেহাতিশয্য প্রদর্শন করিতেন।

অযোধ্যাসিংহ স্বীয় প্রকৃতির কোমলতা প্রযুক্ত ইঁহাকে সহোদরের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। যুধিষ্ঠিরও এককালে দুর্য্যোধনকে পরম আত্মীয় জ্ঞান করিতেন।

উমাকান্তের আনন্দসাগর উথলিয়া উঠিল। এদিকে অমাত্যতনয়ালাভের পথ পরিষ্কার হইল; ওদিকে রাজাও আপনার একমাত্র সন্তানকে ত্যাগ করিলেন। বুঝিয়া চলিতে পারিলে রাজা ইহাকে পুনরায় পুত্রস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারেন।

রাজমহিষী শোকে মগ্না হইলেন। একমাত্র সন্তান অশেষ দোষে দূষিত হইলেও মাতার আদরণীয় হয়। যুবরাজ সর্ব্বগুণবিভূষিত; সুতরাং রাজ্ঞী যে সাতিশয় কাতরা হইলেন ইহা বিচিত্র নহে। রাজা অন্তঃপুরে আগমন করিলে রাণী রোদন করিতে করিতে কহিলেন “মহারাজ, অযোধ্যাসিংহকে ক্ষমা করিতে হইবে।”

রাজা উত্তর করিলেন, “সে যখন আমার বশীভূত নহে, এবং আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কিছুমাত্র ভীত নয় তখন আমি কখনই তাহাকে সন্তান বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।”

রাণী কহিলেন, "অল্প বয়স্কতা প্রযুক্তই এরূপ দোষ করিয়াছে।"

"তত্রাপি কি তাহা দোষ নহে?"

"দোষ হইলেও এমন দারুণ দণ্ডপ্রদান উচিত নহে"

মহারাজ কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "রাজনিয়োগ দারুণ, কি উচিত বা অনুচিত, ইহা বিচার করা স্ত্রীলোকের পক্ষে বিধেয় নহে।

রাণী বলিলেন "মহারাজ, সন্তান কোন দোষ করিলে পিতা কি কখন ক্ষমা করে না?"

"অযোধ্যা সিংহ যে কেবল পিতার ইচ্ছার বিপরীত আচরণ করিয়াছে এমন নহে," রাজাজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়াছে। রাজবিদ্রোহে অপরাধীর প্রাণপর্য্যন্ত দণ্ড করা যায়।"

"তবে কি রাজা ক্ষমা করিতে পারে না? রাজার দয়া প্রকাশ করা কি অনুচিত?"

মহারাজ কিঞ্চিৎ অধীর হইয়া বলিলেন "সে বিষয়ে তর্ক করিবার প্রয়োজন করে না। কুমারের যখন মতিভ্রম দূর হইবে, যখন আপনার অপরাধ স্বীকার করিবে, ও আমার বশবর্ত্তী হইবে, তখন তাহাকে ক্ষমা করিয়া পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিব। নচেৎ তাহার সহিত অদ্যাবধি আমার সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন হইল।"

মহিষী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরব হইলেন। রাজার স্বভাব জানিতেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে এক্ষণে তাঁহার ক্রোধ নির্ব্বাণ হইবে না। কেবল মাত্র কহিলেন—

"মহারাজ! আমার অনুরোধেও কি তাহাকে ক্ষমা করিবেন না!"

রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "যে কুলাঙ্গার সভামধ্যে আমার এতাদৃশ অপমান করিল, আমি তাহার মুখদর্শনও করিতে চাহি না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এদিকে রামদয়াল ক্ষিপ্তের ন্যায় ইতস্ততঃ তনয়ার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে চর প্রেরণ করিলেন। পাছে একথা প্রকাশ হইলে কোন কলঙ্ক উত্থাপন হয়, এজন্য স্বীয় বিশ্বাসী ভৃত্য-

দিগকে এই বিষয়ে নিযুক্ত করিলেন ও সাতিশয় গোপনে তাহাদিগকে কার্য্য করিতে আজ্ঞা দিলেন।

উমাকান্ত অমাত্যকুমারীর অনুদ্দেশ হইবার পরদিবস রামদয়ালের ভবনে গমন করেন। ইহার মাতার সহিত মন্ত্রী-পত্নীর সখীভাব ছিল। এজন্য ইহার অন্তঃপুরে যাইবার কোন নিষেধ ছিল না। সুতরাং ভানুমতীর সহিত ইহার প্রায়ই সাক্ষাৎ হইত। কিন্তু সে দিবস ভানুমতীকে দেখিতে পাইলেন না।

পরদিনও অমাত্যালয়ে গমন করেন, ও মন্ত্রীকন্যার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াতে ভানুমতীর মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভানুমতীকে কয়দিবস দেখিতেছি না ইহার কারণ কি?"

"তাহার শারীরিক কিঞ্চিৎ অসুখ করিয়াছে, এ জন্য নিজগৃহ হইতে প্রায় বাহির হয় না।"

উমাকান্ত প্রতিদিবস যাতায়াত করিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু ভানুমতীর আরোগ্য সমাচার কখনই শুনিতে পাইতেন না। কখন তাহার সহিত সাক্ষাৎও হইত না।

মহারাজ একদিন সভাভঙ্গ হইলে একাকী বিরলে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে পশ্চাদ্ভাগে একটি দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইয়া সেই দিকে অবলোকন করিলেন। দেখিলেন উমাকান্ত অতি বিষণ্ণভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। বলিলেন—

"উমাকান্ত, তুমি এখানে কি করিতেছ?"

"মহারাজ আপনাকে এ প্রকার চিন্তামগ্ন দেখিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলাম। এ অধীন আপনার চিরদাস।"

মহারাজ কহিলেন, "উমাকান্ত তুমি অতি শিষ্ট। তোমার কথাতেই আমি পরিতুষ্ট হইলাম।" এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

উমাকান্ত বাহ্যিক অত্যন্ত চিন্তাকুল ভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন কেন? আপনি কি কোন মানসিক অসুখযন্ত্রণাভোগ করিতেছেন?"

"না মানসিক এমন কোন পীড়া হয় নাই।"

"অবশ্যই আপনার কোন অসুখ হইয়াছে। পূর্ব্বে আপনি দিবারাত্র মৃগয়াদিতে যাপন করিতেন; সর্ব্বদাই রাজসভায় আগমন করিয়া রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন; এক মুহূর্ত্তেরও জন্য অলস হইতেন না। এক্ষণে আপনি রাজকার্য্যে বিমুখ হইয়াছেন। মৃগয়ায় যাওয়া দূরে থাকুক, প্রাসাদ হইতে বহির্গমন করেন না। সততই নির্জ্জন স্থানে চিন্তামগ্নের ন্যায় একাকী বসিয়া থাকেন। ইহার অবশ্যই কোন কারণ থাকিবে।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন "এ সব তোমায় কে বলিয়াছে।"

"মহারাজ, সন্তান যদি পীড়াগ্রস্ত হয়; জননী কি তাহা বুঝিতে পারে না? স্নেহচক্ষের নিকট কিছুই গোপন করিয়া রাখা যায় না। আপনি স্বীকার করুন আর নাই করুন, আমি স্পষ্টই অনুভব করিতেছি যে আপনার কোন কষ্ট হইয়াছে।"

"তুমি কি আমাকে এত স্নেহ কর?"

"বাহ্যিক দম্ভ করা পুরুষের উচিত নহে। কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে যদি আজ্ঞা করেন তবে এ দাস এক্ষণেই আপনার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারে।"

রাজা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "উমাকান্ত, তোমার ন্যায় যদি আমার একটি পুত্র থাকিত, তাহা হইলে আমার কোন চিন্তাই থাকিত না।"

উমাকান্ত দেখিলেন সুযোগ হইয়াছে। বলিলেন "মহারাজ আপনার অযোধ্যাসিংহ——"

রাজা সহসা বলিলেন "ও কুলাঙ্গারের নাম করিও না। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে যত দিন সে আমার বশবর্ত্তী না হইবে তত দিন আমি তাহার মুখাবলোকনও করিব না।"

উমাকান্ত বলিলেন "মহারাজ, বোধ হয় কুমারের আপনাকে অমান্য করিবার অভিপ্রায় ছিল না।" পরক্ষণেই বলিলেন, "কিন্তু তাহা না হইলে সে দিবস——" এই পর্য্যন্ত বলিয়া সহসা নীরব হইলেন।

রাজা বলিলেন "নীরব হইলে যে? সে দিবস কি?"

উমাকান্ত প্রথমে বলিতে নিতান্ত অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। পরে মহারাজ দুই তিন বার অনুরোধ করাতে কহিলেন, "মহারাজ আমি দৈবাৎ ভ্রমবশতঃ বলিয়া ফেলিয়াছি। এক্ষণে আপনি এত অনুরোধ করিলে না বলিলেও আপনার আমার উপর সন্দেহ হইতে পারে।"

"তোমার কোন দোষ নাই। সে দিবস কি হইয়াছিল বল।"

"আমি এক দিবস কুমারের অন্বেষণে তাঁহার গৃহে গমন করি। তথায় কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। হঠাৎ ভূতলে পতিত এক-খানি লিপি আমার নয়নগোচর হইল, তুলিয়া দেখিলাম——মহারাজ এ অধীনকে ক্ষমা করুন।"

রাজা অধীর হইয়া কহিলেন, "উমাকান্ত, তুমি সে কুলাঙ্গার অপেক্ষাও মন্দ। লিপি মধ্যে কি দেখিলে বল।"

উমাকান্ত কোন উত্তর না করিয়া বস্ত্র মধ্য হইতে একখানি লিপি বাহির করিয়া রাজার হস্তে অর্পণ করিলেন। রাজা পত্রখানি খুলিয়া দেখিলেন, কুমারের নামাঙ্কিত মোহর পত্রে সন্নিবেশিত রহিয়াছে।

"মহারাজাধিরাজ অম্বরপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত মানসিংহ
শ্রীচরণকমলেষু।

মহারাজ! আপনার পত্র পাইয়া সমস্ত সমাচার অবগত হইলাম। আপনি যে আমাকে আপনার আগামী গুপ্তসভাধিবেশনে আহ্বান করিয়াছেন, ইহাতে যথেষ্ট আপ্যায়িত হইলাম। কিন্তু আমার পিতা জীবিত থাকিতে যে আমি প্রকাশ্যে আপনার দলভুক্ত হই ইহা সম্ভব বোধ হয় না। আপনি যদি উদয়পুরের সহিত যুদ্ধ করিয়া আমাকে এ রাজ্যের সিংহাসনে বসাইতে পারেন, তাহা হইলেই আমি আপনার সাহায্য করিতে পারি। আর মোগল সম্রাটদিগের সহিত ভবদ্বংশীয় কন্যাদিগের পরিণয় হইয়াছে ইহাতে আমার কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। আপনি তজ্জন্য চিন্তান্বিত হইবেন না। আমার পূর্ব্বপুরুষ

সঙ্গ মহারাজ শতাধিক মুসলমান কন্যাকে বিবাহ করেন। আমিও তাঁহার ন্যায় এক মুসলমানীর প্রণয়ে বদ্ধ হইয়াছি। মানস করিয়াছি যে, তাহার প্রাণিগ্রহণ করিব। সুতরাং এ বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। আমার সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক করিয়া দিলে আমার ও আপনার উভয়েরই মনোরথ পূর্ণ হইবে। ইতি।

একান্ত বশম্বদ,

অযোধ্যাসিংহ।"

রাজা পত্রের শিরোভাগ দর্শন করিয়াই ভ্রূকুটি করেন। ক্রমে যত পড়িতে লাগিলেন, ততই ক্রোধান্ধ হইতে লাগিলেন। মুখ রক্তিমা বর্ণ হইল। নয়নদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। পাঠ সমাপ্ত হইলে পত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া দূরে নিক্ষেপ করতঃ বলিলেন — "অদ্যাবধি সে নরাধমকে একেবারে ত্যাগ করিলাম। উমাকান্ত সকলকে সতর্ক কর, কেহ যেন আমার সম্মুখে তাহার নামোল্লেখও না করে।"

উমাকান্ত কপট দুঃখ প্রকাশ করিয়া মহারাজের পদতলে পতিত হইলেন।

"মহারাজ এমন নিদারুণ দণ্ড প্রদান করিবেন না। সন্তানের প্রতি নির্দ্দয়—"

রাজা ক্রোধভরে কহিলেন "তুমি যদি এক্ষণেই ক্ষান্ত না হও, তাহা হইলে তোমাকেও ত্যাগ করিব?"

উমাকান্ত দেখিলেন মনস্কাম সিদ্ধ হইল। আস্তে আস্তে গাত্রোত্থান করিয়া মৌনভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

রাজা বলিলেন—"এক্ষণে তুমি গমন কর। আমি ক্ষণকাল একাকী থাকিতে মানস করিতেছি।"

উমাকান্ত তৎক্ষণাৎ প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। বাহ্যিক অত্যন্ত বিষণ্ণভাব ধারণ করিলেন বটে, কিন্তু মনে আনন্দের সীমা রহিল না।

ক্রমশঃ—

বসন্ত-প্রভাত।

তামরসচ্ছন্দঃ।

।।।। ৬। । ৬ ।। ৬৬

ভুবন সুশোভন মত্ত বিলাসে,
উদিত নবারুণ চারু বিভাসে;
শতদল মেলি সরোজ বিকাশে,
মলয় সমীরণ মুগ্ধ সুবাসে।

বন-লতিকাগণ মোহন রাজে,
অভিনব অম্বর সুন্দর সাজে;
কুমুদ বিয়োগিত কুণ্ঠিত লাজে
নিরখি নিলাজুক দীধিতি-রাজে।

মুকুলিত মাধবিকা সহকারে
প্রিয়জন-রঞ্জন যৌবন-ভারে;
মিলয়ি কিশোর বিভোর বিহারে,
বিরহি-হৃদম্বুজ শেল বিদারে।

রসময় নীরস-পাদপমালে
তরুণ বিনোদন মঞ্জরি-জালে;
বিবিধ-বিহঙ্গ-সুরঞ্জিত ডালে
সুমধুর গীতি-সুধারস ঢালে।

ললিত বিশাল রসাল-নিকুঞ্জে
মধুর মধুব্রত গন্‌গন গুঞ্জে
কল কল গাবল কোকিল-পুঞ্জে
মধুরস অন্তর-কুঞ্জর ভুঞ্জে।

বিকসিত পঙ্কজ সৌরভ-দানে
অবিরল মানস-সারস হানে;
কমল বিকস্বর বঙ্ক বয়ানে,
প্রিয়তম-আস্য সুভাস্য পরাণে।

পারিবারিক সংস্কার।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদিগের সমাজের কতকগুলি নিয়ম পরিবর্ত্তন না করিলে বঙ্গমহিলাদিগের সম্যক উন্নতি আশা করা যাইতে পারে না। কিন্তু সমাজ সংস্কার করিবার পূর্ব্বে, পারিবারিক সংস্কার করা অতীব কর্ত্তব্য, এবং উহা অনেকটা আমাদিগের সাধ্যাধীন। বস্তুতঃ পারিবারিক সংস্কার না করিয়া সমাজ সংস্কার করা, বৃক্ষমূল চ্ছেদ করিয়া তাহার অগ্রভাগে বারি সিঞ্চন করা, দুই সমান।

অনেক সুশিক্ষিত যুবকের মুখে প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের পারিবারিক সুখ নিতান্ত অল্প। তাঁহারা বলেন যে, সংসারতাপে সন্তপ্ত হইয়া কোথায় পরিবারের মধ্যে যাইয়া হৃদয় মন শীতল করিব, না তাহা একবারে ক্লেশে জর্জ্জরীভূত হইতে থাকে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী ও ভার্য্যার সহিত একত্রে বসিয়া যদি নানা বিষয়ের আলোচনা করিতে না পারিলাম, যাহাদিগকে জগতে শান্তির সলিল সিঞ্চন করিবার জন্যই ঈশ্বর প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাদিগের সহিত যদি সর্ব্বদা মধুরালাপ করিতে না পারিলাম, তবে পৃথিবীর মধ্যে নির্ম্মল সুখ আর কোথায় পাইব। কোথায় পিতা দুহিতাকে সারগর্ভ উপদেশ দান করিবেন, কোথায় মাতা পুত্রকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিবেন, কোথায় ভ্রাতা ও ভগিনী স্নেহরজ্জুতে সুদৃঢ়বদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের হৃদয় মনের উৎকর্ষ সাধন জন্য সতত সচেষ্ট থাকিবে, কোথায় পবিত্র প্রণয়নিবদ্ধ নবদম্পতী পরস্পর পরস্পরের সহিত হৃদয় বিনিময় করিয়া প্রীতির সুনির্ম্মল সলিলে দিবসরজনী সুখে সন্তরণ করিবে, তাহা না হইয়া, কেবল শয়ন করিবার সময় ব্যতীত তাহাদিগের আর আলাপ করিবার সুবিধা নাই। যখন আমরা বলিতেছি যে, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ ইত্যাদি পরিজনবর্গ একত্রে বসিয়া কথোপকথন করা উচিত, তখন আমাদের ইহা বলিবার উদ্দেশ্য নহে যে, স্ত্রীলোকেরা একবারে লজ্জায় জলাঞ্জলি দিক্। ইহা আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, বিশুদ্ধ লজ্জা অপেক্ষা কুলনারীবর্গের প্রিয়তর আভরণ আর কিছুই নাই। কুলনারীগণ স্ব স্ব হৃদয়ে যে কার্য্যকে লজ্জাকর বলিয়া অবজ্ঞা করেন, তাদৃশ কার্য্যে আমরা তাহাদিগকে প্রবর্ত্তিত হইতে বলিতেছি না। কুলবধূগণ ঊর্ণনাভের তন্তুর ন্যায় সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করিয়া লোকসমাজে উপস্থিত

হইলে, অথবা কদর্য্য অশ্লীল নৃত্যগীতস্থলে গমন করিলে, আমরা তাহাদিগকে নির্ল্লজ্জা বলি না, কিন্তু অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া পরিজনবর্গের সহিত কথোপকথন করিলেই, আত্মীয় স্বজনের সহিত সাধুভাবপূর্ণ গ্রন্থ পরম্পরা আলোচনা করিলেই যে, কেন তাহাদিগকে প্রগল্‌ভা বলিয়া তিরস্কার করা হইবে, ইহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

আমাদের মহিলাবর্গের বর্ত্তমান অবস্থা বহুগোষ্ঠী একত্রিত থাকিবার অনিবার্য্য ফল। বহুগোষ্ঠী একত্র অবস্থানের পদ্ধতি যে নিতান্ত দূষণীয় তাহা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে উহা একবারে দোষশূন্য নহে। বহুগোষ্ঠী একত্র অবস্থানের বর্ত্তমান পদ্ধতি অবলাদিগের উন্নতির পক্ষে প্রধান বিঘ্নস্বরূপ। সেই বর্ত্তমান পদ্ধতি কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। যদি আমরা সুখে স্বচ্ছন্দে বহুগোষ্ঠী একত্রিত থাকিতে ইচ্ছা করি, তবে স্ত্রীলোকদিগকে সুশিক্ষিত করা ও বাল্যবিবাহ একবারে উঠাইয়া দেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। নারীবর্গ সুশিক্ষিত হইলে পরিবারের মধ্যে কলহের হ্রাস ও সুখস্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইবে; এবং পুরুষদিগকে অর্জ্জনক্ষম হইলে বিবাহসূত্রে বদ্ধ করিলে তাহাদের স্ত্রী পুত্রগণকে অন্যের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইবে না। পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা গৃহস্বামিকে সর্ব্বেসর্ব্বা জ্ঞান করিতেন, কিন্তু এক্ষণে দাম্পত্যপ্রণয়ের আধিক্যবশতঃই হউক বা অন্য কারণে হউক, তাহারা সেইরূপ জ্ঞান করে না। আমাদের এক একবার মনে হয় যে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগকে সম্পূর্ণরূপে অধীনতাশৃঙ্খলে নিবদ্ধ করিবার নিমিত্তই যেন বাল্যবিবাহ প্রচলিত করিয়াছিলেন। তৎকালীন লোকদিগের বুদ্ধির অপ্রতুল ছিল না। পশুপক্ষীদিগকে পোষ মানাইতে হইলে বৎসবেলা ধরিতে হয়, ইহা তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন। বধূদিগের পক্ষেও সেই পদ্ধতি খাটাইলেন। পুরুষ শাস্ত্রকারেরা নিয়ম করিলেন যে, কন্যার বয়ঃক্রম যত অল্প হইবে, কন্যাদানের ফল তত অধিক হইবে, এবং অবিবাহিতা কন্যা রজস্বলা হইলে পূর্ব্বপুরুষ নিরয়গামী হইবে। গৃহিণীরা নিয়ম করিলেন যে, বধূদিগের কথা কহা ও অবগুণ্ঠন মোচন নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম। বস্তুতঃ অনেক গৃহিণী বধূদিগকে দাসী ভিন্ন আর কিছুই মনে করেন না। বিবাহিত পুরুষমাত্রেই অবগত আছেন, যে বিবাহযাত্রার সময়, "কি আনিতে যাইতেছ" মাতার এই

প্রশ্নের, বর কি উত্তর দান করেন। যে বধূ গৃহিণীর বৈধ বা অবৈধ আজ্ঞা সকল পালন করে, ও দাসীর ন্যায় সর্ব্বদা খাটে, সেই বধূই তাঁহাদের মতে লক্ষ্মী। আজ্ঞা পালনে সামান্য ত্রুটি হইলে, বধূদিগকে কিরূপ বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। এইরূপ ব্যবহারে বধূরা কখনই সন্তুষ্ট নহে; তাহাদের মনের আগুন মনেই থাকে এবং সময় পাইলে জ্বলিয়া উঠে। যখন গৃহিণীর ক্ষমতার হ্রাস হইয়া আইসে, এবং যখন পুত্রের উপর সংসারের ভার পড়ে, তখন বধূরা আপনাদের ঝাল ঝালিয়া লয়। আমরা এস্থলে অলীক বাক্যব্যয় করিতেছি না। নারীবর্গের দুরবস্থা ভারতচন্দ্র এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন;—

ঘরে গিয়া আর, কি দেখিব ছার,
মিছার সংসার।
শাশুড়ী সাপিনী, ননদী বাঘিনী,
সতিনী বিষেরভরা।

ভারতচন্দ্র একশত বৎসর পূর্ব্বে নারীদিগের অবস্থা যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে এখনও আছে।

বঙ্গমহিলাদিগের পূর্ব্বোক্তপ্রকার শোচনীয় অবস্থার, অপর একটী কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রাচীনদিগের হৃদয়বিদারক প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস ও অবজ্ঞাই তাহার প্রধান কারণ। "বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্য স্ত্রীষু," "ভোজনে দ্বিগুণ, কামে অষ্ট গুণ," ইত্যাদি এমন ভয়ানক অপ্রাকৃত ও জঘন্য উক্তি তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগের প্রতি করিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিলে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ে ক্রোধের উদ্রেক না হয়? তাঁহারা মনে করিতেন যে, জ্ঞান ও ধর্ম্মে সর্ব্বোচ্চ আকাশ পুরুষদিগের মনের প্রকৃত নিবাসস্থান; নারী-হৃদয় কেবল শঠতা, খলতা ও চপলতায় পরিপূর্ণ, সাধুতার লেশমাত্র নাই। কি ভ্রম! নারীহৃদয় যে পবিত্রতা, কমনীয়তা, মধুরতা, সহিষ্ণুতা ও মৃদুশীলতায় পরিপূর্ণ নহে, প্রত্যুত তাহাদের স্বভাব খলতা, ও চাঞ্চল্যের আধার, তাহা আমরা কখনই বিশ্বাস করিতে পারিনা। আমাদের এই সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, যদি পৃথিবী অদ্যাবধি পাপপঙ্কে একবারে নিমজ্জিত না হইয়া থাকে, নারীহৃদয়ের স্বাভাবিক কমনীয়তা ও পবিত্রতাই তাহার একমাত্র কারণ।

বাস্তবিক পরিজনবর্গের প্রতি কুলবধূদিগের লজ্জার কোন কারণ

দেখা যায় না। শ্বশুর ও শ্বশ্রূমাতা জনকজননীতুল্য।, স্বামীর ভ্রাতা ও ভগিনীগণ সহোদর ও সহোদরার ন্যায় হিতাভিলাষী ও স্নেহকারী সুহৃৎ। যখন বধূগণ পরিবারের মান অপমানের চিরভাগী, সুখদুঃখের চিরসঙ্গী, তখন কন্যাগণ পিত্রালয়ে যেরূপ ভাবে অবস্থান করে, বধূরাও শ্বশুরালয়ে সেইরূপ থাকিবে, ইহা আমাদিগের আন্তরিক অভিলাষ। আর পুরুষেরা যাহাদিগের সহিত পবিত্র প্রেমের সুদৃঢ় শৃঙ্খলে চিরদিনের জন্য বদ্ধ হইয়াছেন, একমাত্র যাহাকে সহায় করিয়া এই সংসাররূপ সমুদ্র সন্তরণ করিতে সংকল্প করিয়াছেন, তাহাদের সহিত রাত্রি ভিন্ন সাক্ষাৎ হইবে না, দিবসে কথা কহিলে কুলবধূদিগকে নির্লজ্জা বলিয়া তিরস্কার করা হইবে, এরূপ অন্যায় পদ্ধতির আমরা অনুমোদন করিতে পারি না।

কেবল স্বার্থপর হইয়া আমরা এতগুলি বাক্য ব্যয় করিলাম না। আমরা নারীজাতির উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বলিতেছি। পরস্পর কথোপকথনে ও একত্র মিলনে যে কেবল পুরুষদিগেরই উপকার হইবে এমত নহে। ইহাই আমাদের মহিলাবর্গের উন্নতির একমাত্র উপায়। আমরা জ্ঞানী বর্ষীয়ান্ লোকের নিকট গমন করিয়া হৃদয়ের উন্নতি করিতে পারি; এবং সমবয়স্ক বন্ধুবর্গের সহিত কথোপকথন করিয়া বিশুদ্ধ আমোদ লাভ করিতে পারি; কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠে না। কলহ পরনিন্দা, কুৎসিৎ বিষয়ের আলাপ, পুতুলের বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় তাহারা তাহাদিগের বিশ্রাম সময় অতিবাহিত করেন। কেহ বা জঘন্য নাটকাদি পড়িয়া কালাতিপাত করেন। ঐরূপ জঘন্য পুস্তক পাঠ হইতে নিবারণ করিতে, অথবা অন্য কি উপায় দ্বারা বিশুদ্ধ আমোদ লাভ করিতে পারা যায়, সে বিষয়ে উপদেশ দিতে কেহই নাই। যখন দশ বৎসর যাইতে না যাইতেই বালিকাদিগকে বিদ্যালয় হইতে অপসৃত করা হয়, তখন নিজ পরিবারস্থ সুশিক্ষিত পুরুষের সাহায্য বিনা স্ত্রীলোকেরা কিরূপে সম্যক্‌রূপে বিদ্যাশিক্ষা করিতে সক্ষম হইবে। দশম বর্ষে পাঠসাঙ্গ করিয়া, অবগুণ্ঠিত বধূ শ্বশুরালয়ে যদি শ্বশুর, ভাশুর, দেবর প্রভৃতি গুরুজনের নিকট শিক্ষালাভ করিতে না পারে, তবে তাহাদিগের বিদ্যাশিক্ষার অন্য উত্তম উপায় আর কি হইতে পারে? এই জন্যই আমরা বলি যে, যদি অবলাগণের প্রকৃত উন্নতি সাধনে কাহারও আন্তরিক বাসনা থাকে, তবে স্ত্রীলোকদিগকে পরিবারের মধ্যে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এইরূপ

মানব-হৃদয়ের যাহা কিছু উচ্চতা সকলই প্রদর্শিত হইয়া আসিতেছে; সেই দোষ কণার দ্বারা ছিদ্রান্বেষীগণের কম্পনা ক্রুদ্ধ হওয়া ব্যতীত এ পর্য্যন্ত সমাজের কোনো বিশেষ অনিষ্ট হইতে দেখা যায় নাই! ফলতঃ সেই সেই মহা প্রতিভা-প্রসূত গ্রন্থাবলীর উক্ত দোষ জন্য সমাজে কোনো রূপ পাপ প্রবল হইয়াছে, এমন কথা উন্মত্ত ব্যতীত আর কেহই বলিবে না—কেননা, তাহা সমূলক নহে! তবে সেই দোষ যে একবিধ দোষ তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু অতি যৎসামান্য দোষের অনুরোধে মহোপকারী মহা মহা গুণময় গ্রন্থকে পরিত্যাগ করিতে বলা, আর চন্দ্রে কলঙ্ক আছে অতএব চন্দ্রকে দেখিব না—চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় বাহির হইব না—চন্দ্রের নাম মুখে করিব না বলা উভয়ই তুল্য!

সেই দোষ হইতে সমাজের প্রকৃত কোনো বিশেষ অনিষ্ট যে ঘটিতে পারেনা, ইহা আমরা সময়ান্তরে আলোচনা করিতে চেষ্টা পাইব। অদ্য স্থানাভাব বশতঃ সুদ্ধ যে সংবাদ জ্ঞানার্থ এই প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করা গিয়াছে তাহা বলিয়াই ক্ষান্ত হইব।

আমাদিগের সহৃদয় ও সমহৃদয় পাঠক মণ্ডলী শুনিয়া অবশ্যই দুঃখিত হইবেন, যে, অশ্লীলতানিবারক যোদ্ধৃ মহাশয়দিগের কোপ প্রথমেই ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের উপর প্রপতিত হইয়াছে। সে দিবস বটতলার কতিপয় পুস্তক বিক্রেতাকে ঐ পুস্তক বিক্রয়াপরাধে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তাহারা জামিন দিয়া খালাস হইয়া আসিয়াছে, অতি শীঘ্র মোকদ্দমা হইবে। শুনিতেছি, পুস্তক বিক্রেতাগণ চান্দা তুলিতেছে—তাহাদিগের স্বশ্রেণী ব্যতীত দেশস্থ অনেক লোকে না কি তাহাদিগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছেন। বিস্তর উচ্চ প্রকৃতির বাঙ্গালী—সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র—যাঁহারা অশ্লীলতাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অনেকেও ঐ দায়গ্রস্ত দোকানদারদিগের প্রতি দয়া ও আনুকূল্য বিতরণে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। তাঁহারা বলেন যদি বিদ্যাসুন্দর ত্যজ্য হয়, তবে সেক্সপীয়ার, বাইরণ, ফিলডিং, সুইফ্‌ট্, রেনাল্ড্, কালীদাস, কাশীরাম দাস, কবিকঙ্কণ, প্রভৃতি কাহারো গ্রন্থ পাঠ্য হইতে পারেনা! "ঠক বাছিতে গাঁ ওজড়!" তবে ভূমণ্ডল এককালে প্রায় প্রকৃত কাব্য গ্রন্থে বঞ্চিত হয়—তবে আর প্রায় কোনো সৎপ্রতিভার চিহ্ন মাত্রও থাকে না!

কেহ কেহ বলেন, সেই সকল গ্রন্থের যে যে ভাগ দূষ্য, তাহা পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক কেবল ভাল ভাল অংশ প্রচারিত হউক। কিন্তু এরণ্ড তৈল বা শর্করা প্রভৃতি পদার্থের ন্যায় সে সমস্ত কাব্যকে "রিফাইন" করিবার প্রক্রিয়া ও যন্ত্র অদ্যাপি প্রস্তুত হয় নাই! এক স্তর তিল এক স্তর ফুল; আবার এক স্তর তিল, আবার এক স্তর ফুল"; ইতি প্রণালীতে প্রস্তুতীকৃত সুরভি তিল-তৈল মধ্যে যদি কোনো অসদাঘ্রাত ফুলের রস প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তবে কোন্ রাসায়ণিক তাহা হইতে সেই রস বিশ্লিষ্ট করিতে সমর্থ হয়?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্থানাভাবে অদ্য এ বিষয়ের অধিক আলোচনা করিতে পারিব না, সুতরাং এই পর্য্যন্ত বলিয়াই কিসে কি দাঁড়ায় তদ্দর্শনের অপেক্ষায় রহিলাম।

দুর্ভিক্ষ।

দৈব প্রতিকূলতা বশতঃ অস্মদ্দেশে ঘন ঘন অন্নাভাবরূপ প্রজানাশক ব্যাপার সংঘটিত হইতে লাগিল। লক্ষণে বোধ হইতেছে এ বৎসরের দুর্ভিক্ষ যেরূপ ভয়ানক রূপে ব্যাপক, এমন আর শীঘ্র দেখা যায় নাই। আমাদিগের ছোট কর্ত্তার অন্য যত কিছু দোষ থাকুক, এ বিষয়ে তাঁহার সতর্কতা ও কার্য্য তৎপরতা দেখিয়া আমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়াছি। উড়িষ্যার নরহত্যা স্মরণ সময়ে কর্ত্তৃপক্ষের অনবধানতা ও তাচ্ছিল্য-জনিত মর্ম্ম বেদনা আমাদিগকে চিরকাল দগ্ধ করিবে। এবারে কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ মনোযোগে আশা হইতেছে, সেরূপ শোচনীয় বিষাক্ত ফল না ফলিতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ সম্পূর্ণ রূপে বিপদ কাটিয়া না যাইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধন্যবাদ, অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতাদি প্রকাশের সময় নয়।

ছোট কর্ত্তাকে পশ্চাৎ ফেলিয়া লর্ড নর্থব্রুক স্যার রিচার্ড টেম্পল বাহাদুরকে দুর্ভিক্ষ-রণে অগ্রবর্ত্তী করাতে অনেকে অনেক কথা বলিতেছেন। কেহ বলেন, স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল যে সব রিপোর্ট ছাপিতেছিলেন, তৎ প্রতি বড় কর্ত্তার সম্যগ্ বিশ্বাস না হওয়াতেই তিনি টেম্পল সাহেবকে অতিরিক্ত ক্ষমতা দিয়া ঘটনাস্থলে পাঠাইলেন। কেহ কহেন, টেম্পল সাহেব ছোট কর্ত্তার বিজ্ঞাপনকে অমূলক ভয় প্রদর্শক বোধে বড় কর্ত্তাকে বলেন যে "আমাকে নিযুক্ত করুন, আমি স্বচক্ষে দেখিয়া ইহার অমূলকতা প্রতিপাদন করিয়া দিব।" কিন্তু এক্ষণে তিনি অন্নহীন অঞ্চলে স্বয়ং গিয়া যাহা দেখিতেছেন, তাহা পূর্ব্ব বিজ্ঞপ্ত বিবরণাপেক্ষাও গুরুতর! এখন তাঁহার হাসির পরিবর্ত্তে কান্না বাহির হইতেছে! আবার কেহ বলেন, ছোট-কর্ত্তা কেবলই বিজ্ঞাপন করেন, কাজে কিছু উত্তমতা দেখাইতে পারিতেছিলেন না, এই নিমিত্তই বড়কর্ত্তা তাঁহাকে রহিত করিয়া টেম্পল সাহেবকে প্রেরণ করিলেন।

এ সব কথার আন্দোলন এখন আমদের ভাল লাগিতেছে না। মগ্ন প্রায় ব্যক্তিতো অগ্রে তীরে উত্তোলিত হউক, তৎপরে কাহার কি পরিমাণে বাহাদুরী বিচার করা যাইবে। আমরা ইহাই বুঝি, বড় কর্ত্তা যে কারণে টেম্পল সাহেবকে প্রেরণ করুন, তাঁহার দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধির পূর্ণতা হইলেই হইল। টেম্পল সাহেব বেহারাঞ্চলে যাওয়াতে

পাপ স্রোত-উৎকোচে পতন, হয়েছিল ব্রিটনীয়াগণ;
করিত লোক পীড়ন, করিত ধন শোষণ,
রাজশক্তি সঞ্চালনে পাপ উপার্জ্জন,
ধিক্ পাপীর জীবন। ১৫

নিবারি সে পাপ প্রবহণ, করেছি কি অযশ অর্জ্জন?
জাফর মরণকালে, ছয় লক্ষ টাকা দিলে
অনাথ সৈনিক শালা করিয়া স্থাপন,
হয়েছি কি দোষে নিমগণ? ১৬

করেছিনু লোভ সম্বরণ, লোভে কিছু করিনি গ্রহণ,
শেঠগণ কাশীপতি, অযোধ্যার নরপতি,
উপহার দিয়েছিল যে সব রতন,
রাজদুর্ল্লভ সে ধন। ১৭

করিলাম সে লোভ বারণ, তবু আমি দোষের ভাজন?
মূর্খ ব্রিটন সন্তান, নাহি হিতাহিত জ্ঞান,
কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে কদাচন;
অকৃতজ্ঞ নরাধমগণ। ১৮

থাকিব না এহেন ধরায়, নিশ্চয় ত্যজিব এই কায়;
সকলের হেয় হয়ে, কি ফল আছে বাঁচিয়ে?
অনাদরে ধরা মাঝে বাঁচিতে কে চায়?
মৃত্যু! নাও গো আমায়। ১৯

দ্বেষভরা এই ধরাতলে, থাকিব না যাব সেই স্থলে
যথা নাহি দ্বেষলেশ, নাহি কিছুমাত্র ক্লেশ,
চির সুখভোগে যথা পুণ্যাত্মা সকলে,
থাকি শান্তি তরুতলে। ২০

হাঁগো মৃত্যু! কি কর এখন, কর মম যাতনা মোচন;
এস এস সহচরী; তোমায় সহায় করি,
সুখেতে গমন করি পিতার সদন—
যিনি জগত-পাবন। ২১

জয়দেবপুর,
ঢাকা। } শ্রীমতী কৃ—দেবী।

বঙ্গমহিলা।

প্রকাশিতের পর।

কবিকঙ্কণ কোন্ সময়ে গ্রন্থ রচনা করেন, বর্ত্তমানে তাহার বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, তাঁহার সময়ে বঙ্গমহিলার অবস্থা উৎকৃষ্ট ছিল না। অথবা কেবল কবিকঙ্কণের সময়ে কেন, মুসলমান-অধিকার বা আর্য্যরাজগণের ক্ষয়সময়ে ভারতবর্ষের কোন স্থানেই স্ত্রীলোকের অবস্থা উৎকৃষ্ট ছিল বলিয়া বোধ হয় না। অথবা কেবল ভারতবর্ষ কেন, কোন জাতির ক্ষয়দশা উপস্থিত হইলে, সে জাতির পুরুষদিগের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে সে জাতির স্ত্রীলোকদিগের অবনতি হইয়া থাকে। তখন পুরুষেরা পৌরুষহীন ও স্ত্রীলোকেরা প্রণয়িনীর পবিত্র ভাব পরিহার করিয়া পুরুষদিগের ইন্দ্রিয়সেবার অধীন হইয়া থাকে। বিশেষ এই যে, ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকের দাসীভাব প্রথম হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়। বহুবিবাহ প্রথম হইতেই ভারতবর্ষে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব স্ত্রীলোকের মান ভারতবর্ষে প্রথম হইতেই হীন ছিল বলিতে পারা যায়। মনু প্রভৃতি ব্যবস্থাকারেরা জিতেন্দ্রিয়তার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের না হউক, ক্ষত্রিয় প্রভৃতির বহুবিবাহ মনুর সময় হইতেই চলিত বলিয়া বোধ হয়। গুণের বিষয় এই যে, মনুর সময়ে মদ্যপায়িতা বা স্বৈরাচার প্রভৃতি বিলাসিতার তাদৃশ উপদ্রব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু তাহার পরে ভারতসমাজ সে বন্ধন অতিক্রম করিয়াছিল। মনুর সময়ে সমাজে মদ্য বিক্রয় করিলে বিক্রেতাকে নির্ব্বাসিত ও মদ্যপায়ীকে জাতিচ্যুত হইতে হইত, কিন্তু যদুবংশের প্রাদুর্ভাব সময়ে ঐ মদ ভারতসমাজে বহুচলন হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। তখন পুরুষেরা ইন্দ্রিয়পরের একশেষ হইয়াছিল এবং স্ত্রীলোকেরা তাহাদের চরিতার্থতার সর্ব্বপ্রধান

উপকরণ হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়। কবিবর মাঘ ক্রমাগত দশ সর্গে বিলাসী ও বিলাসিনীদিগের মদ্যপানাদি বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদের দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয় যে, মাঘের সময়ে পুরুষমাত্রেই বেশ্যাসক্ত ও স্ত্রীমাত্রেই বেশ্যা হইয়াছিল। প্রণয় পরম পবিত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু ইন্দ্রিয়সেবা নরক বলিতে হইবে। অতএব যে স্ত্রী স্বামীর প্রণয়ভাজন না হইয়া তাহার ইন্দ্রিয়-সেবায় নিযুক্ত হইয়া থাকে, আমরা তাহাকে বেশ্যা বা হতমান দাসী বলিয়া মনে করিয়া থাকি।

ফলতঃ আর্য্যজাতির চরমদশায় ইন্দ্রিয়পরতার ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, এবং মুসলমানেরা ভারতবর্ষ অধিকার করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ বিলাস অধিকার করে। উহাদের চরমদশায় ঐ বিলাস পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। নূরজাহান প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগকেও আপাততঃ দেখিলে জাহাঙ্গীর প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দাসদিগের দাসী বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে। কবিকঙ্কণ প্রভৃতিরা মুসলমানদিগের শেষ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহাদের সময়ে বঙ্গমহিলারা যে সকল বিষয়েই হীনাবস্থ হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি। তখন পুরুষেরা পরস্ত্রীতে প্রীতিমান হইলে সমাজের চক্ষে তাহাদের মর্য্যাদা হানি বা কলঙ্ক হইত না। তখন "দুয়ো ও সুয়োর" ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তখন পুরুষেরা স্ত্রীদিগের প্রতি সাতিশয় নিষ্ঠুর ও গ্রাম্য ভাবে ব্যবহার করিত। "সুয়ো" "দুয়োকে" ধরিয়া প্রহার করিতেছে, পুরুষপ্রবর তাহাতে বিচলিত না হইয়া পরিহাস প্রয়োগ করিতেছেন। আমরা প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থকারদিগের রচনায় এইরূপ ব্যাপার অনেক দেখিতে পাই। শ্রীমন্ত বিদেশে গমন করিয়াছিলেন, তিনি তথায় পরস্ত্রীতে আসক্ত হইয়া স্ত্রীপরিবার সমুদায় বিস্মৃত হইয়াছিলেন। বাটীতে আসিলে সুয়ো একবার অভিমান প্রকাশ করিলেন এবং দুয়ো একবার অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিয়া হৃদয়ের বেদনা জানাইলেন। অনন্তর ক্ষণকাল পরেই

স্বামীর সমুদায় নিষ্ঠুরতা বিস্মৃত হইয়া গেল। অথবা কবিকঙ্কণের সময়ে কেন, এখনও অনেক পুরুষ এরূপ দেখা যায় যাহারা পরস্ত্রী-হরণ গৌরবের ব্যাপার বলিয়া মনে করে এবং যাহাদের স্ত্রীরা স্বামীর ঐরূপ পাপকে পুরুষ-সুলভ রসিকতা বা বিলাস ভাবিয়া মার্জ্জনা করিয়া থাকে।

আমরা "সুয়ো ও দুয়োর" উল্লেখ করিয়াছিলাম। এক্ষণে উহার বিস্তৃত বর্ণনা করিতেছি। কিছুদিন হইল বাঙ্গালাদেশে সুয়ো এবং দুয়োর ভয়ানক প্রাদুর্ভাব ছিল। আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে সুয়ো দুয়োর ব্যাপার তিন প্রকার ছিল বলিয়া বোধ হয়। প্রথম প্রকার সুয়োপত্নীর হস্তে বাটীর সমুদায় ভার সমর্পিত হইত। দুয়ো তাহার দাসী হইয়া থাকিত। অথবা তাহার অবস্থা দাসীর অপেক্ষাও অধম ছিল বলিয়া বোধ হয়। রন্ধনাদি উচ্চতর গৃহস্থব্যাপারের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ থাকিত না। তাহাকে ছিন্নবসন পরিধান করিতে হইত, পরিবারের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে হইত, গোয়ালঘরে কলাপাত পাতিয়া আহার করিতে হইত। কবিকঙ্কণ বলেন যে, শ্রীমন্তের খুল্লনা নামক দুয়ো পত্নীকে সুয়োর আদেশে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ছাগল চরাইতে হইত এবং বেলাবসানে বাটী আসিয়া সুয়োর হস্তে প্রহারাদি সহ্য করিতে হইত। কবিকঙ্কণ খুল্লনার বার মাসে বার প্রকার দুঃখ বর্ণনা করিয়াছেন। পাঠক ঐ সকল স্থান পাঠ করিলে সাতিশয় বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় প্রকার সুয়োর হস্তে বাটীর কর্ত্তৃত্ব ভার সমর্পিত হইত না। তবে তাহার বেশভূষা দুয়োর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইত সন্দেহ নাই। সে স্বামীর নিকট অনবরত দুয়োর কুৎসা কীর্ত্তন করিত এবং স্বহস্তে প্রহারাদি না করিয়া স্বামীকে দিয়া ঐরূপ প্রহারাদি করাইত। আমরা এপ্রকার দুয়োর অবস্থাকে পূর্ব্বোক্তের অপেক্ষাও কষ্টকর ভাবিয়া থাকি। কারণ বরং সপত্নীর প্রহার সহ্য করা যায়, তথাপি স্বামীর প্রহার সহ্য করা যায় না।

তৃতীয় প্রকার দুয়োকে প্রহারাদি সহ্য করিতে হইত না, তবে প্রণয়ের তারতম্য স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে হইত।

সুয়ো ও দুয়োর নানাপ্রকার শ্লোক শুনিতে পাওয়া যায়, অথবা বঙ্গমহিলারা সচরাচর যে সকল শ্লোক কহিয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশই সুয়ো দুয়োর গল্পে পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। ও সকল গল্পের আবৃত্তি করিলে আমাদের স্বল্প-কলেবর পুস্তক ধারণ করিতে পারিবে না। উপসংহারকালে আমরা কেবল এই মাত্র বলিতে চাই যে, রমণী কেবল রূপবতী হইলেই স্বামীর মতে সুপত্নী হইতে পারিত না। পিতৃকুলের মর্য্যাদা ও অবন্ধ্যতাই অনেক স্থলে স্ত্রীলোকের সুপত্নীতা সম্পাদন করিত। আমাদের সময়ে রূপবতী হইলেই স্ত্রীলোকের আদর যথেষ্ট হয়, কিন্তু পূর্ব্বকালে নীরোগ, অবন্ধ্যা ও কুলবানের কন্যা না হইলে স্ত্রীলোকের আদর হইত না।

আমরা গল্প করিতে করিতে সঙ্কটস্থলে উপস্থিত হইয়াছি। কারণ আমরা যদি এস্থলে বলি যে, বঙ্গমহিলার অবস্থা বর্ত্তমানে উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলে পিতৃগণের অবমাননা করা হয়; আর যদি বলি যে, অনুৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলে একপ্রকার মিথ্যা বলা হয়। ফলতঃ যিনি যাহাই বলুন না কেন, আমরা অবশ্য সাহস করিয়া বলিব যে, পূর্ব্বকালে বঙ্গমহিলার দাসীভাব অতিরিক্ত ছিল। স্ত্রীদিগের প্রতি স্বামীদিগের যে ব্যবহার ছিল, তাহা অনেকস্থলেই অন্যায় বা অযথোচিত ছিল বলিতে হইবে। মনু কহিয়াছেন যে, যে গৃহে স্ত্রীলোকের অনাদর হয় তাহা লক্ষ্মীর অভিমত নহে, অতএব আমরা যদি স্ত্রীলোকের আদর অবশ্যকরণীয় বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে বোধ হয় কেহ আমাদিগকে স্ত্রৈণ বলিয়া মনে করিবেন না।

স্ত্রীলোককে অবমান কেন, স্ত্রীলোককে অবিশ্বাস করাও বঙ্গীয় বা ভারতীয়গণের অভ্যাস বলিয়া মনে হয়। একজন শাস্ত্রকার বলেন যে, স্ত্রীর চরিত্র ও পুরুষের অদৃষ্ট, মানুষের কথা দূরে থাকুক,

দেবতারাও বলিতে পারেন না। আর একজন বলেন যে, স্ত্রী ও গরু সমান। আর একজন বলেন যে, যে ব্যক্তি স্ত্রীকে মনের কথা খুলিয়া বলে সে জানিবে যে, তাহার কথা তৎক্ষণাৎ দেশময় প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। আর একজন বলেন যে, স্ত্রী স্বামীর প্রতি ততক্ষণ প্রীতিমতী থাকে, যতক্ষণ সে অন্য পুরুষ না দেখিতে পায়। আর একজন বলেন যে, স্ত্রী যদি সতী হয় তবে সে আপনার গুণে এরূপ হয় না, অসতী হইবার নানাপ্রকার অসুবিধা বলিয়াই ওরূপ হয়। আর একজন বলেন যে, স্ত্রীরা বাক্য হাস্য ও দৃষ্টিপাত দ্বারা এক সময়ে তিন জন পুরুষকে প্রণয় প্রদর্শন করিতে পারে। আর একজন বলেন যে নদী, নখী, শৃঙ্গী, শস্ত্রধারী, রাজপুরুষ ও স্ত্রী এই কয়েক জনকে বিশ্বাস করিও না।

এ সকল অবিশ্বাস শুনিবামাত্রই অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হয়। স্ত্রীলোক তরলহৃদয় সন্দেহ নাই এবং তরলহৃদয় বলিয়াই উহারা অনেক সময়ে সমাদর ও প্ররোচনার বশীভূত হইয়াও কর্ম্ম করিতে পারে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া যে উহারা সতীত্ব বিষয়ে পুরুষের অপেক্ষা ন্যূন হইবে, আমরা এরূপ কথা কখনই বলিতে পারি না; আর্য্যশাস্ত্রকারদিগকে আমাদের আর এক কারণেও অবিশ্বাস হয়। স্ত্রীদিগের রূপযৌবন বর্ণনায় তাঁহাদের যেরূপ অত্যনুরাগ ও অতিকামিতা প্রকাশ হইয়া থাকে, স্ত্রীদিগের দায়াদি মীমাংসাস্থলেও সেইরূপ তাহাদিগের অতি কুটিলতা ও অতি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ হইয়া থাকে। পুত্র পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ করিবে কিন্তু কন্যা কিছুই পারিবে না। পুত্র সমুদায় বিষয়ের অধিকারী হইবে কিন্তু কন্যা কিছুই পারিবে না, এ সকল কথা আপাততঃ শুনিলেই মনে হয় যে, আর্য্যেরা স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে স্বভাবতই অনুদার ছিলেন।

বঙ্গীয়েরা আর্য্যদিগের এই সকল কুটিল কথা কণ্ঠস্থ রাখিয়াছিলেন, এদিকে আবার লেখাপড়ারও ততদূর আলোচনা ছিল না, অতএব তাঁহারা স্ত্রীদিগকে যে অপকৃষ্ট দাসী বলিয়া মনে

করিবেন এবং "তুই" বলিয়া সম্বোধন করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি। ইহার পর আবার আরও এক অতি কুৎসিত আদর্শ তাঁহাদিগের গোচর হইয়াছিল। আর্য্যেরা স্ত্রীজাতিকে মানা-মান উভয়ই প্রদর্শন করিতেন, কোন কোন স্থলে অধিক করুণা করিতেন বলিয়াও মনে হয়, এমন কি ইংরাজেরা যেস্থলে ফাঁসী দিয়া থাকেন, আর্য্যেরা সেস্থলে মস্তক মুণ্ডন ও নির্ব্বাসন করিয়াই যথেষ্ট বোধ করিতেন। মুসলমানেরা স্ত্রীদিগকে দাসীবৎ ব্যবহার করিত এবং দোষস্থলে কথায় কথায় বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা উপস্থাপিত করিত। ইহাকেই আমরা অতি কুৎসিত আদর্শ বলিয়াছি। প্রাচীন বঙ্গীয়দিগের নেত্রগোচরে এরূপ আদর্শ সর্ব্বদাই উপস্থিত হইত সন্দেহ নাই। ফলতঃ এইরূপ নানাবিধ কারণেই দেশে দুয়ো ও সুয়োর প্রাদুর্ভাব ও অন্যান্য উৎপাত ঘটিয়াছিল।

অনন্তর সতীদাহের উল্লেখ করিতে হইতেছে। সতীত্ব-নাশ-ভয়ে স্ত্রীলোকের দাহ ভারতবর্ষের মধ্যে রাজপুতনায় অধিক হইত বলিয়া বোধ হয়। বঙ্গদেশে অধিক দাহ হইত না। তথাপি সতীদাহ যে উৎসাহসহকারে নির্ব্বাহ হইত, তাহাতে আর কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। স্বামী সহস্র অসৎ হইলেও তাহার সর্ব্বপ্রকার মার্জ্জনা হইতে পারিত, কিন্তু স্ত্রী সতী হইলেও তাহাকে ইহলোকেই নরকের অগ্নিযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত। একজন ইংরাজ ইতিহাসলেখক সতীদাহের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ;——

"আমি সতীদাহ একবার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দেখিলাম একটী স্ত্রীলোক স্নান করিয়া সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য সর্ব্বাঙ্গে বিলেপন করিয়াছে। সে একখান কষায় বস্ত্র পরিধান করিয়াছে। সে রোদন করিতে করিতে গমন করিতেছে। কতিপয় দুষ্ট ব্রাহ্মণ অর্থলোভে, সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতেছে। চারিদিকে হরিবোল ও হাততালির ধূম পড়িয়াছে। আপাততঃ দেখিলে বোধ হয় যে, স্ত্রীলোকটা নিতান্ত অনিচ্ছায় গমন করিতেছে এবং পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা তাহাকে যেন টানিয়া লইয়া যাইতেছে। যেস্থলে দাহ হইবে আমি সেইস্থলে উপস্থিত ছিলাম, দেখিলাম একটা প্রকাণ্ড চিতা প্রস্তুত হইয়াছে। দুরাত্মারা স্ত্রীলোকটাকে উহার মধ্যে উপবেশন করাইল এবং মন্ত্রোচ্চারণাদি ক্রিয়াকলাপ সমাপ্ত হইলে পর, চিতাতে অগ্নি দেওয়া হইল। প্রথমতঃ ভয়ানক ধূম হইয়াছিল ; অনন্তর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। হতভাগ্য স্ত্রীলোক ইতিমধ্যেই ব্যাকুল হইয়াছিল, সে এক একবার ভয়ে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা প্ররোচনা ও বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিতে লাগিল। কিন্তু আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না, আমি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে ধাবমান হইলাম এবং লোকদিগকে নিবৃত্ত করিয়া স্ত্রীলোকটাকে বলপূর্ব্বক অগ্নি হইতে উত্তোলন করিলাম। স্ত্রীলোকটা এতক্ষণ এত কষ্ট পাইতেছিল কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অগ্নি হইতে তাহাকে উদ্ধার করিলে পর, সে কিয়ৎকাল পরে কি ভাবিয়া আমাকে গালাগালি ও শাপতাপ প্রদান করিতে লাগিল।"

——

ক্রমশঃ—

প্রতিধ্বনি।

১

কে লো অয়ি বিজন-বাসিনি !
যে কথাটি কহি আমি, সে কথাটি কেন তুমি,
জড়িত ভাবেতে কও, জড়িতভাষিণি,
কে লো অয়ি বিজনবাসিনি ?

২

বিশেষ বিনতি করি, সমীরণ-সহচরি,
কহ তুমি, শূন্যময়ি, কহ লো আমায়,
তৃপ্ত কর কুতূহল, ত্যজি জন-কোলাহল,
বিরলে বিহর তুমি, কিসের আশায় ?

যেখানে কেহই নাই, সেখানে তোমায় পাই,
বিশাল বিলাস-গৃহে, ভূধর-গুহায়;
সদাই তোমার, ধনি, ধ্বনি শোনা যায়!

৩

সরল বাঁশরী করে, সরল সরল স্বরে,
সরল কৃষক যুবা সরল অন্তরে
অই যে বিটপি-মূলে কি গায়িছে মন খুলে;
তুমি সে মধুর ধ্বনি ধ্বনিছ সাদরে!
বিহগী বিহগ সনে, কূজিছে আনন্দ মনে,
গাইছে প্রেমের গান গাছের উপরে,
ধ্বনিছ সে ধ্বনি, তুমি, হরষ অন্তরে!

৪

বল, লো পবনপ্রাণা, বল বল সুবচনা,
যদিও বদন তব দেখিনি নয়নে,
কিন্তু যে নিয়ত শুনি যে কথাটি কও তুমি;
পরের কথায় কথা তোমার বদনে।
পরের প্রত্যাশী হয়ে, পর-কথা কয়ে কয়ে,
কেন লো, অলক্ষ্যে ভ্রম? ভেবে দেখ মনে,
কোথায় গৌরব পর-প্রত্যাশি-জীবনে?

৫

পরের উপরে ভর, করে লো সামান্য নর;
অমর-কামিনী তুমি, তুমিও তেমন?
না না, তা কি কভু হয়? তোমার রসনা কয়
যে ভাবে পরের কথা, নিঃস্বার্থ বচন।
অহৃদয় নীচমনা এ জগতে যত জনা,
বিদ্রূপকারিণী তোমা কহে অনুক্ষণ;
আমি তা নারিব মুখে আনিতে কখন।

৬

পরের দুখেতে দুখী, পরের সুখেতে সুখী
তুমি লো অমর-বালা, এ বিজন স্থলে;
কাঁদি যদি কাঁদ তুমি, হাসি যদি, হাস তুমি,
গাই যদি, গাও তুমি কত-কুতূহলে।
নাহিকো তোমার কায়া, নাহিকো তোমার ছায়া,
কেবল বচন-সুধা বদন-কমলে;
বচন-রূপিণী তুমি এ মহীমণ্ডলে।

৭

আকাশ-বাণীর মত, শূন্য হ'তে কত মত
ভাঙ্গাভাঙ্গা কথা কও, গভীর-নাদিনী!
বড় আশা মনে মনে, কহ কহ সুবদনে,
কে তুমি আকাশে ফির, আকাশ-নন্দিনি?
কত বার কত লোকে পড়ি নানা দুখ শোকে,
বিজনে আসিয়া কাঁদি ভাসায় মেদিনী;
আশ্বাস তাহারে তুমি, আশ্বাস-বাদিনি!

৮

জানিনু তোমায় আমি, 'প্রতিধ্বনি' নামে তুমি,
একাকিনী, কিন্তু হয়ে কথক-সঙ্গিনী,
মনোমত যেই স্থান, কর তথা অবস্থান,
অলক্ষ্যে, অথচ হয়ে পবন-বাহিনী।
ভাল আজি ভাল হ'ল, ঘন ঘন, বল বল,
যেই কথা বলি আমি, দুখের কাহিনী,
মোর সনে সেই কথা কহ, সুনাদিনি!

৯

কি কথা কহিব আর, কিবা আছে কহিবার?
আনন্দের কথা মোর কিছুই তো নাই।
কাঁদিবার কথা আছে, তাহাই তোমার কাছে—
অশ্রুপাত সহকারে আজি ক'হে যাই;

এমনি দারুণ কথা, কহিতে দারুণ ব্যথা,
হৃদয়ের অন্তস্তলে যদি ও লো পাই;
তবুও তোমার কাছে আজি ক'হে যাই।

১০

মহাপাপী সাবুদ্দিন রাহুগ্রাসে যেই দিন
ভারতের সুখ-শশী, অন্যায় সমরে,
গরাসিল চির তরে; ভারত সে দিন ধ'রে
স্বর্গচ্যুত হয়ে মগ্ন নরক-ভিতরে!
যদিও তাহার পর, ক্ষণে ঝকি আশাম্বর
একটি নক্ষত্র ছিল দূর দূরান্তরে,
তাও হৃত হল দেখ চিরকাল তরে!

১১

প্রতিধ্বনি অমনি তখনি,
আমার হৃদয় ব্যথা মিলিত দুখের কথা,
(নর-জীবনের, হায়, বিষাদের খনি!)
কহিলেক জড়িতভাষিণী;—

১২

'মহাপাপী সাবুদ্দিন রাহুগ্রাসে যেই দিন—
ভারতের সুখ-শশী, অন্যায় সমরে,
গরাসিল চির তরে; ভারত সে দিন ধ'রে
স্বর্গচ্যুত হয়ে মগ্ন নরক ভিতরে!
যদিও তাহার পর, ক্ষণে ঝকি আশাম্বর
একটি নক্ষত্র ছিল দূর দূরান্তরে,
তাও হৃত হল দেখ চিরকাল তরে!'

পাথুরিয়া-কয়লা।

পাথুরিয়া-কয়লা খনিজ পদার্থ। পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ আকর হইতে উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাথুরিয়া-কয়লার খনি প্রায় পৃথিবীর সকল স্থানেই দৃষ্ট হয়। এখানে রাণীগঞ্জ প্রদেশে ইহার একটী বৃহৎ আকর আছে। তথা হইতে প্রতিদিন সহস্র সহস্র মোণ কয়লা উত্তোলিত হইয়া থাকে। খনির মধ্যে পাথুরিয়া-কয়লা স্তরে স্তরে সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। এক স্তর মৃত্তিকা বালুকাদি, তন্নিম্নে দুই তিন হস্ত গভীর পাথুরিয়া-কয়লার স্তর, এইরূপ শত সহস্র স্তর, খনির মধ্যে দেখা যায়। কয়লা খনি হইতে উত্তোলন করিবার নিমিত্ত গভীর খাত খনন করিতে হয়। আকর মধ্যে খনকেরা কার্য্যসৌকর্য্যার্থে সোপান প্রস্তুত করে এবং কখন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে তন্মধ্যে বাস করে। আকরের মধ্যে সমূহ বিপদাপদের সম্ভাবনা। পৃথিবীর অভ্যন্তরে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে পায় না। এই নিমিত্ত খনকেরা প্রদীপাদি গ্রহণ করিয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে। পূর্ব্বে প্রদীপের সামান্য অগ্নি হইতে কখন কখন সমগ্র আকর ভস্মসাৎ হইয়া যাইত, ও অনেক সংখ্যক লোকের মৃত্যু হইত। আকরের মধ্যে একপ্রকার দাহশীল বাষ্প সঞ্চিত হয়; ঐ বাষ্প, অগ্নিশিখা সংলগ্ন হইলেই তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠে; এবং উহা হইতে সর্ব্বদাই ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইত। কিন্তু কিয়ৎ বৎসর পূর্ব্বে ডেভি নামক এক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত একপ্রকার অদ্ভুত দীপাধার প্রস্তুত করেন, যাহা হইতে যথেষ্ট আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, অথচ খনিতে অগ্নি লাগিবার সম্ভাবনা থাকে না।

পূর্ব্বে পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিতেন যে, নানাজাতীয় বৃক্ষ উদ্ভিদাদি পৃথিবীর অভ্যন্তরে কোন কারণে প্রোথিত হইলে, উহা কালসহকারে পচিয়া ও পরিবর্ত্তিত হইয়া কয়লারূপে পরিণত হয়। কয়লার মধ্যে বৃক্ষের শাখা পত্রাদির নিদর্শন পাওয়া যায় বলিয়া তাঁহারা এইরূপ মত প্রচার করেন। কিন্তু ইদানীন্তন

কতকগুলি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে কয়লায় বৃক্ষের শাখা পত্রাদির ভাগ অতি অল্প এবং একপ্রকার উদ্ভিদের বীজের ভাগই অধিক। বীজের ভাগ অধিক থাকিবার কারণ এই যে, উহা বায়ু ও বৃষ্টিতে শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হয় না, কিন্তু শাখা প্রশাখাদি শীঘ্র পচিয়া যায়, তজ্জন্য উহাদের নিদর্শন অল্পই দৃষ্ট হয়। পণ্ডিতবর হক্ষলি কয়লার উৎপত্তির কারণ এইরূপ নির্দ্দেশ করেন।

অতি পূর্ব্বকালে লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে, একপ্রকার উদ্ভিদ পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে জন্মাইত। সেই সকল উদ্ভিদ হইতে ধূলিবৎ বীজ এত অধিক পরিমাণে ভূমিতে পতিত হইত যে, শত বৎসরের মধ্যে মৃত্তিকার উপর দুই তিন হস্ত পরিমাণ জমিত। যে স্থলে এক্ষণে কয়লার খনি দৃষ্ট হয়, তাহার নিকটে যে সমুদ্র বা নদী প্রবাহিত হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কেননা ঐ খনির মধ্যে যে সকল "ফসিল" প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা দেখিতে বর্ত্তমান অর্ণবচারী জীবের ন্যায়। আমরা "চা-খড়ি" প্রস্তাবে দেখাইয়াছি যে, ভূপঞ্জর কালসহকারে উন্নত ও অবনত হয়। অতএব ইহা আমাদের অনায়াসেই বোধগম্য হইতে পারে যে, যেস্থলে পূর্ব্বোক্ত উদ্ভিদের বীজ জন্মে তাহা কালসহকারে অবনত হইতে পারে। তথাকার ভূমি অবনত হইলে সাগরজলরাশি তদুপরি আসিয়া পড়িবে ও তথায় সমুদ্র বা নদীবাহিত মৃত্তিকা জীবদেহাদি পতিত হইয়া একটী স্তর সৃষ্ট হইবে।

পূর্ব্বোক্ত বীজসমূহ অন্যান্য উদ্ভিদের সহিত ঐ স্তরে প্রোথিত হইয়া কালসহকারে পাথুরিয়া-কয়লারূপে পরিণত হয়। পাথুরিয়া-কয়লায় এই বীজের ভাগ যে অধিক দেখা যায়, তাহার কারণ এই যে, উদ্ভিদের শাখা প্রশাখাদি জল ও বায়ুর প্রভাবে বীজের অপেক্ষা শীঘ্র পচিয়া এমন বিরূপ ভাবাপন্ন হয় যে, তাহার নিদর্শন কয়লায় অল্পই দৃষ্ট হয়। কালসহকারে সমুদ্র বা নদী ভরাট হইয়া আসিলে ও সমুদ্রের তল শুষ্কভূমি হইলে,

তদুপরি পূর্ব্বোক্ত উদ্ভিদাদি জন্মায়, এবং আবার মৃত্তিকার উপর বীজ জমিয়া অপর একটী স্তর সৃষ্ট হয়। আবার যদি কখন উহার উপর সমুদ্রের জলরাশি আসিয়া পড়ে, তবে তদুপরি নূতন স্তর সংস্থাপিত হইবে এবং বীজসমূহ কালসহকারে কয়লা হইয়া যাইবে। এইরূপে কয়লা উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং এই নিমিত্ত কয়লার খনিতে এক স্তর কয়লা, তদুপরি এক স্তর মৃত্তিকা, এইরূপ স্তরে স্তরে কয়লা ও মৃত্তিকা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পাথুরিয়া-কয়লা আমাদের অনেক কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। বাষ্পীয় যন্ত্র পাথুরিয়া-কয়লা ভিন্ন চালিত হওয়া অসম্ভব। ইংলণ্ডদেশে কয়লা প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই জন্য তথায় বাষ্পীয় যন্ত্রের এত প্রাদুর্ভাব এবং এই নিমিত্তই ইংলণ্ডবাসী লোকেরা এত ধনশালী। এক্ষণে আমরা কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে যে কয়লা পাকশালায় ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা পাথুরিয়া-কয়লা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাথুরিয়া-কয়লা লৌহকটাহে চাপাইয়া নিম্নে অগ্নির জ্বাল দিলে, এক প্রকার দাহশীল বায়বীয় পদার্থ বাহির হইয়া যায় এবং অবশিষ্ট পোড়া কয়লা যাহা কড়াতে থাকে, তাহাই পাককার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহাকে কোক্ কয়লা বলা যায়।

পাথুরিয়া-কয়লা হইতে যে বাষ্প প্রস্তুত হয়, উহাকেই সচরাচর আমরা গ্যাস বলিয়া থাকি এবং এই গ্যাসের আলোকেই এই কলিকাতানগরী প্রতিরাত্রি সুন্দররূপে আলোকিত হইয়া থাকে। পাথুরিয়া-কয়লা হইতে যে কেবল এই গ্যাস পাওয়া যায় এমন নহে, আল্‌কাত্‌রা, কার্ব্বলিক্ এসিড্ নামক এক প্রকার ঔষধ ও নানাপ্রকার রং কয়লা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সহরের আলোর নিমিত্ত নারিকেলডাঙ্গাস্থিত বাতিঘরে যে গ্যাস প্রতিদিন প্রস্তুত করা হয়, তাহার জন্য প্রায় দুই হাজার মোণ পাথুরিয়া কয়লা পোড়ান হইয়া থাকে। এই গ্যাস নানা উপায়ে পরিষ্কার করিয়া বৃহৎ বৃহৎ গ্যাসাধারে জমা করা হয়। ঐ গ্যাসাধার হইতে আরম্ভ করিয়া কলিকাতার প্রায় সমস্ত রাস্তার

ভিতরে বড় বড় লৌহের নল প্রোথিত আছে। রাস্তার ধারে যে সকল থাম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে রাস্তাস্থিত নলের সহিত সংযুক্ত একটী একটী সরু নল আছে। ঐ ছোট নলের মুখ থামের উপরিস্থিত লাঠনের ভিতর থাকে। চাপের দ্বারা গ্যাসাধারস্থিত গ্যাস সমস্ত নলে ব্যাপ্ত হইয়া, অবশেষে উহার মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। লাঠনের দ্বার খুলিয়া সেই মুখে আলো ধরিলে অমনি উহা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে।

ভানুমতী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রী-প্রেরিত চরগণ ক্রমে ক্রমে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। কেহই ভানুমতীর সন্ধান করিতে পারিল না। তিনি জীবিত আছেন কি না, ইহাও কেহ নিরূপণ করিতে পারে নাই।

রামদয়াল দিন দিন হতাশ হইতে লাগিলেন। তনয়ার অনুদ্দেশসংবাদ যখন প্রথম শ্রবণ করেন, তখন প্রতিজ্ঞা করেন যে, সন্ধান পাইলে তাহাকে যৎপরোনাস্তি দণ্ড প্রদান করিবেন। ক্রমে যত দিনাতিপাত হইতে লাগিল, অথচ তাহার কিছুমাত্র সংবাদ আসিল না, ততই অমাত্যের ক্রোধভাব হ্রাস হইতে লাগিল। যখন দেখিলেন যে অনুচরগণ নিষ্ফল হইয়া প্রত্যাগমন করিতেছে, তখন তিনি ক্রোধভাব একেবারে দূর করিয়া শোকসাগরে মগ্ন হইলেন।

দুর্গাপ্রসাদ নামে কেবল একজন চর তখনও ফিরিয়া আইসে নাই। রামদয়াল তাহার আগমন উৎসুক হৃদয়ে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

একদিন রাজপ্রাসাদে অমাত্য কোন কার্য্যে ব্যস্ত আছেন, এমন সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া জ্ঞাপন করিল যে, দুর্গাপ্রসাদ মন্ত্রীভবনে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। রামদয়াল তৎক্ষণাৎ সমুদয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে স্বগৃহাভিমুখ

হইলেন। পথিমধ্যে কতপ্রকারই দারুণ আশঙ্কা তাঁহার অন্তঃকরণে উদয় হইতে লাগিল। কন্যাকে পুনরায় দেখিবার কোন সম্ভাবনা আছে কি না, ইহাই বারম্বার স্বগত আন্দোলন করিতে লাগিলেন। দূত মঙ্গল কি অমঙ্গল সংবাদ আনিয়াছে, এ বিষয়ে অধিক সন্দেহ ছিল না। মনে মনে তিনি একপ্রকার নিশ্চয়ই করিয়াছিলেন যে, অন্যান্য চরগণ যেরূপ নিষ্ফল হইয়াছে, ইহারও তদ্রূপ হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

বাটীর ভিতর প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বহির্দ্বারে ক্ষণেক দণ্ডায়মান রহিলেন। অতিকষ্টে অভ্যন্তরে গমন করিয়া দেখিলেন, দুর্গাপ্রসাদ পথশ্রান্ত ও বিষণ্ণভাবে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া দূতের মুখ আরও বিষণ্ণ হইল। মন্ত্রীবর আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমাচার কি?"

দুর্গাপ্রসাদ কহিল, "আমি বহুস্থান পর্য্যটন করিয়াছি কিন্তু কোথাও ভানুমতীর সংবাদ প্রাপ্ত হই নাই।"

রামদয়াল রোদন করিতে করিতে ভূমে বসিয়া পড়িলেন। উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—"ভানুমতি! এ জন্মে কি তোমার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না?"

দুর্গাপ্রসাদ কহিল, "অমাত্যবর, ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। আমি যদিও তাঁহার কোন স্থির সংবাদ পাই নাই, তথাপি তাঁহার কিঞ্চিৎ চিহ্ন পাইয়াছি।"

মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি?"

দুর্গাপ্রসাদ আপনার উত্তরীয় মধ্য হইতে একখানি বস্ত্র বাহির করিয়া বলিলেন, "ইহা কি আপনি চিনিতে পারেন?"

রামদয়াল সহর্ষে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন—"ইহা ভানুমতীর বসন; কোথায় পাইলে?"

"আমি আপনার নিকট হইতে বিদায় লইয়া প্রথম দশ বার দিবস উদয়পুর রাজ্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোথাও তাঁহার অণুমাত্র সন্ধান পাইলাম না। অবশেষে

নিতান্ত হতাশ হইয়া রাজধানীর দিকে প্রত্যাগমন করিবার মানস করি। পুনর্ব্বার ভাবিলাম যে, কোনপ্রকার সংবাদ না পাইলে উদয়পুরে ফিরিয়া যাওয়াতেই বা ফল কি? এক দিবস এইরূপ চিন্তামগ্ন হইয়া ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময়ে নিতান্ত ক্লান্তি অনুভব করাতে পথপার্শ্বে এক কুটীরাভ্যন্তরে গমন করিয়া শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলাম। অভ্যাসবশতঃ কুটীরবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, 'এস্থানে কেহ দুইটী স্ত্রীলোককে দেখিয়াছে কি না।' এবং ভানুমতীর আকৃতিও বর্ণন করিলাম। তাহারা সকলেই কহিল যে, 'আমরা কোন স্ত্রীলোককে দেখি নাই বটে কিন্তু দুইটী স্ত্রীলোকের বসন প্রাপ্ত হইয়াছি।' এই বলিয়া আমার হস্তে এই বস্ত্রগুলি অর্পণ করিল। আমি ইহা লইয়া আপনাকে জ্ঞাপন করিবার জন্য সেই দিবসই উদয়পুরাভিমুখে যাত্রা করিলাম।"

"এ সব তাহারা কোথায় পাইল?"

"তাহা আমি জিজ্ঞাসা করি নাই।"

রামদয়াল কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "দুর্গাপ্রসাদ তুমি আমাকে অবোধ শিশু জ্ঞান করিও না। বুদ্ধিহীন উন্মাদ ব্যক্তি হইলেও এ কথা জিজ্ঞাসা করিত।"

দুর্গাপ্রসাদ কোন উত্তর করিল না। পরক্ষণেই মন্ত্রী বলিলেন, "তুমি অবশ্যই কোন অশুভ সমাচার পাইয়াছ; আমার নিকট হইতে গোপন করিতেছ। দুর্গাপ্রসাদ, যদি কখন দারুণ সন্তান-বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিতে না ইচ্ছা কর, তবে অনুনয় করি, আমার নিকট তুমি কিছুই গোপন করিও না।"

দূত কহিল, "আমি মহাশয়কে তাবৎ সত্যই বলিয়াছি।"

"তবে কুটীরবাসীগণ এ বস্ত্র কোথায় পাইল বল।"

"একজন বৃদ্ধা আমাকে বলিল, সে যখন স্নান করিতে যায়, তখন নদীতীরে এই সমুদয় বস্ত্র পতিত রহিয়াছে দেখিতে পায়।"

রামদয়াল একেবারে শোকে বিহ্বল হইলেন। আর কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। অনুমান করিলেন যে, তাঁহার ভানুমতীও

সেই অপরিচিত নদীতে স্নান করিতে গিয়া জলমগ্না হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সখীরও যে সেই দশা ঘটিয়াছে ইহাও নিশ্চয় করিলেন; নতুবা দুই জনেরই বসন কুটীরবাসিনী বৃদ্ধা কি প্রকারে প্রাপ্ত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আমরা পাঠকবর্গকে পুনরায় জয়পুর রাজ্যে লইয়া যাইতে বাধ্য হইলাম। যখন সকলেই অশ্ব ও বরাহসমেত নদীর অপর পারে আসিয়া পৌঁছিলেন, মহারাজ মানসিংহ ব্যগ্র হইয়া প্রথমে সেই যুবাকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে যুবক উত্তর করিল, "মহারাজ আমার নাম বীরসিংহ।"

মানসিংহ কহিলেন, "আপনার নিবাস কোথায়?"

"আমার নিবাস রাজস্থান"

"রাজস্থানের কোন্ প্রদেশ?"

বীরসিংহ কহিলেন, "রাজস্থানের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আমার বাস নহে। যখন যে প্রদেশে সুবিধা হয়, তথায় আমি কালযাপন করি।" নাথমল্ল কহিলেন, "এক্ষণে কোথা হইতে আসিতেছেন?"

বীরসিংহ কহিলেন, "আমি সম্প্রতি যোধপুর রাজ্য হইতে আসিতেছি।"

মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ দুই জন ব্যক্তি কে?"

বীরসিংহ উত্তর করিলেন, "মহারাজ আপনার আদেশক্রমে নদী উল্লঙ্ঘন করিয়া যখন অপর পারে যাইলাম, তখন বরাহের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলাম না। কিয়দ্দূর গমন করিয়া সহসা পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া সেই দিকেই ধাবমান হইলাম। অরণ্য এরূপ দুর্গম যে, স্থলে স্থলে অশ্বপৃষ্ঠে দূরে থাকুক, পদব্রজেও উহা ভেদ করা দুঃসাধ্য। আবার এমন নিবিড় যে দিবসেও অন্ধকারাচ্ছন্ন। বরাহকে যে বধ করিতে পারিব, এমন কোন আশা দেখিতে পাই-

লাম না। মহারাজ সন্ন্যাসীর ন্যায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াই বটে কিন্তু এ দাস জাতিতে রাজপুত্র। প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, যদি বরাহটী বধ করিতে পারি, তবে জনসমাজে প্রত্যাগমন করিব, নচেৎ সেই বনমাঝেই যাবজ্জীবন অবস্থান করিব। সহসা কিছু দূর হইতে কাতর রব শুনিতে পাইলাম। তৎক্ষণাৎ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলাম ও অশ্বটী পার্শ্বস্থ এক বৃক্ষে বন্ধন করিয়া, শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে পদব্রজে ধাবমান হইলাম। ক্ষণেক পরেই দেখিলাম যে, সেই দুর্দ্দান্ত বরাহ নিরস্ত্র এই পথিকদ্বয়কে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। ইহারা ভয়প্রযুক্তই হউক বা হতবুদ্ধি প্রযুক্তই হউক প্রায় অজ্ঞান হইয়াছিলেন।"

নাথমল্ল ব্যঙ্গভাবে হাসিয়া বলিলেন, "পুরুষ বটে।" কিন্তু মহারাজ কিঞ্চিৎ ভ্রূকুটি করাতে তৎক্ষণাৎ নীরব হইলেন।

বীরসিংহ কহিলেন, "আমি দেখিলাম যে, আমি এতদূরে রহিয়াছি, যে ইহাদের নিকটে গমন করিবার পূর্ব্বেই বরাহটী ইহাদিগকে ত্যাগ না করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে। দুর্ভাগ্যক্রমে বল্লুকটী ভ্রমবশতঃ অশ্বপৃষ্ঠে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম। উপায়ান্তর না দেখিয়া ভূমি হইতে একটী প্রস্তরখণ্ড উত্তোলন করিয়া সেইদিকে নিক্ষেপ করিলাম ও প্রাণপণে এক চীৎকার ধ্বনি ত্যাগ করিলাম। দৈবানুকূল্য প্রযুক্ত বরাহ সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বাভিপ্রায় হইতে বিরত হইয়া সক্রোধে আমারদিকে ধাবমান হইল।"

রাজা কহিলেন, "আপনার প্রাণ পণ করিয়া পরের উপকার চেষ্টা রাজপুত্রের কার্য্য বটে, তার পর?"

"পরে, মহারাজ কৃপাণ নিষ্কোষ করিয়া দুর্দ্দান্তের আগমন প্রতীক্ষা করিলাম। রোষভরে যেমন আমাকে আক্রমণ করিবার জন্য বেগে উপস্থিত হইল, আমি এক লম্ফ দিয়া পথের মধ্য হইতে এক পার্শ্বে গমন করিলাম। বরাহ আপনার বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া আমাকে পশ্চাতে ফেলিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইল।

আমি সুযোগ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার পশ্চাদ্দেশে খড়্গাঘাত করিলাম, বরাহ ক্রোধে অন্ধ হইয়া পুনরায় আমার দিকে ফিরিল। আমিও পূর্ব্বের ন্যায় উপায়াবলম্বন করিয়া তাহাকে ক্রমে ক্রমে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলাম। অবশেষে ক্লান্ত ও বহু রক্তক্ষয় প্রযুক্ত দুষ্ট একেবারে নির্জ্জীব হইয়া পড়িল। আমিও সেই অবসরে তাহার বক্ষদেশে এক দারুণ খড়্গাঘাতে তাহাকে যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিলাম। পরে এই দুই জনকে নিতান্ত অশক্ত দেখিয়া আমার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া একত্রে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।"

এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া সকলেই বীরসিংহকে সাধুবাদ দিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষণকাল পরে মানসিংহ অপর দুইটী যুবাকে সম্বোধন করিয়া তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

একজন উত্তর করিল, "মহারাজ আমার নাম বিজয়বর্ম্মা। ইনি আমার প্রভু; ইহাঁর নাম শঙ্করচাঁদ। আমরা এই অরণ্য দিয়া রণযম্বুরে গমন করিতেছিলাম; পথিমধ্যে বরাহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হই।"

রাজা কহিলেন, "তোমরা কি নিরস্ত্র হইয়া ভ্রমণ কর?"

বিজয়বর্ম্মা বলিল, "আমাদের সঙ্গে বহুসংখ্যক পরিচর ছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহারা অনেক পশ্চাতে রহিয়াছে।"

ভরতসিংহ বলিলেন, "তোমাদের নিবাস কোথায়?"

বিজয়বর্ম্মা কহিল, "আমরা ভরতপুরনিবাসী।"

"জয়পুররাজ্যে কেন?"

"রণযম্বুরের নিকট প্রস্থার গ্রামে আমার প্রভুর মাতুলালয়, আমরা সেইখানেই গমন করিতেছিলাম।"

ক্রমে ক্রমে সকলে নগরাভিমুখে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

রাজা বীরসিংহকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বীরসিংহ, তোমার জয়পুর রাজ্যে থাকিতে কি কিছু আপত্তি আছে?"

বীরসিংহ বলিলেন, "মহারাজ যদি কোন রাজকার্য্যে আমাকে নিযুক্ত করেন তাহা হইলে আমি থাকিতে পারি, নতুবা আমাকে স্থানান্তরে গমন করিতে হয়।"

রাজা কহিলেন, "আমরও তাহাই মানস। তবে তুমি আমাদিগের সহিত অম্বরে গমন কর; পরে তোমাকে উপযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করিব।"

বীরসিংহ সম্মত হইলেন। বিজয়বর্ম্মা ও শঙ্করচাঁদ অনুচরবর্গ-বিহীন হইয়া অন্য উপায় না দেখিয়া ইহাদিগের সহিত অম্বর নগরীতে গমন করিলেন।

ক্রমশঃ—

বামাগণের রচনা।

চিন্তা।

"বল হে বল হে শুনি ভাবুক-প্রবর,
কি লাগি বসিয়া বল প্রান্তর ভিতরে?
কি লাগি বল হে শুনি ক্ষীণকলেবর?
কোন কি অসুখ তব আছে হে অন্তরে?

"কপোলেতে বাম কর করি সমর্পণ,
কি ভাব, কি কহিতেছ মনে মনে, কহ
প্রকাশি আমারে তব মনের বেদন;
কি লাগি চিন্তার ভার অন্তরেতে বহ?

"দেখিয়া প্রকৃতি শোভা কি ভাব হে মনে?
অসিত-বরণ ওই কোকিল-প্রবর
হরিল কি মন তব মধুর কূজনে?
হরিল কি মন তব ফুল মনোহর?

"কি দেখিছ ঊর্দ্ধমুখে, কিসের কারণ?
রঞ্জিত বিবিধ রাগে আকাশসুন্দরী,
সুন্দর শ্যামল রাগ, লোহিত বরণ,
হরিল কি মন তব চারুবেশ ধরি?

"নবীন পল্লব সহ তরু সুখময়,
সুন্দর কুসুমচয় মানসরঞ্জন,
হেরিয়া কি মনে তব হইল উদয়
বিবিধ চিন্তার জাল, বিভুর কারণ?

"না, তা কেন, তা হলে কি নয়ন তোমার
থাকে ধরা পানে,—ভাসিত হৃদয় তব
আনন্দের নীরে, মহা সুখ অনিবার
হইত অন্তরে হেরি শোভা নব নব।

"কিসের লাগিয়া বারি নয়নে তোমার
প্রবল প্রবাহে ওই বহে অবিরত,
কি দেখিছ কহ কহ নিকটে আমার?
স্থির আঁখি সদা তব দরশনে রত?"

যেমন না স্থির থাকে চঞ্চল সলিলে
কোন বস্তু, সেইরূপ যুবকের মন
চিন্তা-লহরীতে আহা সদা হেলে দুলে
ধাবিতেছে অবিরত—অস্থির-গমন।

কভু হাসে কভু কাঁদে, কভু দুঃখভার
বহিতেছে অনায়াসে ভাবুকপ্রবর,
কভু নিন্দা কভু কুৎসা করিছে কাহার;
পাগলের প্রায় কভু কহে 'ধর' 'ধর'!

কতক্ষণে যুবা তবে ফিরা'ল নয়ন,
পড়িলাম আমি তার নয়নের পথে;
হাসিয়া যুবক তবে বলিল বচন—
"পার কি আনিতে তারে সাধি মনোরথে?"

শুনিয়া যুবক-বাক বিস্মিত অন্তরে
কহিলাম, "শুন এবে আমার বচন,
কাহারে দেখাব বল? কাহারে বা হেরে,
মনভৃঙ্গ একেবারে হলো অচেতন?"

কতক্ষণে দীর্ঘশ্বাসে আরম্ভিল যুবা—
মলিন হয়েছে কিবা সুন্দর আনন,
শ্রীভ্রষ্ট হয়েছে হায় তনু তার কিবা,
উজ্জ্বল সুন্দর ভাতি নাহি সে তেমন।

"অদ্য যবে ভ্রমিছিনু উদ্যান ভিতর
ক্ষণপ্রভা সম এক কামিনী-রতন
দেখা দিয়ে, বিনাশিয়ে, হইল অন্তর,
তার অদর্শন হেতু চিন্তায় মগন॥

"কি কহিব রূপ তার বচন সে হারে,
বর্ণ হারে, নাহি পারে লেখনী লিখিতে,
না হেরে নয়ন মন, না হেরে তাহারে
উথলিল চিন্তা-সিন্ধু না পারি সহিতে।

"পূর্ণশশী হেরে তার মুখ-শশী-শোভা
লজ্জা পেয়ে দিন দিন হীনকলেবর,
মোহন মূরতি তার কিবা মনোলোভা
নিরখিয়া বিমোহিত নয়ন অন্তর।

"কুরঙ্গ সুরঙ্গে ধায় কটাক্ষ নিরখি,
কোথা পাব নয়নের সেই কুটিলতা,
কোথা পাব কোথা পাব সেই শশীমুখী,
একাধারে বিরাজিত গুণ সরলতা।

"কোকনদদলগত নীহার যেমন,
লোহিত প্রবাল মাঝে মুকুতানিচয়,
তেমতি তাহার শোভে, নয়ন-রঞ্জন,
অধর যুগল মাঝে দন্ত সমুদয়।

"তিল ফুল, খগরাজ, নাসার তুলন,
কাজ কি এ সব আর বৃথা আড়ম্বর,
হউক সে সব অন্য কবির ভূষণ।
আমি ত দেখি না উহা তেমন সুন্দর।

"হস্তিগ্রীবা খর্ব্ব করি তার গলদেশ,
বলি না তাহাতে দোষ করি দরশন,
প্রশংসা করুক তায় কবিরা অশেষ;
এ যে সে রূপের রাশি একত্রে মিলন।

"যেমন তারকা মাঝে শশী বিরাজিত,
যেমন সুমেরু শোভে অচল মাঝেতে,
রমণীগণের মাঝে তেমতি শোভিত,
কি দিব তুলনা তার না পাই দেখিতে।

"শুনেছি রমণীগণ কোমল-হৃদয়,
সরলতা-পরিপূর্ণ হৃদয় তাদের,
যার ভাগ্যে তার বটে আমার ত নয়,
উপরে মধুর বটে, হৃদয় বিষের।

"কে বলে রমণীগণ কোমল-সরল;
কে বলে রমণীগণ মধুরতাময়;
কে বলে রমণীগণ বিমল-তরল;
কে বলে রমণীগণ উদার-হৃদয়?

"রমণীর হাতে বুঝি পড়েনি সে জন,
স্পর্শে নাই সেই জন রমণী-গরল,
গরল বিরল কোথা করি দরশন?
দুস্তর অন্তর জ্বালা হয় হে প্রবল।

"দরশনে এ গরলে জ্বলেরে বিষম,
মনঃপ্রাণ একেবারে কেন অস্থিরত?
সহেছি অনেক জ্বালা নাহি এর সম,
কোন্ জ্বালা একেবারে করে জ্ঞানহত।"

দেখিয়া যুবকে মগ্ন চিন্তার সাগরে;
কত ভাব মনে মম হইল উদয়।
আক্রমিতে পারে মোরে তরঙ্গ দুস্তরে,
কাজ নাই শুনিব না ও সব বিষয়॥

বিরলেতে ভাবি গিয়া পিতা পরমেশ,
দুঃখ যত একেবারে হইবে অন্তর,
চিন্তা যাবে, ভক্তিভাবে করিব নিবেশ
মনঃপ্রাণ সযতনে তাঁহার উপর।

নৈহাটী। শ্রীমতী শ—

সংবাদ সার।

চোরবাগান বালিকা-বিদ্যালয়ের বালিকাদিগের বাৎসরিক পরীক্ষা হইয়াগিয়াছে। মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, কৃষ্ণলাল রায় এবং যশোদানন্দন সরকার পরীক্ষা করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

বাতাস দেওয়ার নিমিত্ত ইজিপ্ট এবং ভারতবর্ষের ভদ্র মহিলাগণ প্রথম পাখা প্রস্তুত করেন। পূর্ব্বকালে পাখার আকার ময়ুরের পুচ্ছের ন্যায় ছিল।

বিলাতে কোন ভদ্র লোকের একটী কুক্কুর আছে। কুক্কুর এরূপে শিক্ষিত হইয়াছে যে অনায়াসেই তেরিজ জমাখরচ করিতে পারে। কতকগুলি তাস সম্মুখে ছড়াইয়া দিয়া ১৩ বলিলে, একখানি তিরী, একখানি ছুরী, ও একখানি পঞ্জা উহার মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া মুখে করিয়া আনিয়া দেয়। কুক্কুরটী ইংলণ্ডের সকল রাজবংশীয়দিগকে চেনে। কোন একখানি বিশেষ ছবি আনিতে বলিলে, অনেকগুলি ছবির মধ্য হইতে উহা আনয়ন করে।

একখানি ইংরাজি পত্রে প্রকাশ হইয়াছে যে, ফ্রান্সের যুবতীগণ স্বামী চতুর বা যোদ্ধা হইলে, জর্ম্মণীয় যুবতীগণ স্বামী গম্ভীর এবং বিশ্বাসী হইলে, ডচ যুবতীগণ স্বামী বিশ্রাম এবং সুখের ব্যাঘাতী না হইলে, স্পেনের যুবতীগণ স্বামী শত্রুপক্ষের দণ্ডদায়ক হইলে, ইটালীর যুবতীগণ স্বামী অধিক নিদ্রাভিলাষী এবং কবি হইলে, ডেনিস যুবতীগণ স্বামী পৃথিবীর মধ্যে নিজ জন্মস্থলকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থল জ্ঞান করিলে, রুশীয়ার যুবতীগণ স্বামী ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তবাসীদিগকে বন্য বলিয়া ঘৃণা করিলে, ইংরাজ যুবতীগণ স্বামী রাজা ও সম্ভ্রান্ত কুলীনদিগের স্নেহপাত্র হইলে, এবং আমেরিকার যুবতীগণ স্বামী ধনশালী হইলে, স্বামীকে অত্যন্ত ভাল বাসে। আর আমাদিগের যুবতীগণ?—স্বামী এক ঝুড়ি স্বর্ণাভরণ দিলে।

বঙ্গমহিলা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

যদি কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে, মানুষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ব্যাপার কি হইতে পারে? তবে আমাদের উত্তর এই যে, ভ্রম করা সর্ব্বাপেক্ষা ঐরূপ হইয়া থাকে। আর যদি জিজ্ঞাসা করেন যে দুষ্কর কর্ম্ম কি হইতে পারে? তাহা হইলে আমরা কেবল ইহাই উত্তর করিব যে, পরের ভ্রম অম্লান বদনে মার্জ্জনা করিতে পারাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন হইয়া থাকে। অতএব আমরা যদি কোন স্থলে ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করিয়া থাকি, তবে তাহাতে পাঠক বিস্মিত হইবেন না। আর যদি মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া ঐ ভ্রম মার্জ্জনা করিতে হইবে। আমরা গত পত্রিকায় একটী গুরুতর ভ্রম করিয়াছিলাম। আমরা খুল্লনা ও লহনাকে ধনপতি সদাগরের পত্নীরূপে সমুল্লেখ না করিয়া শ্রীমন্তের ঐরূপ করিয়াছিলাম। অতএব যে যে স্থলে শ্রীমন্তের উল্লেখ করা হইয়াছিল, সেই সেই স্থলে, অনুগ্রহ করিয়া পাঠকদিগকে ধনপতি সদাগরের স্মরণ করিতে হইবে।

আমরা বঙ্গমহিলার পূর্ব্বাপর অবস্থার সমালোচন করিতে চাই। সমালোচন কতদূর বিশুদ্ধ হইতেছে বলিতে পারি না, তবে বোধ হয় আমরা এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, আমরা বিশুদ্ধ হৃদয়ে সমালোচন করিতেছি। মানুষ চারি প্রকার আছে, এক প্রকারের মতে যাহা কিছু পুরাতন তাহাই প্রশংসনীয়, অন্য প্রকারের মতে যাহা কিছু আধুনিক তাহাই সম্পূর্ণ প্রশস্ত, তৃতীয় প্রকারের লোকেরা যাহা কিছু আপনারা করেন তাহাই উপাদেয় বলিয়া মনে করেন এবং চতুর্থ প্রকারের লোকেরা যুক্তি মানিয়া থাকেন। বঙ্গমহিলার সমালোচন স্থলে আমরা এই চতুর্থ প্রকারের অনুসরণ করিয়া থাকি। আমরা পুরাতন ও নূতন

উভয়েই দোষ গুণ দেখিয়া থাকি। অতএব বঙ্গমহিলার অবস্থা যে পুরাকালে সকল বিষয়েই উৎকৃষ্ট ছিল, আমরা এরূপ কথা কখনই মনে করিতে পারি না। অথবা আমরা কেন, মনু প্রভৃতি বহুদর্শী শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায় সমালোচন করিয়া দেখিলে কাহার না বোধ হয় যে, পুরাতন বঙ্গীয়েরা স্ত্রীদিগের প্রতি যথোচিত ব্যবহার করিতেন না। শাস্ত্রকারেরা স্ত্রীকে স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ কহিয়াছেন কিন্তু কোন স্থলেই অর্দ্ধেকের অপেক্ষা অল্প বলিয়া যান নাই। বহুবিবাহের প্রথা প্রচলিত থাকিলে স্ত্রী আর ওরূপ অর্দ্ধাঙ্গ হইতে পারে না, তখন উহাকে স্বামীর তৃতীয়াংশ অঙ্গ বা চতুর্থাংশ অঙ্গ বলিয়া ভাবিতে হয়। ফলতঃ বিবাহের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হইবে, অঙ্গের অংশও ততই বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। আবার দেখা যাইতেছে, ভারতের শাস্ত্রকারেরা স্ত্রীদিগের প্রতি নানাস্থলে সন্দেহ দৃষ্টি করিয়াছেন বটে কিন্তু কোন স্থলেই উৎপীড়ন করিবার পরামর্শ দেন নাই। আমরা মনু বিশেষতঃ নারদের রচনা যতদূর পড়িয়াছি, তাহাতে বরং ইহাই বোধ হয় যে, তাঁহারা নারীদিগকে সমাদর করিবার নিমিত্তই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা স্ত্রীদিগকে সাক্ষাৎ শ্রী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব দুয়ো প্রভৃতির ব্যবস্থাকে নিতান্ত কুৎসিত ও অশাস্ত্রীয় বলিয়াই বোধ করিতে হইবে। কতকগুলি লোকের কুস্বভাব এই যে জাতিপ্রিয়তায় অন্যায় ভান করিয়া ঐ সকল ব্যবস্থার অনুমোদন করিতে চায়, আমরা এই সকল লোককে প্রাচীন শাস্ত্রের অবজ্ঞাকারী বা অনধিকারী বলিয়া মনে করি।

আমরা ইতিপূর্ব্বে কবিকঙ্কণের উল্লেখ করিয়াছি। কহিয়াছি যে তাঁহার সময়ে বঙ্গমহিলার অবস্থা যথোচিত ছিল না। কবিকঙ্কণ যেরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে প্রাচীন বঙ্গমহিলার অবস্থাদি বর্ণনা করিয়াছেন, এরূপ আর কাহারই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন বঙ্গমহিলা কিরূপ অলঙ্কার পরিধান করিত, কিরূপে স্বামী শ্বশ্রূ প্রভৃতির সেবা করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ

বোধ করিত, কিরূপে বৈধব্য ও সতীদাহাদির দুরন্ত যন্ত্রণা সহ্য করিত, রন্ধনাদি শ্রমসাধ্য ব্যাপারে কিরূপ অনুরাগ প্রদর্শন করিত, বিবাদ বা সদ্ভাবস্থলে নারীসুলভ চপলতা বা করুণতা কিরূপ ভাবে প্রকাশ করিয়া ফেলিত, সমুদায়ই কেবল এক কবিকঙ্কণের গ্রন্থ পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়।

অনন্তর কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর আমাদের ইতিহাস কৌতুহল পরিতৃপ্ত করিয়া থাকেন। বিশেষ এই যে, কবিকঙ্কণের বর্ণনা সকল যেরূপ স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়, ভারতচন্দ্রের সেরূপ হইতে পারে না। অথবা আপাততঃ দেখিলে বোধ হয় যেন ভারতের সময়ে বঙ্গমহিলার নানাপ্রকার অনুচিত ভাব প্রকাশিত হইয়াছিল। কবিকঙ্কণের বর্ণনা পড়িলে বঙ্গনারীদিগকে শ্রমশীলা, সহিষ্ণু ও পতিমাত্রৈক শরণা বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে, কিন্তু ভারতচন্দ্র পাঠ করিলে বিপরীত সন্দেহের উদ্রেক হইয়া থাকে। ফলতঃ কবিকঙ্কণ পাঠ করিলে যদি বঙ্গমহিলার প্রতি আমাদের ভক্তি ও করুণা হইয়া থাকে, তবে ভারতের গ্রন্থ পাঠ করিলে বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইবে সন্দেহ নাই।

এইস্থলে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত হইতেছে। অর্থাৎ, ভারতের সময়ে বঙ্গমহিলা বাস্তবিকই বিলাসিনী হইয়াছিল কি না, সে বিষয়ে বিশেষ বিচার করিতে হইতেছে। আমাদের প্রথমতঃ ইহাই দেখিতে হইবে যে, কবিকঙ্কণ স্বভাব বর্ণনা করিয়াছেন। রাজসংসারের প্রত্যেক ভাবই কৃত্রিম হইয়া থাকে, রায় গুণাকর রাজসংসারে বাস করিয়াছিলেন। অতএব তিনি বঙ্গমহিলার যে সকল ভাবের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কখন নিতান্ত অকৃত্রিম হইতে পারে না। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, ভারতের বর্ণনা পাঠ করিয়া বঙ্গমহিলার প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারা সম্ভব নহে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রসিকতা আমাদের চক্ষে অতিরিক্ত বলিয়াই বোধ হয়, আমরা তাঁহার জিতেন্দ্রিয়তা বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ করিয়া থাকি। অথচ ভারতের স্ত্রীবিষয়ক রচনা সকল তাঁহারই

আদেশ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। এরূপ স্থলে ভারতের নায়িকাগণ প্রকৃত বঙ্গমহিলার কখনই অনুরূপ হইতে পারে না।

ইহাতে বোধ হইতেছে যে, নারীগণের পতিনিন্দা পাঠ করিয়া প্রাচীন বঙ্গীয়ার প্রতি আমাদের অশ্রদ্ধা হওয়া উচিত হইতেছে না। উহাতে স্বামীদিগের প্রকৃত অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু যদি স্ত্রীদিগের অসতীভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে, তবে তাহা সাধারণ সমাজের অসতীভাব বলিয়া মনে করিতে হইবে না। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বা তৎসদৃশ লোকেরা যে সকল স্ত্রীসম্প্রদায়ে বিচরণ করিতেন, আমরা ঐ সকল অসতীভাব তাহাদেরই সামগ্রী বলিয়া মনে করিতে চাহি।

ভারতের বিদ্যাবর্ণনা পাঠ করিলে আমাদের এক বিষয়ে নূতন জ্ঞান হইয়া থাকে। বোধ হয় যেন ধনীদিগের সংসারে স্ত্রীগণ সঙ্গীত ও বিদ্যাচর্চ্চা করিত। যেন কোন কোন স্থলে স্বয়ম্বরারও অনুমোদন হইত। অবশ্য আমরা বিদ্যার বর্ণনা পাঠ করিয়াই এইরূপ সংস্কার উপার্জ্জন করিয়াছি। পাঠক সম্রাট জাহাঙ্গীরের মহাসভার কিঙ্কিনী নামক গীতকরী রমণীদিগের বিবরণ পাঠ করিয়া থাকিবেন। বিদ্যার সহচরীগণের বিবরণ পাঠ করিলে যেন আমাদের ঐ সকল কিঙ্কিনীর স্মরণ হইয়া থাকে। এই সকল অনুধাবন করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, সমস্ত বঙ্গসমাজের না হউক, কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি উপরাজগণের অন্তঃপুরে এক সময়ে মোগল বিলাসের আবির্ভাব হইয়াছিল।

ভারতের রচনা রাজসংসারের অনুকৃতি হইলেও সুয়ো দুয়োর স্থলে ওরূপ বলিয়া বোধ হয় না। তখন বোধ হয় যেন ভারত সাধারণ সমাজের অবস্থাই বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার ভবানন্দ মজুমদার হইতে সুয়ো দুয়োর বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; আমরা ইতিপূর্ব্বে দুয়োর যে সকল দুঃখ ও মনোভঙ্গ বর্ণনা করিয়াছি তাহা ভারতের পশ্চাল্লিখিত বর্ণনায় অতি সংক্ষেপে সুপ্রকাশিত হইয়াছে।—

বড় রাণীর নিকটে মাধীর বাক্য।

বড় রাণী গো—
ঠাকুর হইলা রাজা তুমি রাণী গো।
যুবা সুয়া বুড়া দুয়া সবে জানি গো।
সুয়া যদি হবে শুন মোর বাণী গো।
মাধী লয়ে ছোট করে কাণাকাণি গো।
তোমারে না দিয়ে হেন অনুমানি গো।
মাধী পাছে পড়ি দেয় পান পানি গো।
কত তন্ত্রমন্ত্র জানে সে নাপানী গো।
ছোট যুবা প্রভু তাহে যুবজানি গো।
আধবুড়া তুমি তাহে অভিমানী গো।
ছোটর ঘরেতে হবে রাজধানী গো।
তার ঘরে ঠাকুরের আমদানী গো।
ছোটরে বলিবে লোকে মহারাণী গো।
তোমরে বলিবে বুড়া ঠাকুরাণী গো।
হাত তোলা মত পাবে অন্ন পানি গো।
বড় হয়ে ছোট হবে মান হানি গো।
পুত্রবতী গুণবতী বট জানি গো।
যৌবনে সে পতিমন লবে টানি গো।
রূপবতী লক্ষ্মী গুণবতী রাণী গো।
রূপেতে স্বামীর বশ চক্রপানি গো।
আগে যদি ঠাকুরেরে ডাকি আনি গো।
ছোট পাছে পথে করে টানাটানি গো।
টেনেটুনে বাঁধছাঁদ খোঁপাখানি গো।
শাড়ী পর চিকণ শ্রীরামখানি গো।
দেহড়ীর কাছে থাক হয়ে দানি গো।
ঘরে আন ধরে করে টানাটানি গো।

কেহ কেহ বলেন যে, পুনর্ব্বিবাহ প্রভৃতি স্থলে প্রাচীন বঙ্গমহিলা সাতিশয় গ্রাম্যতা প্রকাশ করিত। তাঁহারা আরও বলেন, বাসর-গৃহে উহারা যেরূপ উপদ্রব করিত তাহাতে আপাততঃ ইহাই বোধ হইতে পারে যে, স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলে উহারা সমুদায় লজ্জা পরিহার করিয়া অশ্লীলতা অকাতরে পরিগ্রহ করিত।

আমরা পুনর্ব্বিবাহ নিয়মাদির বর্ত্তমানে অনুমোদন করি না, কিন্তু পুরাস্থলে ঐরূপ করিয়া থাকি। আর্য্য রাজাদিগের সময়ে পুরোহিতেরা লোক সংখ্যা গ্রহণ করিত। বৎসর কত স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ হইয়া থাকে এবং কিরূপ বয়সেই বা পুনর্ব্বিবাহ হয়, পুনর্ব্বিবাহ নিয়ম তাহা জানিবার একটী সুন্দর উপায় সন্দেহ নাই। ইংরাজ রাজারা লোকসংখ্যা গ্রহণ স্থলে নানারূপে সন্দেহভাজন হইয়া থাকেন, কিন্তু আর্য্যদিগের ওরূপ হইতে হইত না, তাঁহারা সমুদায় প্রথাই হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত করিয়াছিলেন। প্রজারা মনে করিত যে, তাহারা ধর্ম্মানুরোধে ওরূপ করিতেছে; এবং আপনা হইতেই বাটীর সমুদায় গূঢ় সংবাদ প্রকাশ করিয়া ফেলিত। রাজারা বিনা যত্নে সমুদায় রহস্য প্রাপ্ত হইতে পারিতেন। এইজন্যই পুনর্ব্বিবাহ প্রভৃতির প্রথা হইয়াছিল। এবং এইজন্যই আমরা ইহার অনুমোদন করিয়া থাকি। তবে বর্ত্তমানে ওরূপ করিতে পারি না বটে। কারণ এখন আর আর্য্যদিগের রাজত্ব নাই, এবং লোকসংখ্যাও ভিন্ন প্রকারে গৃহীত হইয়া থাকে।

আর্য্যদিগের ভবিষ্যৎ গণনা যে অনেকস্থলেই বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহার এই এক কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। মনে করুন্ যেন পুনর্ব্বিবাহের সময় নিরূপণ করা হইল, যেন স্থির করা হইল যে অমুক গ্রহের অমুক স্থানে অবস্থিতি সময়ে এত সংখ্যক বালিকার ঐরূপ হইয়াছিল। অনন্তর কালে দেখিতে পাওয়া গেল, যে তাহাদের গর্ব্বে যত সন্তান জন্মিয়াছিল, তাহার অধিকাংশই মরিয়া গেল। ইহাতে অবশ্য সাকল্যে একপ্রকার স্থির করা যাইতে

পারে যে, অমুক সময়ে স্ত্রী পুনরূঢ়া হইলে তাহার গর্ব্বের সন্তান বাঁচিবে না। ফলতঃ আর্য্যদিগের গণনা সকল এইরূপে সংগৃহীত হইত বলিয়াই এতদূর বিশুদ্ধ হইতে পারিত। বর্ত্তমানে দেশকালের কত ভেদ ঘটিয়াছে, তথাপি সংস্কৃত জ্যোতির্জ্ঞেরা গণনা করিয়া অনেক স্থলেই আমাদিগকে আশ্চর্য্য করিয়া থাকেন। সাহেবদের সময়ে সমুদায় বিবরণই প্রায় অলীক হইয়া থাকে। কারণ প্রথমতঃ, লোকে কর বৃদ্ধির ভয় করিয়া থাকে এবং রাজপুরুষমাত্রকেই অবিশ্বাস করে; দ্বিতীয়তঃ, যাহাদের হস্তে লোকবিবরণ সংগ্রহ করিবার ভার দেওয়া হয়, তাহারা কেবল বেতনের অনুরোধ রক্ষা করিয়া চলে, সংগৃহীত বিবরণ কতদূর শুদ্ধাশুদ্ধ হইল কেহই তাহা অন্তরের সহিত পরীক্ষা করিতে চায় না; তৃতীয়তঃ, আবার উচ্চতম কর্ম্মচারিদের ত্বরাপরতা এত অধিক হয় যে ব্যস্ততাবশতঃ মতি স্থির থাকিতে পারে না। এ দিকে সংখ্যা মিলিতেছে না, ওদিকে সমষ্টি মিলিতেছে না, ওদিকে তাড়াতাড়ি করা হইতেছে, কাজেই ক স্থানে খ হইতেছে। এরূপ বিবরণে নির্ভর করিয়া কখনই বলিতে পারা যায় না যে, অমুক সময়ে অমুকদেশে বা অমুক লোকের এইরূপ পরিবর্ত্ত হইতে পারিবে। আমরা এই সকল কারণেই আর্য্য-রাজদিগের পুনর্ব্বিবাহাদি পূর্ব্বোক্ত প্রথা সকল অনুরূপ বলিয়া মনে করি। অতএব পাঠক বোধ হয় আমাদিগকে অশ্লীলতার পক্ষপাতী বলিয়া তিরস্কার করিবেন না।

বাসর-গৃহেরও এইরূপ একটী প্রশস্ত উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কন্যারত্ন বাস্তবিকই মহাধন হয়, তবে তাহাকে পরহস্তে প্রদান করিবার সময়ে অবশ্যই কষ্ট হইয়া থাকে। "শকুন্তলা গমন করিতেছে, ইহাতে আমারই মন আজি কেমন কেমন করিতেছে, আমি বনবাসী ঋষি, মায়াদির বন্ধন অতিক্রম করিয়াছি, তথাপি আমার হৃদয় বিচলিত হইতেছে, অতএব তনয়াবিরহে যে গৃহীদিগের মন পীড়িত হইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি।" কালিদাসের কণ্ব এইরূপ কহিয়াছিলেন। আমরাও এই-

রূপ কহিয়া থাকি। "কতই লালন করিয়াছিলাম, সোণার লতা হেলিয়া দুলিয়া নয়নের পথে কতই ক্রীড়া করিয়াছিল, এখন উহাকে কোন্ হৃদয়ে পরের হাতে নিঃক্ষেপ করিব," এরূপ চিন্তা কন্যা-বিবাহ সময়ে পিতামাতামাত্রেরই মনে উপস্থিত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে কন্যা কিরূপ হস্তে সমর্পিত হইল এবং যাহার হস্তে সমর্পিত হইল, সে আমাদের ব্যবহারে কিরূপ আপ্যায়িত হইতে পারিল, এ সকল জানিবার নিমিত্তও কৌতূহল হইতে পারে। বাসর-ঘরে এই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। এক জন অপরিচিত পুরুষকে যদি এক রাত্রির মধ্যে আত্মীয় করিয়া লইতে হয়, তবে তাহা বাসর-ঘর ভিন্ন আর কোন উপায়ে হইতে পারে না। আপাততঃ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাকে যত বিশ্বাস প্রদর্শন করিবে, সে ব্যক্তি ততই আপ্যায়িত হইবে। ডাইনের কোলে পো সমর্পণ কর, সে আর তখন পূর্ব্ববৎ হিংসা করিবে না, সে তখন তাহাকে প্রীতি করিতে শিখিবে। বঙ্গসমাজে স্ত্রীর অপেক্ষা গূঢ় পদার্থ আর কিছুই নাই। আমি তোমাকে এত আত্মীয় ভাবিয়া থাকি যে, তোমার সমক্ষে আমার বাটীর স্ত্রীদিগকেও উপস্থিত করিতে পারি, এরূপ আত্মীয়তা চরম আত্মীয়তা সন্দেহ নাই। বাসর-ঘরে ঐরূপ আত্মীয়তা প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। নিতান্ত অকৃতজ্ঞ লোকেও ওরূপস্থলে কৃতজ্ঞতা শিখিয়া থাকে। ফলতঃ কোন ব্যক্তিকে এক রাত্রির মধ্যে আত্মীয় করিয়া লইতে হইলে, বাসর-ঘর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় আর কিছুই হইতে পারে না। কন্যাদানস্থলে এইরূপ আত্মীয়তা আবশ্যক হইয়া থাকে।

ধর্ম্মের পুরস্কার।

অস্তাচলে দিনমণি করিল পয়ান,
হাসিল কুমুদ সরে প্রফুল্ল-বয়ান।
আশুগতি দ্বিজকুল পশিয়া কুলায়,
স্বভাবের শোভা হেরি বিভুগুণ গায়।

জাতি, যুথী, শেফালিকা, মল্লিকা, মালতী,
গুলাব, রজনীগন্ধা, কামিনী যুবতী,
খুলিয়া ঘোমটা দর-হসিত বদনে,
ধরিল মোহন বেশ নিশি-আগমনে;
কুলবধূগণ যথা নানা অলঙ্কারে,
বসন ভূষণ আর মণিময় হারে,
সাজিয়া সুষম সাজে বিকাশি বদন,
নব-পরিণীতা-বধূ করে দরশন।
উদিল সুধাংশুনিধি বিমল অম্বরে,
উজলি নিকুঞ্জ শোভে খদ্যোত নিকরে।
চকোর চকোরী সনে বিহরে গগনে,
অভিমানে কুমুদিনী বাঁচে না জীবনে।
শীতল অনিল বহে জুড়ায় শরীর,
মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে সরসীর নীর।
সহসা এহেন কালে নীরদমালায়
ব্যাপিল গগনদেশ মহত ঘটায়।
ঘনশ্বাসে প্রভঞ্জন বহিতে লাগিল,
নিবিড় তামস-জালে ভুবন ভরিল।
ধারাপাতে বসুধার বসন তিতিল,
অম্বুপানে কপিঞ্জল* তৃষা নিবারিল।
কাদম্বিনী-কটীতটে ভাতিল চঞ্চলা,
রজত-রসনাদাম—চকিতে উজলা।
ডাকিতে লাগিল নভঃ ভীম গরজনে,
কলাপী বরহ খুলি নাচিল সঘনে।
হেনকালে কে তোমরা ভীষণ প্রান্তরে,
রসাল তমাল-তলে বিরস অন্তরে?

---

* চাতক।

শীকর-নিকরাঘাতে ভিজেছে বসন,
কলেবর থর থর কাঁপায় পবন।
পলিত-সংযুত বলী-সঙ্গত শরীর
জনেক ভিক্ষুক সাথে তনয় সুধীর,
প্রভাতে কুটীর হ'তে লইয়া বিদায়,
গিয়াছিল নরপুরে ভিক্ষার আশায়।
আসিতে আসিতে পথে হইল রজনী,
দেখিতে দেখিতে তমঃ গ্রাসিল ধরণী।
পড়িতে লাগিল বৃষ্টি মুষল ধারায়
তরুর শরণ তাই লইল দোঁহায়।
বিপদে চঞ্চলমতি বাক্য নাহি সরে,
নয়নের জলে দোঁহে ভাসিছে কাতরে।
নীরব অবনী এবে নিশীথ সময়
হ'য়ে ভয়ে বেয়াকুল বৃদ্ধ মুরছয়।
ক্ষণেক বিলম্বে পুনঃ লভিয়া চেতন,
কাতরে কহিছে সুতে করুণ বচন—
"দেখ তাত! একে এই গভীর যামিনী
আবার তিমির ঘোর ঘেরেছে মেদিনী;
যাবত দিবস গেল নিছু অনশনে
জ্বলিছে জঠরানল সহিব কেমনে?
শীতবাতে কাঁপে তনু থর থর করি
আরদ দুকূল তাহে কেমনে বা ধরি?
আজু তমা পরভাতে যাইব কুটীর
কিন্তু এবে কি করিয়া বাঁচাই শরীর?
কলিঞ্জ*-নির্ম্মিত গেহ এই ঝঞ্ঝাবাতে,
বুঝি বা ভূতল-শায়ী তাহার আঘাতে।

* দরমা।

সে যা হৌক, বৎস! তছু মলিন বদন
হেরিলে এ দেহে আর থাকে না জীবন।
কেঁদো না কেঁদো না সুত, কান্দিলে কি হবে,
ভিখারি-তনয় বই কে এ দুখ সবে?
হায়, বিধি! কত পাপ পূরব জনমে
করেছি আমরা তাই দহিছ মরমে।"
এতেক শুনিয়া যুবা হইল অথির
দুখের হুতাশে তার দহিল শরীর;
শতগুণ বেগে অশ্রু অপাঙ্গ পূরিল,
দর দর ধারে মরি বহিতে লাগিল!
ঘনশ্বাসে ঘন ঘন কাঁপিল হৃদয়,
গদ গদ স্বরে কহে বাক্য সুধাময়—
"হে পিতঃ! এ দুখ তব কিরূপে দেখিব
পরাণ থাকিতে তাহা কেমনে সহিব?
একে বৃদ্ধ তাহে পুনঃ আছ অনশনে,
তনয় থাকিতে দুঃখ, ধিক্ এ জীবনে!
শিশুকালে করেছিলে লালন পালন,
দেখ আজু করি আমি সার্থক জীবন।
আইস হে তাত! মম পৃষ্ঠের উপর
এখনি লইয়া যাব কুটীর ভিতর।"
এই কথা বলি যুবা করপট-ধারী,
আরোপিল পৃষ্ঠদেশে জনক ভিখারী।
অনাহারে শীর্ণকায় ভরসা সম্বল,
সাগর-সলিলে তরী যথা হীনবল।
নিবিড় তামস সেই তাহা ভেদ করি,
নির্ভয়ে চলিল যুবা প্রান্তর উপরি।
কমলা মায়ার সাথে এ হেন সময়
মাধবে ভেটিতে যান প্রফুল্ল-হৃদয়।

অন্তরীক্ষ হ'তে দোঁহে দেখিল সহসা—
প্রান্তরে যুবক এক চলিছে অঞ্জসা*।
পৃষ্ঠদেশে বৃদ্ধ তাত করিয়া ধারণ
নির্ভয় অন্তরে যুবা করিছে গমন।
মায়ায় সম্বোধি রমা মাধব-রমণী
কহিতে লাগিলা মৃদে কমল-নয়নী—
"হের দেখ সখি অই জনক-বৎসল
তরুণ তনয় ধীর অন্তর বিমল,
আরোপি আপন পিতা পৃষ্ঠের উপর
চলিছে তামস ভেদি অটল-অন্তর।
উহারা উভয়ে আহা অতি দীনহীন!
দুখের সন্তাপে সদা বদন মলিন!
যাও শীঘ্র গড় তুমি সুরম্য মন্দির,
দোঁহার যাতনা হেরি হতেছি অধীর।
যাই আমি যদি পারি স্বান্তনা সলিলে
নিবাতে ও দুখানল; কি হবে বধিলে?"
মোহন মুরলীজাত মধুর কাকলী
তা হ'তে অমিয়াধারা বচন-আবলী
শুনিতে লাগিল যুবা যোড় করি পাণি
সাধূচিত পুরস্কার সেই দৈববাণী—
"হে বৎস হেরিয়া তব জনক-ভকতি,
হইলাম আজু আমি হরষিত অতি,
হবে না যাইতে, বাছা, সে কুটীরে আর,
সুন্দর প্রাসাদ অই ভবন তোমার,
ধরমে রাখিও মতি পূরিবে কামনা,
দেখ যেন ধনমদে এদিন ভুল না।"

---

* দ্রুত।

বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ সংস্কার।

আমাদিগের দেশে যেরূপ বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা হইতে যাদৃশ অনিষ্টোৎপত্তি হইতেছে, বোধ হয় আর কোন প্রথা হইতে তাদৃশ অপকার সাধিত হইতে পারে না। বাল্যবিবাহ এবং তন্নিবন্ধন অসমবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ-অচলন, এই ত্রিবিধ কারণ হইতে বঙ্গহিন্দু-সমাজের ক্রমশঃ অধোগতি হইতেছে। এবং যতকাল এগুলি দেশহিতৈষী মহোদয়গণ কর্ত্তৃক সংশোধিত না হইতেছে, ততকাল আমরা প্রকৃত উন্নতি বিষয়ে আশা করিতে পারি না।

বাল্যবিবাহ বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অধিক কি, মনুর সময়েও দ্বাদশ বর্ষের পূর্ব্বে বালিকাদিগের বিবাহ হইত। সুতরাং এ প্রথা যে মুসলমান রাজ্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এরূপ আমরা কোন প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারি না। যখন মনু পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, দ্বাদশ বর্ষকালে কন্যা রজস্বলা হয় এবং কন্যা রজস্বলা হইয়াও তাহার বিবাহ না হইলে পিতাকে নরকগামী হইতে হইবে, তখন স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, মুসলমানদিগের আসিবার অনেক পূর্ব্ব হইতে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। কেহ কেহ এরূপ বলিতে পারেন যে, সংস্কৃত নাটকাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া বোধ হয় যে, পুরাকালে স্ত্রীলোকেরা ষোল, সতের বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অনূঢ়া থাকিতেন। মালতী-শকুন্তলা প্রভৃতি ইহার উদাহরণ স্থল। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, পুরাকালে প্রাজাপত্য ভিন্ন অপরবিধ বিবাহ প্রচলিত ছিল, তখন পিতামাতা যে সাধারণতঃ কন্যাগণকে দ্বাদশ বর্ষের পরেও অনূঢ়া রাখিতেন, ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে না। বাস্তবিক পূর্ব্বে অনেকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ করিতেন। সুতরাং দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়াও গান্ধর্ব্ব বিবাহে কোন প্রকার বাধা থাকিত

না। কিন্তু দ্বাদশ বৎসর পরে প্রাজাপত্য বিবাহ যে হইতে পারিত না, ইহা মনু হইতে স্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়।

এক্ষণে দেখা যাউক বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকাতে আমাদিগের দেশে কিরূপ অনিষ্ট উৎপাদিত হইতেছে। আমরা যে বয়সে কন্যার বিবাহ দিয়া থাকি, সে বয়সে তাহার মনোবৃত্তি ও অবয়ব সমুহের সম্যক পুষ্টিসাধন হয় না। সুতরাং বিবাহ যে কিরূপ পদার্থ, তাহা তাহাদিগের কেহ জানিতে পারে না। পতির প্রতি ভার্য্যার কিরূপ আচরণ বিধেয়, তাহা দশমবর্ষীয়া বালিকাদিগের বুদ্ধির অগম্য। যখন বালিকাচাপল্য পরবশ হইয়া স্বচ্ছন্দে স্বাস্থ্যকর ক্রীড়ায় মত্ত হইয়া শরীর ও মনের উৎকর্ষ লাভের নিমিত্ত যত্নবান হইবে, তখন তাহাদিগকে সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া নানাবিধ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। কোথায় সুস্থশরীরে মনের উন্নতির নিমিত্ত নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিবে ও নির্দ্দোষ আমোদে স্বাধীনচিত্ত হইয়া প্রীতি লাভ করিবে, না অল্প বয়সে মাতৃপদে বৃতা হইয়া স্বাস্থ্যে জলাঞ্জলি দিতে হইতেছে। কোথায় পিতামাতার চিন্তার পাত্র হইয়া সুখে দিনাতিপাত করিবে, না স্বকীয় শিশুর নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া কথঞ্চিৎ কালক্ষেপ করিতে হয়। স্বামী কি বস্তু ইহা জানিতে না জানিতে ইহারা জননী হইয়া বৃদ্ধা হয়েন! কি আক্ষেপের বিষয়, যাহারা স্বয়ং সুস্থশরীরা ও সম্যক পুষ্টি প্রাপ্তা হইলে, সবল ও সুস্থ শিশুসন্তান জন্মগ্রহণ করিতে পারে, তাহারা অল্প বয়সে প্রসূতি হইয়া দুর্ব্বল ও স্বল্পায়ু সন্তানসন্ততি প্রসব করিতেছেন। ইহাতে ইহাদের কিছুমাত্র দোষ নাই। ন্যায়ান্যায় জানিবার পূর্ব্বেই ইহাদিগের বিবাহ হইয়া থাকে। পাত্র কে, বা পাত্র কিরূপ, ইহা জানিবার পূর্ব্বেই ইহাদিগের বিবাহকার্য্য সম্পাদিত হয়। সুতরাং যেস্থলে পিতামাতারা সর্ব্বেসর্ব্বা ও কন্যাগণ কিছুই নহে, সেস্থলে বিবাহ কথা প্রয়োগ ও সেই বিবাহসম্ভূত অনিষ্টের নিমিত্ত তাহাদিগকে অপরাধী করা নিতান্ত অযুক্তিকর বোধ হয়।

পুনরায় বাল্যবিবাহে অপরবিধ অপকার সাধন করে। এই প্রথা অনেক স্থলে অসমবিবাহের কারণ হইয়া পড়ে, অর্থাৎ এ প্রথা প্রচলিত থাকাতে স্ত্রী পুরুষের বয়সের অনেক বৈষম্য দৃষ্ট হয়। কন্যা দ্বাদশের পূর্ব্বে বিবাহ করিবে এবং পুরুষেরা যখন ইচ্ছা বিবাহ করিবে, এরূপ বিধি প্রয়োগ হওয়াতে বৃদ্ধ শিশুকন্যাকে বিবাহ করিতেছে। ইহাতে যে কি ঘোর অনিষ্টোৎপত্তি হয়, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। প্রথমতঃ এরূপ অবস্থায় প্রকৃত প্রণয়ের সঞ্চার হইতে পারে না। কারণ স্ত্রী পুরুষের বয়সের বিংশতি বা ততোধিক বৎসর বিভিন্নতা থাকিলে পত্নী পতিকে পিতার তুল্য জ্ঞান করিতে পারে কিন্তু কদাচই স্বামী বলিয়া মনের একতা দেখাইতে পারে না। আর প্রণয় হইলেও ইহা অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে না। অপর পক্ষে বৃদ্ধের সহিত পরিণীতা হওয়াতে অতি অল্পকালের মধ্যে স্ত্রী বিধবা হইবার সম্ভাবনা।

বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা যেরূপ পাত্রের বিষয় কিছুই অবগত হইতে পারেন না, পাত্রও সেইরূপ কন্যার বিষয় কিছুই জানিতে পারেন না। অস্মদ্দেশে বিবাহ কার্য্য প্রায়ই পিতা মাতা বা অন্য কোন গুরুজনকর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়া থাকে। পুত্র যদি বিবাহের পূর্ব্বে ভাবিবধূকে দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা হইলে তিনি নির্লজ্জ বলিয়া পরিগণিত হইলেন। কি আশ্চর্য্য! যাহারা যাবজ্জীবন একত্রে বাস করিবে, যাহাদিগের পরস্পরের প্রণয় সদ্ভাব চিরসুখের কারণ, তাহারা বিবাহের পূর্ব্বে কেহ কাহার মুখাবলোকনেও সমর্থ হয়েন না। ইহাতে প্রকৃত প্রণয়ের অধিক সম্ভাবনা নাই। যাহাকে বিবাহ করিলাম, তাহার কি গুণ আছে কি গুণ নাই, তাহার স্বভাবের সহিত আমার স্বভাবের কতদূর সাদৃশ্য আছে, প্রভৃতি বিষয়গুলি অবগত না হইয়া পরিণীত হওয়াতে সম্পূর্ণ মিলনের কিছুই সম্ভাবনা থাকে না। দৈব বশে যদি একরূপ স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিদ্বয়ের বিবাহ হয়, তাহা হইলেই গাঢ় প্রণয়ের সম্ভাবনা, নচেৎ নহে। এজন্য অনেক স্থলে স্পষ্ট বিরোধ দেখা

যায়, অপর কোনস্থলে স্পষ্ট না হইয়া মনের মধ্যেই লুকাইত থাকে। উপর্য্যুক্ত পাঠে কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে, অস্মদ্দেশে প্রকৃত প্রণয় দৃষ্ট হয় না। আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য যে, ঐরূপ উদাহরণস্থল অধিক নহে। স্ত্রী অসতী না হইলেই যে পতির প্রতি প্রণয়াসক্ত হয় এরূপ মত নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। ধর্ম্ম পরবশ হইয়া অস্মদ্দেশের অনেক রমণী সতী থাকিতে পারেন, কিন্তু তাহা বলিয়া যে তাঁহাদিগের সকলেই স্বামীর প্রতি অনুরাগিণী হয়েন, এরূপ আমাদিগের প্রতীতি হয় না। সত্যবটে অনেকেই ধর্ম্মভীতা হইয়া পতির বাধ্য হয়েন এবং ভাগ্যবশীভূতা হইয়া আপনাকে সুখী করিতে চেষ্টা করেন ও অনেক স্থলে সফলপ্রযত্ন হয়েন, কিন্তু তথাপি ইহাকে আমরা প্রকৃত প্রণয় বলিতে পারি না। আর বিবাহ হইয়াও অনেক স্ত্রী পুরুষের শিথিল চরিত্র দেখিয়া আমরা এরূপ বিবাহের অনুমোদন করিতে পারি না। বিবাহের পূর্ব্বে পরস্পর পরস্পরকে অবগত হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

আমাদিগের দেশে বহুবিবাহও অনেক অমঙ্গল সাধন করিতেছে। দাম্পত্য প্রণয় কোন প্রকারে বিভাগ করা যায় না। এক-জন পুরুষের একের অধিক পত্নী হইলে সকলের প্রতি সমান অনুরাগ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইন্দ্রিয়-পরবশ বা ধন-পরবশ হইয়া বহুবিবাহ সম্ভবে, কিন্তু প্রণয় বশীভূত হইলে কেহই দ্বিতীয় নারীকে পত্নীত্বে বরণ করিতে পারে না। অপর পক্ষে বহুরমণীর এক পতি হইলে তাহাদিগের কোন প্রকারে সুখ হইতে পারে না। ইহা বুঝাইতে অধিক বলিতে হয় না। এক সপত্নী শব্দে সকলই বুঝায়। সপত্নী শব্দে স্ত্রীলোকেরা কিরূপ ভীতা হয়েন তাহা সকলেই জানেন। আবার পতির সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াতে অনেক কুলমহিলা কুলটা হইতেছেন। কি আক্ষেপের বিষয়, যাঁহারা পবিত্রতাগুণে জগৎ আলো করিবেন, তাঁহারা পুরুষের স্বার্থপরতা ও পাপাচরণের দারুণ যন্ত্রণাভোগে অসমর্থ হইয়া অসতী হইতেছেন। সুখের বিষয় এক্ষণে বহুবিবাহ প্রথা

উঠাইবার নিমিত্ত সহৃদয় কতিপয় ব্যক্তি ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু দুর্দ্দান্ত দেশাচার যে একেবারে উন্মূলিত হইবে ইহা বিশ্বাস হয় না। কিছুকাল অতীত না হইলে এ পাপ প্রথা উঠিয়া যাইবে না। বিষময়ী কৌলীন্য প্রথা না উঠিলে বহুবিবাহের শেষ হইবে না।

আর একটী কুপ্রথা—বিধবাদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ না দেওয়া। সকল সভ্য দেশেই বিধবারা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে কিন্তু এখানে ঐরূপ হইতে পারে না। বিধবাদিগের বিবাহ শাস্ত্র-সম্মত হইয়াও অতি অল্পলোকে ইহাদিগের বিবাহ দিতে সাহসী হয়েন। দেশাচার যে কি ভয়ঙ্কর পদার্থ তাহা এস্থলে বুঝা যায়। অল্প বয়সে কন্যা বিধবা হইতেছে, ইহা দেখিয়া পিতার মনে কি ক্লেশ উদয় হয় না! দারুণ বিধবাব্রত ধারণ করিয়া প্রতি মাসে অনাহারে দুই দিবস যাপন করিতে হইবে ইহা দেখিয়া কি পিতার মনে ব্যথা হয় না! গ্রীষ্মতাপে তাপিত হইয়া তৃষ্ণার্ত্তা কন্যা যৎপরোনাস্তি ক্লেশভোগ করিতেছে, ইহা দেখিয়া কি পিতার অন্তঃকরণে করুণার উদ্রেক হয় না! আমরা জানি কত শত ব্যক্তি বিধবাদিগের এ দারুণ যন্ত্রণা দেখিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদিগের কত সংখ্যা যথার্থ বিবাহ দিতে সাহস করিয়াছেন। দেশাচার-ভীত হইয়া ইহাঁরা শাস্ত্রানুমোদিত ব্যাপারে হস্তার্পণ করিতে পারিতেছেন না। কি ভয়ঙ্কর দেশাচার! পুরুষ পত্নীর মৃত্যুতে পুনরায় বিবাহ করিতেছে কিন্তু পতিবিয়োগে কোন রমণীর পুনর্ব্বার পাণি-গ্রহণ করিবার প্রথা নাই। পুরুষের যদি কষ্ট হইতে পারে, স্ত্রীলোকের কি কষ্ট হয় না! যখন দেখা যায় যে অনেকে বালিকা অবস্থাতে বিধবা হন, পতি কি ইহা জানিবার অবসর না পাইয়া যখন অনেকেই বিধবা হইতেছেন, তথাচ তাহাদিগকে বৈধব্য-যন্ত্রণাভোগ করিয়া যাবজ্জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। শারীরিক ও মানসিক ক্লেশভোগ করিতে কি তাহাদিগের জন্ম হইয়াছিল! যে দিবস হইতে বিধবাদিগের বিবাহ সুচারুরূপে

সম্পাদিত হইবে, সে দিবস এক্ষণে অনেক অন্তর বটে। কিন্তু অন্য দেশের ন্যায় এদেশেও বিধবাবিবাহ প্রথা যে এককালে প্রচলিত হইবে এরূপ আমাদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস।

বিবাহ সম্বন্ধে আর দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। সকলেই অবগত আছেন, আমাদিগের কন্যার বিবাহ দেওয়া কি কষ্টকর ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। সামান্য গৃহস্থেরা কথঞ্চিৎ অর্থোপার্জ্জন করিয়া কন্যার বিবাহ দিয়া সর্ব্বস্বান্ত হয়। বিবাহ 'সম্বন্ধ' আনীত হইলে, দেনা পাওনার ফর্দ্দ দেখিয়া কন্যাকর্ত্তা অস্থির হইয়া পড়েন। কন্যাকর্ত্তাকে ফর্দ্দমত দ্রব্যাদি দিতেই হইবে নচেৎ বিবাহ হয় না, সুতরাং ঋণগ্রস্ত পর্য্যন্ত হইতে হইল। পাত্রপক্ষীয়েরা অনেক সময়ে অসঙ্গত ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইহাতে অপর পক্ষদিগকে সাতিশয় ক্লেশে পতিত হইতে হয়। আমরা বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছি যে, এরূপ ভিক্ষা-প্রথা সকলেই ঐক্য হইয়া একেবারে রহিত করুণ। যাহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই দিউন। ক্ষমতার অধিক যেন কাহাকেও না দিতে হয়। কন্যাভারগ্রস্ত ব্যক্তিকে এরূপে উৎপীড়ন করিলে তাহার কষ্টের পরিসীমা থাকিবে না।

সমাজসংস্কার বিষয় বলিতে গেলে পারিবারিক সংস্কারের বিষয় কিছু বলা নিতান্ত আবশ্যক। বঙ্গমহিলার পূর্ব্ব এক সংখ্যায় পারিবারিক সংস্কার বিষয়ে কিছু লিখিত হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে এ বিষয়ে অধিক বলিবার আর প্রয়োজন নাই।

বহুপরিবার একত্রে বাস প্রায় সকল দেশের প্রথম অবস্থাতে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সমাজের উন্নতির সহিত কিছু কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। এবং সভ্যতার বৃদ্ধি হইলে পর পরিবারবর্গ পৃথক হইয়া পড়ে। ইউরোপের এক পরিবারে বহু কুটুম্ব একত্রিত হইতে দেখা যায় না। অনেকে একত্রে বাস করিলে পরস্পর দ্বন্দ্ব হইবার সম্ভাবনা, ইহা দেখিয়া ইউরোপীয়েরা অনেকে এক বাটীতে বাস করিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু অস্মদ্দেশে বহু পরিবার একত্রে

বাস করিয়া পরস্পর কলহ করিয়া থাকেন। ইহারা ভ্রমেও ভাবেন না যে, পৃথক্ থাকিয়া সদ্ভাব হওয়া অপেক্ষা সুখকর আর কিছুই হইতে পারে না। একত্রে বাস করিয়া মিলন থাকিলে নিতান্ত সুখের বিষয় তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু, যখন ইহার বিরুদ্ধে শত শত দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে, তখন একত্রে বাস করা কোনরূপে যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না।

আমাদিগের পরিবার মধ্যে পরস্পরের যেরূপ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, তাহা কিছু অংশে দোষ-স্পৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। স্ত্রী ও পুরুষ সকলের সম্মুখে বা দিবাকালে প্রায় অপরিচিতের ন্যায় দেখা যায়। বধূ কিঞ্চিৎ স্ফুটস্বরে আলাপ করিলে নির্ল্লজ্জা বলিয়া তিরস্কৃতা হইবে এবং স্বামীর সহিত কোন বিশুদ্ধ আমোদে প্রবৃত্ত হইলে সকলের হাস্যাস্পদ হইবে। এরূপ অনৈসর্গিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে হইলে সুখের কিছুই সম্ভাবনা থাকে না। পত্নীকে সর্ব্বদা অবগুণ্ঠনে আবৃতা থাকিতে দেখিয়া অনেক যুবককে সংসারের প্রতি বিরত হইতে শুনা গিয়াছে। মাতা পিতা ভ্রাতা ভগিনী পত্নী প্রভৃতি পরিজনবর্গ একত্রে বসিয়া স্বচ্ছন্দে মধুরালাপে প্রবৃত্ত হইবে, ইহা অপেক্ষা আর অধিক সুখের বিষয় কি আছে। যাঁহারা পরস্পর প্রণয় রজ্জুতে বদ্ধ আছেন, তাঁহারা একত্রে সুখভোগ করিতে না পারিলে সংসারের প্রয়োজন কি? শ্বশুর বা ভ্রাতৃশ্বশুর প্রভৃতি শ্রদ্ধাস্পদ গুরুজনের নিকট বিশ্রব্ধচিত্তে অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া বধূ বাক্যালাপ করিলে যদি অপরাধিনী হইবেন, তবে পবিত্র পিতৃ-ভ্রাতৃ শব্দের প্রয়োজন কি। যাঁহারা ধর্ম্মপথে লইয়া যাইবেন, তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বা তাঁহাদিগের সহিত বাক্যালাপ করিলে যদি দূষিতা হইতে হইবে, তাহা হইলে ধর্ম্ম উপার্জ্জনের আশা নাই। স্বার্থপর পুরুষজাতি অজ্ঞতা বশীভূত হইয়া বা স্বক্ষমতা বিস্তৃতি নিমিত্ত যে প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন, তাহা চিন্তাশীল কোন ব্যক্তি অনুমোদন করিতে পারেন না।

আমাদিগের পরিবার মধ্যে আর একটী মহৎ দোষ দৃষ্ট হয়। আমরা দাস দাসীদিগকে প্রায়ই মন্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। সামান্য বেতনপ্রার্থী দরিদ্রজনেরা জীবিকার নিমিত্ত দাসত্ব স্বীকার করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশভোগ করিয়া থাকে। ইহার উপরে প্রভুকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইলে যন্ত্রণার পরিসীমা থাকে না। যাহাতে ভৃত্যেরা স্বচ্ছন্দমনে কার্য্য করিতে সক্ষম হয় সেরূপ ব্যবহার সকলের করা কর্ত্তব্য। উত্তমরূপে ব্যবহৃত হইলে তাহারা কতদূর উপকার সাধনে যত্নবান হইবে তাহা বলা যায় না। কিন্তু কটু বাক্য প্রয়োগ বা প্রহার করিলে তাহারা নিতান্ত অবশ হইয়া পড়ে এবং সুবিধা পাইলে অনিষ্ট করিতে ত্রুটি করে না। বাস্তবিক দাস দাসীদিগকে নম্রতা ও ভদ্রতার সহিত ব্যবহার করিলে উভয় পক্ষেরই সুবিধা ও সুখ হইতে পারে।

আমরা এই স্থলে আমাদিগের প্রবন্ধ শেষ করিলাম, আর অধিক লিখিতে হইলে প্রবন্ধের আয়তন বৃথা বৃদ্ধি হইবে। যে সকল দোষ পূর্ব্বে দেখাইয়াছি তাহার অর্দ্ধেক সংশোধিত হইলেও আমাদিগের সমাজ অনেক বিশুদ্ধ হইবে। সত্য বটে সম্পূর্ণ সংস্কার হইতে গেলে অধিককাল অপেক্ষা করে। কিন্তু এই সময় হইতে যত্ন করিলে আমরা কৃতকার্য্য হইব এরূপ আশা নিতান্ত নিষ্ফল হইবে না।

চোরবাগান বালিকা-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-সভা কর্ত্তৃক অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার পরীক্ষা।

এতদ্দেশীয় বালিকাগণকে বাল্যবিবাহ নিবন্ধন অতি অল্পকাল মধ্যেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হয়। এই অল্প সময়ে তাহারা যে কিছু শিক্ষালাভ করে, বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর, তাহার সম্যক আলোচনা না থাকায়, স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইতেছে না। বিবাহের পর অনেকে স্বেচ্ছাবশতঃ লেখাপড়ায় অযত্ন করেন, কতক নাটক ও নভেল পাঠ করাই বিদ্যাশিক্ষার পরাকাষ্ঠা

জ্ঞান করেন, এবং কতকগুলি বিদ্যার্থিনী শিক্ষার ইচ্ছা সত্ত্বেও সম্যক সাহায্য ও উৎসাহ না পাইয়া তদ্বিষয়ে বিরত হয়েন।

বিবাহিতা বালিকাগণ যাহাতে নির্দ্দিষ্ট উত্তম উত্তম পুস্তক পাঠ করিয়া জ্ঞান লাভ করিতে যত্নবান হয়েন, এই অভিপ্রায়ে উক্ত সভা নির্ব্বাচিত-পরীক্ষক দ্বারা উক্ত বালিকাগণকে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে প্রতিবৎসর পরীক্ষা করিবেন এবং উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করিয়া তাহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে সংকল্প করিয়াছেন।

পরীক্ষার নিয়ম।

১ম, মহিলাগণ যাহারা এই পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা স্ব স্ব নাম ও ধাম, চোরবাগান মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ৭৭ নং ভবনে, উক্ত সভার সম্পাদকের নিকট সত্বর প্রেরণ করিবেন।

২য়, মহিলাগণকে তিন মাস অন্তর তাহাদিগের স্ব স্ব পাঠের তালিকা উক্ত সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৩য়, বৎসরান্তে ছাত্রীগণকে সভার ব্যয়ে সম্পাদকের বাটীতে আহ্বান করা হইবে, এবং অন্তঃপুরে স্ত্রী-পরিদর্শকের সম্মুখে লিখিত প্রশ্নের দ্বারা পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। সম্পাদকের অন্তঃপুরে আসিতে কাহারও বিশেষ প্রতিবন্ধক থাকিলে, স্ত্রী পরিদর্শক কর্ত্তৃক লিখিত প্রশ্ন তাহাদিগের বাটীতে প্রেরণ করা হইবে এবং তিনি সেই স্থলে উপস্থিত থাকিয়া পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন।

৪র্থ। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীগণকে মাসিক বৃত্তি, অলঙ্কার এবং অন্যান্য পারিতোষিক প্রদান করা হইবে।

৫ম। আগামী বৎসরের পরীক্ষার নিমিত্ত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল নির্ব্বাচিত হইল।

সাহিত্য। গদ্য—শকুন্তলা। পদ্য—পদ্যপাঠ-৩য় ভাগ। ব্যাকরণ।

স্বাস্থ্যরক্ষা—রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কৃত। মাতৃশিক্ষা।

ইতিহাস—বাঙ্গালার ইতিহাস—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কৃত।

ভূগোল—ভূগোল বিবরণ—ভারতবর্ষের বিশেষ পরিচয় এবং চারি খণ্ডের সাধারণ জ্ঞান।

অঙ্ক—পাটীগণিত, ত্রৈরাশিক পর্য্যন্ত এবং শুভঙ্করী-সঙ্কেত।

রচনা।

এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষা হিতৈষীগণ আপন আপন পরিবারস্থ মহিলাগণের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে মনোযোগী হইয়া যাহাতে উক্ত সভার সহিত এক মত হইয়া এই মহৎ কার্য্যে বিশেষ যত্ন এবং সাহায্য প্রকাশ করেন, এই আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা।

চোরবাগান বালিকা-বিদ্যালয়ের পারিতোষিক।

গত ৭ই এপ্রেল শুক্রবার বেলা ৫৷৷০ ঘটিকার সময় উক্ত বিদ্যালয়ের অষ্টম সাম্বৎসরিক পারিতোষিক কার্য্য সমারোহের সহিত নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। বিদ্যালয়টী অতি সুন্দররূপে সুশোভিত হইয়াছিল। মান্যবর বিচারপতি ফিয়ার সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নী মাননীয়া ফিয়ার বালিকাদিগের হস্তে পারিতোষিক প্রদান করেন। সভাস্থলে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল। নানাবিধ সুদৃশ্য খেলনা, রৌপ্যমস্তকালঙ্কার, ছবি এবং উত্তম উত্তম বাঙ্গালা পুস্তক পারিতোষিক স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। পরে বালিকাগণের শিল্পকার্য্য দর্শন করিয়া সকলেই সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করেন, এবং শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীর শিল্পনৈপুণ্যতায় বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়া মাননীয়া ফিয়ার স্বয়ং তাহাকে একটী পারিতোষিক প্রদান করেন; আগামী বৎসরে মাননীয়া উড্রো শিল্পকার্য্যের নিমিত্ত একটী পারিতোষিক দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। হিন্দুমেলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দুইটী ছাত্রীকে উক্ত মেলার প্রদত্ত দুইটী রৌপ্যপদক এই সময় প্রদান করা হয়। পরে মাননীয়া ফিয়ারের স্বদেশ প্রত্যাগমনোপলক্ষে বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কৃতজ্ঞতার উপহার স্বরূপ নিম্ন লিখিত অভিনন্দন সভায় পাঠ করিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করে।

চোরবাগান বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক মাননীয়া মিসট্রেস্ ফিয়ারের অভিনন্দন।

দয়াবতি, মতিমতি, ফিয়ার - রমণি!
ধন্যবাদ প্রণিপাত লহ গো জননি!
অনুপম মনোরম দিলা পুরস্কার,
এতদিনে হ'ল মনে পরিশ্রম সার;
কিন্তু তুমি বঙ্গভূমি তেয়াগি সত্বর,
যাবে না কি সুখভোগী বিলাত নগর।
হায় হায়! একি দায় কে দিল সংবাদ,
হ'ল ইথে সব চিতে হরষে বিষাদ।
যাবে যদি রেখ মতি বঙ্গবালা প্রতি,
কাতরে ধরিয়া করে করি গো বিনতি।

তব পতি মহামতি জষ্টিশ ফিয়ার,
ধর্ম্মাগারে সুবিচারে ধর্ম্ম - অবতার।
গুণময় সদাশয় উদার - অন্তর,
কারুনিক অমায়িক মহিমা - সাগর।
বঙ্গমাতা - শুভদাতা বান্ধব - রতন,
শান্তমতি সভাপতি কে আর এমন?
তাঁর সনে হৃষ্ট মনে স্বদেশ - গমনে,
ঊর্দ্ধ - হাত ধন্যবাদ ভারত - ভবনে।
যাবে যদি রেখ মতি বঙ্গবালা প্রতি,
কাতরে ধরিয়া করে করি গো বিনতি।

চারুশীলে, সবে মিলে বিভু-দয়াময়ে
দম্পতী - মঙ্গলে সতি, ডাকি সবিনয়ে।
প্রাণবায়ু পরমায়ু বাড়ুক নিয়ত,
মনসুখে অবিপাকে থাক অবিরত।
বঙ্গবালা গুণমালা যতনে গাথিয়া
সানুরাগে কণ্ঠভাগে দিল দোলাইয়া।
উপকার উপহার লহ গো জননি!
আশীষ বচনে তোষ ভারত-রমণী।
যাবে যদি রেখ মতি বঙ্গবালা প্রতি,
কাতরে ধরিয়া করে করি গো বিনতি।

তৎপরে মান্যবর ফিয়ার সাহেব একটী সংক্ষেপ বক্তৃতা দ্বারা স্বর্গীয় বাবু প্যারিচরণ সরকার মহাশয়ের নিমিত্ত বিশেষ আক্ষেপ করিয়া বলেন যে, তিনি একজন অতি অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গভূমি একটী অমূল্যরত্ন হারাইয়াছেন। তিনি বলেন, যদিও স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে এখনও এদেশীয় লোকের তাদৃশ যত্ন দৃষ্ট হয় না, কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে পূর্ব্বাপেক্ষা এ সম্বন্ধে অধিক উন্নতি দৃষ্ট হয়; এবং ইহাও সন্তোষের বিষয় বলিতে হইবে যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার অধিক প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে পূর্ব্বাপেক্ষা চাঁদার কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়াছে দেখিয়া তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন, এবং ইহা অপেক্ষা অধিক দেখিতে ইচ্ছা করেন। মাননীয়া ফিয়ারের অভিনন্দন সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, তাঁহার পত্নী উক্ত অভিনন্দন প্রাপ্তে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এতদ্দেশীয় স্ত্রীশিক্ষা উন্নতিকল্পে তাঁহার মন হইতে কখন বিচলিত হইবে না।

পরে সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

বিদ্যালয়ের বালিকা সংখ্যা প্রতি বৎসর বৃদ্ধি হইতেছে, গত বৎসরের সংখ্যা ৫৪টী। বিদ্যালয়ের উন্নতির সহিত উহার কতকগুলি অভাব বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রথমতঃ, দুই জন পণ্ডিতের স্থানে তিন জন পণ্ডিত হওয়া আবশ্যক; দ্বিতীয়তঃ, বালিকাদিগের যাতায়াতের নিমিত্ত একখানি গাড়ির নিতান্ত প্রয়োজন; তৃতীয়তঃ, বিদ্যালয়ের একটী নিজস্ব বাটী হইলে ভাল হয়। আপাততঃ এই তিনটী প্রধান অভাব দূর হইলে বিদ্যালয়টী যে স্থায়ী এবং স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে যে যথেষ্ট ফলদায়ক হইবে তাহা অনায়াসেই আশা করা যাইতে পারে। এক্ষণে দেশহিতৈষী মহোদয়গণ যাহাতে এ বিষয়ে মনোযোগী হয়েন এই আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা।

উপসংহারকালে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু ভূজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় এই বৎসর হইতে দুই টাকা একটী মাসিক বৃত্তি প্রদান করিয়া বিদ্যালয়ের বিশেষ উপকার করিয়াছেন।